CUL-H01976-5-104954

5

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অবনীবাবুর অভিনয়	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
অসমাজের প্রতিকার	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
অসম্ভবের স্বপ্নপ্রাপ্তি	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
আত্মরক্ষা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৫
আত্মহত্যা	শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	৬৯, ১৪৫, ২৪৬, ৩২৯
আত্ম অভিমান	শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার	২৯৫
আলোচনা ও মন্তব্য	শ্রীমহেশচন্দ্র পালধার	১৭৫
নিরাশ আশার ধর্ম্ম চূর্ণ	শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণেশ দেউস্কর	৪৩
মূলের তাৎপর্য্যার্থ	শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল	৪৯, ১৫৩
কাল	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৩১৭
কুলীন	শ্রীরাধেশ্যাম কথক বিদ্যাবিনোদ	২১৮
কোচাচার্য্য পণ্ডিত	শ্রীকালীবর রায়	৯৫
কোচীন জ্যোতিষ	শ্রীরাধেশ্যাম কথক বিদ্যাবিনোদ	৩৩৫
কোচারী ও ইতিহাস	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০৪
গান করবে—		
বাউলের গীত	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮
		২৬৭
গুরুদেব কলিকাতা যাত্রা প্রবাহ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
গুরুদেবের চরিতকথা	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
গুরুদেব পাবনা নগরীর পত্রম	শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন	
গোড়ের ইতিহাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭

104954

আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

মৃত্যুর পরে।

আয়ু যার এতটুক,
এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে ;
অকস্মাৎ এ সংসারে
কে বাঁধিয়া দিল তারে
শত লক্ষ কাজে ;

হেথায় যে অসম্পূর্ণ,
সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবার
সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত ;
জীবনে যা প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থ পূর্ণ করি ;

হেথা যারে মনে হয়
শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে
অপূর্ব নূতনরূপে

উঠিতেছে চরাচরে
অনাদি অনন্তস্বরে
সঙ্গীত উদার
সে নিত্য-গানের সনে
মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার!

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে
দেখ তারে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া;
জীবনের ধূলি ঘুমে
দেখ তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া!
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে
ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে!
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ,
ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে!

আজ বাদে কাল যারে

মৃত্যুর পরে

যে বিশ্ব কোলের পরে
চিরদিবসের তরে
তুলে নিল তারে,
তার মুখে শব্দ নাহি,
প্রশান্ত সে আছে চাহি
ঢাকি আপনারে।

বৃথা তারে প্রশ্ন করি,
বৃথা তার পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে ;—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে—
কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে ;
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে
ফিরে নিতে চাহি মিছে ;—
সে কি আমাদের ?
পলেক বিচ্ছেদে হায়
তখনি ত বুঝা যায়
সে যে অনন্তের !

চক্ষের আড়ালে তাই
কত ভয় সংখ্যা নাই,
সহস্র ভাবনা !
মুহূর্ত্ত মিলন হলে
টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা !

ওই দূর দূরান্তরে
অজ্ঞাত ভুবন পরে
কভু কোনখানে
আর কি গো দেখা হবে,
আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক্,
ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক,
সর্ব্ব মরীচিকা!
নিবে যাক্ চিরদিন
পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্ত্য জন্ম-শিখা!
সব তর্ক হোক্ শেষ,
সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই!
বল শান্তি বল শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই!

বারাণসী।

ভারতবর্ষে। ※

মধ্যাহ্ন। গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ দ্রুত পদক্ষেপে সমস্ত নগর পর্য্যটন করিলাম। গলি ঘুঁচি, দোকান, পদ-পথে স্থাপিত খোদা-কাজকরা তাঁবার সামগ্রী, মন্দির, রাজপথে অধিষ্ঠিত

তুবা প্রকৃত পক্ষে উভয়ই তুল্যমূল্য; জীবনধারণের সকল প্রকার পদ্ধতিই সমান বৈধ—যে কোন পদ্ধতি হউক, যখন উহা আছে, তখন অবশ্যই বৈধ। এই মাত্র যে আমি বলিয়াছিলাম যে, পতুসতাই হিন্দুদিগের প্রকৃতি-গত অবস্থা, এ কথা বলিবার আমার কি অধিকার আছে?

টিফিনের পর কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। এই সময়ে বিজন প্রান্তরে দিনকর প্রখর রশ্মিজাল বিস্তার করিতেছে। আমি যাহা এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম, তাহার তাৎপর্য্য ও অর্থ জানিবার জন্য এই বিষয়ের কতকগুলি গ্রন্থ ঘাঁটিয়া দেখিতেছি। এই সকল রীতি অনুষ্ঠানের অর্থ কি? এই সকল বাতুলবৎ মুদ্রাবিন্যাসের তাৎপর্য্য কি? তৃণাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড ছত্রতলের নিম্নে অবস্থিত হইয়া নগ্নপ্রায় ব্রাহ্মণেরা কি প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করে? এক ঘণ্টা কাল এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া আবার আমার সেই পূর্ব্ব উপলব্ধি ফিরিয়া আসিল—আবার আমার মনে হইতে লাগিল, এই ব্রাহ্মণেরা নিতান্তই উন্মাদগ্রস্ত।

* * *

বারাণসীর পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণের মধ্যে একজনকার দৈনন্দিন জীবন এইখানে দেওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যোত্থান করেন এবং উঠিয়াই কোন শুভলক্ষণসূচক পদার্থের উপর যাহাতে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয় ইহাই তাঁহার প্রথম চেষ্টা। যদি বামে কাক, দক্ষিণে চীল, অথবা যে দিকেই হউক, সর্প, বিড়াল, গবগোশ, শূন্য কলস, ধূমায়মান বহ্নি, এক রাশ চ্যালা-কাঠ, বিধবা কিম্বা অন্ধ দেখিতে পান, তাহা হইলে সমস্ত দিনটা তাঁহার বিপদের ভয়ে থাকিতে হয়—যদি তাঁহার কোথাও যাত্রা করিবার থাকে, সেদিনটা যাওয়া রহিত করেন। কিন্তু উঠিয়া প্রথমেই যদি গো,

রিয়া, উচ্চ হইতে উহা নিজ মুখ-বিবরে বর্ষণ পূর্ব্বক দেহ ও
াত্মা উভয়কেই এককালে পবিত্রীকৃত করেন। সেই সময়ে, তিনি
ক্ষুর পঞ্চবিংশতি নাম মনে মনে উচ্চারণ করিতে থাকেন।
যা, কেশবের জয়, নারায়ণের জয়, মাধবের জয়, গোবিন্দের জয়
ত্যাদি।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—শ্বাস-প্রশ্বাসের চালনা ও সংযম, যাহাকে
াণায়াম বলে। উহাতে তিনটি প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।
১) দক্ষিণ নাসারন্ধ্র টিপিয়া ধরিয়া, অপর নাসারন্ধ্র দিয়া প্রশ্বাস
ত্যাগ করা। (২) বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, পরে
হা টিপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা প্রশ্বাস ত্যাগ করা।
৩) তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা উভয় নাসারন্ধ্র টিপিয়া ধরিয়া
তক্ষণ পারা যায়, শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখা।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হওয়া আবশ্যক এবং
ইহা পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের পূর্ব্বায়োজন মাত্র। অতঃপর ব্রাহ্মণ জলের
ারে দাঁড়াইয়া নিশ্চল হইয়া গম্ভীরস্বরে সেই প্রসিদ্ধ ওঁ শব্দ
ার্ঘস্বরে উচ্চারণ করেন। উহা হিন্দু-ত্রিমূর্ত্তির তিনটি গুণকে
রণ করাইয়া দেয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্ত্তা
শিব। মনু বলেন, এই ওঁ শব্দ সকল বাক্যের শ্রেষ্ঠ, অবিনশ্বর,
য়ং ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি অনন্ত। ইহা কেবল চিহ্ন মাত্র নহে—ইহা
একটি জীবন্ত সত্তা, একটি শক্তি, ইহা দেবতাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ইয়া দেবতাদিগকে পালন করে—ইহা সকল পদার্থের সার। কি
হস্যময় মনের ক্রিয়া, কি অদ্ভুত মনোভাবের অনুবন্ধ—যাহা হইতে
এইপ্রকার ধারণাসকল সমুৎপন্ন হইতে পারে!

এই পুরাতন ও ভীষণ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে ব্রাহ্মণ
ত্রিভুবনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আহ্বান করেন। ভূ,

অতঃপর ব্রাহ্মণ আসন করিয়া বসিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রশস্ত সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। তিনি আপনার অঙ্গুলী নিরীক্ষণ করিয়া ধ্যান করেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার অঙ্গুলীর মধ্যে বাস করেন বলিয়া অঙ্গুলীর এত মাহাত্ম্য। বৃদ্ধাঙ্গুলীতে গোবিন্দ, তর্জ্জনীতে মহীধর, তৃতীয় অঙ্গুলীতে হৃষীকেশ, চতুর্থ অঙ্গুলীতে ত্রিবিক্রম, কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে বিষ্ণু স্বয়ং এবং করতলে মাধব বাস করেন। ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটি পড়েন "বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়কে নমস্কার, তর্জ্জনীদ্বয়কে নমস্কার, মধ্যমাদ্বয়কে নমস্কার, অনামিকাদ্বয়কে নমস্কার – ক্ষুদ্রাঙ্গুলীদ্বয়কে নমস্কার, করতলদ্বয়কে নমস্কার, বাহুদ্বয়কে নমস্কার।" এই বলিয়া আপনার বক্ষ, চক্ষু, নাভী, কণ্ঠ ও মস্তক এবং অবশেষে যে অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র সেই দক্ষিণ কর্ণকে স্পর্শ করেন। এই কর্ণদেশে অগ্নি, জল, বায়ু, চন্দ্র, একাধারে বাস করেন। তাহার পর, একটা লাল স্থলি লইয়া তাহার মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া অঙ্গুলীগুলি পরস্পরের উপর ন্যস্ত করিয়া নানাপ্রকার পাকচক্রভঙ্গী সহকারে বিষ্ণুর প্রধান প্রধান অবতারের মূর্ত্তি তাড়াতাড়ি রচনা করেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, সিংহ, রথ, গ্রন্থি, মালা ইত্যাদি। এই প্রকার ১০৮ মূর্ত্তি ইহার একটাও বাদ দিবার যো নাই। এই সকল মুদ্রার নাম সকল অনন্ত।

পূজার দ্বিতীয় অংশটিও তর্পণ ও মন্ত্রে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ সূর্য্যকে আহ্বান করেন। "সেই মিত্র যিনি স্থিরনেত্রে সমস্ত জীবদিগকে দর্শন করেন" এবং সেই অরুণ—"ইন্দ্রের দীপ্তিমতী দুহিতা সকল" —ইহারাই আমাদের আর্য্যজাতির আদি দেবতা। অতঃপর ব্রাহ্মণ ভূলোকের, শিবলোকের, বিষ্ণুলোকের মহিমা ঘোষণা করেন; মহাভারত হইতে, পুরাণ হইতে, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ হইতে, ব্যাকরণ হইতে, যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিশাস্ত্র হইতে শ্লোক সকল,

একটি স্মৃতি-সঙ্কেত প্রচলিত আছে। এত অসংখ্য বাহ্য অনুষ্ঠান যে, উপাসকের মন বাহ্য বিষয়েই ব্যাপৃত থাকে—কতকগুলি মন্ত্রের আর অভিপ্রায় উপাসকেরা মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিতে অবসর পায় না। প্রতিদিন প্রাতে বারাণসীর গঙ্গাতীরে যে আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা যায় তাহাতে এই কথাটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়।

* * * * *

মনে করিয়া দেখ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নেও এইরূপ পূজানুষ্ঠান হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ইতাবকাশে পথের মধ্যে, নিজ গৃহে, শয়নকালে এই প্রকার বহুল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই প্রত্যেক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে আচমন করিতে হয়, ওঁকার উচ্চারণ করিতে হয়, প্রধান প্রধান দেবতার নাম করিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এক ঘণ্টার অধিক বিরামকাল উপস্থিত হয় কি না সন্দেহ। গঙ্গা, উষা, সূর্য্য এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির পূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিপূজা করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। শিবলিঙ্গের উপর জলসেচন করেন, পুণ্য বৃক্ষবিশেষকে প্রদক্ষিণ করেন—গাভীদিগকে পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চনা করেন। আবার গৃহে গিয়া অন্যান্য দেবতার আরাধনা করেন। পাঁচটি কৃষ্ণবর্ণ শিলা—ইহাদের মধ্যে একটি শিব, একটি গণেশ, একটি সূর্য্য, একটি দুর্গা, একটি বিষ্ণুর সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ—পাঁচ দিকে পাঁচটি স্থাপিত। একটি উত্তরে, একটি দক্ষিণ-পূর্ব্বে, একটি দক্ষিণ-পশ্চিমে, একটি উত্তর-পশ্চিমে এবং শেষটি অর্থাৎ বিষ্ণু সকলের মাঝখানে। কিন্তু ভক্ত-বিশেষ যে দেবতাকে প্রাধান্য দেয় তদনুসারে এই স্থাপন-প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হয়। তৎপরে একটি ঘণ্টা—ইহার নিকটও ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ প্রণিপাত হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। অবশেষে একটি ঘটকে অর্চ্চনা করা হয়। ঘটের মুখে বিষ্ণু, স্কন্ধে রুদ্র, বক্ষে ব্রহ্মা

অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ। হিন্দুদিগের জটিল সংস্কার-অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে হয়—উহাদের সংস্কার সকল আমাদের চক্ষে অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়—কিন্তু ঐ সকল সংস্কারই হিন্দু আত্মার স্থায়ী উপাদান। আর একটা ব্যাপার বর্ণভেদ। কুকুর ও ষাঁড়ের মধ্যে যে প্রভেদ, শূদ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই ধরণের প্রভেদ। সেই জন্য, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ—এমন কি, ইহার কল্পনা পর্য্যন্ত ভয়াবহ। অধুনা, শতপ্রকার জীবিকা-বৃত্তি, শত-প্রকার জাতিভেদ। প্রত্যেক হিন্দু পুরোহিত কিম্বা ভিষক্, লেখক কিম্বা কুম্ভকার, কর্ম্মকার কিম্বা খোদনকার হইয়া একেবারেই জন্মগ্রহণ করে। যদি নিকৃষ্টতর বর্ণের কেহ উচ্চতর বর্ণের লোকের খাদ্য স্পর্শ করে কিম্বা তাহার পার্শ্বে বসিয়া আহার করে তাহা হইলে সেই উচ্চতর জাতির লোক অধঃপাতে যায়। যদি কেহ, ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যায়, কালাপানি পার হয়, তবে সে জাতিচ্যুত হয়। অর্থাৎ কাহারও সহিত সে কেনা-বেচা করিতে পারে না, আহার ব্যবহারও করিতে পারে না—সে পতিত কলঙ্কিত। চরম প্রায়শ্চিত্ত—গোসংস্রবযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন সে কলঙ্ক মোচন হইবার নহে! বহুল অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, স্বকীয় বর্ণের জাতভাইদিগকে একত্র করিয়া—গোদুগ্ধ, মাখন, গোমূত্র ও গোময় এই সকল গব্য পদার্থের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়। কারণ, গোজাতি, ভগবানের উচ্চতম অবতারবিশেষ, তাহার পদবী ব্রাহ্মণের নীচে, কিন্তু অন্যান্য তাবৎ মনুষ্যমণ্ডলীর উপরে। গোময় অপেক্ষা মূল্যবান পদার্থ আর কিছুই নাই। যে ভক্তজনের গৃহ গোময়লিপ্ত, ভূত প্রেত তাহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না।

10-2-54

অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ। হিন্দুদিগের জটিল সংস্কার-অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে হয়। উহাদের অনেক সংস্কার সকল আমাদের চক্ষে অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়—কিন্তু ঐ সকল সংস্কারই হিন্দু আত্মার স্থায়ী উপাদান। আর একটা ব্যাপার বর্ণভেদ। কুকুর ও বাঁড়ের মধ্যে যে প্রভেদ, শূদ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই ধরণের প্রভেদ। সেই জন্য, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ—এমন কি, ইহা কল্পনা পর্য্যন্ত ভয়াবহ। অধুনা, যতপ্রকার জীবিকা-বৃত্তি, তত প্রকার জাতিভেদ। প্রত্যেক হিন্দু পুরোহিত কিম্বা ভিষক্, লেখক কিম্বা কুম্ভকার, কর্ম্মকার কিম্বা খোদনকার হইয়া একেবারেই জন্মগ্রহণ করে। যদি নিকৃষ্টতর বর্ণের কেহ উচ্চতর বর্ণের লোকের খাদ্য স্পর্শ করে কিম্বা তাহার পার্শ্বে বসিয়া আহার করে তাহা হইলে সেই উচ্চতর জাতির লোক অধঃপাতে যায়। যদি কেহ, ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যায়, কালাপাণি পার হয়, তবে সে জাতিচ্যুত হয়। অর্থাৎ কাহারও সহিত সে কেনা-বেচা করিতে পারে না, আহার ব্যবহারও করিতে পারে না—সে পতিত কলঙ্কিত। চরম প্রায়শ্চিত্ত—গোসংস্রবযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন সে কলঙ্ক মোচন হইবার নহে! বহুল অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, স্বকীয় বর্ণের জাতভাইদিগকে একত্র করিয়া—গোদুগ্ধ, মাখন, গোমূত্র ও গোময় এই সকল গব্য পদার্থের মণ্ড পেষত করিয়া অধঃকরণ করিতে হয়। কারণ, গোজাতি, ভগবানের উচ্চতম অবতারবিশেষ, তাহার পদবী ব্রাহ্মণের নীচে, কিন্তু অন্যান্য জীবের মনুষ্যগুলীর উপরে। গোময় অপেক্ষা মূল্যবান পদার্থ আর কিছুই নাই। যে ভক্তজনের গৃহ গোময়লিপ্ত, ভূত প্রেত তাহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না।

10425

সা রা পা পা। -ণ পা ধ। পা। পধা -পদ
স ক ল দু। — খ স ব। পা —

দপা মা মপা পধমা। জ্ঞা জ্ঞা লঙ্গলা সা।
। — প ও বে । স ক ল স।

। জ্ঞা -। মা মা। -। মপমা -। জ্ঞা। জ্ঞলজ্ঞা
। হ ই বে নি। — ব্বা — ণ। ক

। -। লা জ্ঞা মা। জ্ঞলজ্ঞা -লা -। সা॥ দা
। — ব গু ণ। গা — — ন। অ

। ঞ্ঞরা ঞ্ঞা ঞ্ঞা ঞ্ঞা। র্সা -। র্সা র্সা। র্সা
। — থ বি নি। প্রা — ণে র। প্র

। র্সা -। র্সা র্রা। র্সা -রমা র্সর্রা র্সা। র্সা র্সা
। তা — য়ে ছে। ডে — ভ বে। না হি

। -। ঞ্ঞর্সঞ্ঞা -দঞ্ঞদা -। । পা -। পা পা। ।
। — ত্রা — ণ। মৃ — ত্যু মা। ।

। পা র্পঞ্ঞা দা দপা। (া -। পমা -ধরা। পা
। মৃ যু ভ সো। (পা — — ন্। যু

। মা -। -পমা। জ্ঞা জ্ঞা -। জ্ঞা। মা
। পা — — ন্। স ক — ল। ন

। পা পা -ধা মা। মপধা । জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞলজ্ঞা

। দপ্তা ন ন পদপা। -মা ন মপা মা। ঙ্গমঙ্গা -গা সা সা।
। ধ্যা — — — । — ণ্ ক র্। আ — জি তাঁ।

। ন লা ঙ্গা মা। ঙ্গলঙ্গা -লা ন সা॥
।— ণ ণ্ড ণ। গা — — ন॥

ব্যাখ্যা।

১। ধ=কোমল ব, ঙ=কোমল গ; দ=কোমল ধ, ঞ=কোমল ম।
২। বেক্, উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন, হসন্ত, খাদ সপ্তকের চিহ্ন।

শোকসভা।

বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ করিবার জন্য যাঁহারা সাধারণ সভা আহ্বানের চেষ্টা করিয়াছেন শুনা যায় তাঁহারা একটি গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সে বাধা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক এবং তাহা পূর্ব্বে প্রত্যাশা করা যায় নাই।

যাঁহারা বঙ্কিমের বন্ধুত্ব সম্পর্কে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন এমন অনেক খ্যাতনামা লোক সভাস্থলে শোকপ্রকাশ করা কৃত্রিম আড়ম্বর বলিয়া তাহাতে যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছেন এবং সভার উদ্যোগীগণকে ভর্ৎসনা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। এরূপ বিয়োগ উপলক্ষ্যে আপন অন্তরের আবেগ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করাকে যাঁহারা কবি তাঁহারা পবিত্র শোকের অবমাননা বলিয়া জ্ঞান করেন।

বিশেষতঃ আমাদের দেশে কখন এমন প্রথা প্রচলিত ছিল না; সুতরাং শোকের দিনে একটা অনাবশ্যক বিদেশী আড়ম্বরে মাতিয়া উঠা কিছু অশোভন এবং অসময়োচিত বলিয়া মনে হইতে পারে।

[illegible] রাখিয়া দেয় নাই কিন্তু ভাবকে ভূমিপরিমাণ করিয়াছি দ্বারা [illegible] করিয়াছেন, তেমনই, যাহা কিছু কেবলমাত্র একাকীর নহে, [illegible] সর্ব্বসাধারণের সেব্য এবং যোগ্য করিতে হইবে তাহাদেরই [illegible] জড় কৃত্রিমতার দ্বারা দৃঢ় আকারবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। অরণ্যের অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য সহৃদয় কবিগণ বড়ই ভাল বাসুন কৃত্রিম ইষ্টকবাটীরচিত মহানগর লোকসমাজের বাসের পক্ষে যে [illegible] অনেকাংশে উপযোগী তাহা অস্বীকার করিবার কারণ দেখি না। তরুর প্রত্যেক অংশ সজীব এবং স্বতোবর্দ্ধিত, তাহার [illegible] হৃদয়তৃপ্তিকর তথাপি মনুষ্য আপন সনাতন পূর্ব্বপুরুষ শাখা মৃগের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ না করিয়া স্বহস্তরচিত অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

যে সকল ভাব প্রধানতঃ নিজের, যেখানে বহিঃসমাজের কোন অধিকার নাই, যেখানে মনুষ্যের হৃদয়ের স্বাধীনতা আছে সেখানে কৃত্রিমতা দোষাবহ। কিন্তু মনুষ্যসমাজ এতই জটিল যে, [illegible] একাকীর এবং কতখানি বাহিরের সমাজের তাহার [illegible] অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় বাধ্য হইয়া আমার নিজস্ব অধিকারের মধ্য দিয়াও সমাজ-মুনিসিপালিটির জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। সহজেই মনে হইতে পারে, পিতৃশোক সন্তানের নিজের। সমাজের সে সম্বন্ধে আইন বাঁধিবার কোন অধিকার নাই। সকল সন্তান সমান নহে, সকল সন্তানের শোক সমান নহে, এবং মনের প্রকৃতি অনুসারে শোকপ্রকাশের ভিন্ন উপায়ই স্বাভাবিক, তথাপি সমাজ আসিয়া বলে তোমার শোক তোমারই থাক অথবা না থাকে যদি সে সম্বন্ধেও কোন প্রশ্নোত্তরের অনুশাসক নাই কিন্তু শোকপ্রকাশের আমি সে বিধি

হাতে আমাতে স্বতন্ত্র স্বাধীন সম্বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহাতেও আমাদের স্বাধীনতা দেয় নাই। ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে কি ভাবে কি উপায়ে পূজা করিতে হইবে তাহা কেবল আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই অনুশাসনের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ ফুল উপহার দিতে হইবে এবং কোন্ ফুল দিতে হইবে না তাহাও তাহার আদেশ অনুসারে পালন করিতে হইবে। মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিতে হইবে তাহা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু নিজের হৃদয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া সে মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিলে চলিবে না। অতএব, আমাদের জীবনের যে অংশ একেবারে একান্তভাবে, যাহা সমস্ত সমাজ এবং সংসারের অতীত সেই অন্তর্যামী দেবতার উদ্দেশে একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত, সাধারণ-মঙ্গলের উপলক্ষ্য করিয়া সমাজ সেখানেও আপনার সঙ্কীর্ণ শাসন স্থাপন করিয়াছে।

সর্ব্বত্রই সমাজের অপ্রতিহত ক্ষমতা ভাল কি মন্দ সে তর্ক এখানে উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক। আমি দেখাইতে চাই, যে, যে-ক্রমেই হউক বা সুবিচারপূর্ব্বকই হউক্ সমাজ যেখানেই আবশ্যক বোধ করিয়াছে সেখানে ব্যক্তিগত হৃদয়ের ভাবকে নিজের নিয়মানুশাসন প্রকাশ করিতে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে বাধ্য করিয়াছে। তাহাতে সমাজের অনেক কার্য্য সবল হইয়া আসে এবং তাহার অনেক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

আমাদের সমাজ গার্হস্থ্যপ্রধান সমাজ। পিতামাতা এবং গৃহের কর্ত্তাদের ব্যক্তিদিগের প্রতি অক্ষুণ্ণ ভক্তি ও নির্ভর এই সমাজের প্রধান বন্ধন—এই কারণে গুরুজনের বিয়োগে শোকপ্রকাশ কেবল ব্যক্তিগত নহে তাহা সমাজগত নিয়মের অধীন। এ সমাজ অনাত্মীয় বোধে পুত্রশোকের প্রতি কোন রূপ হস্তক্ষেপ করে নাই। সম্প্রতি এই গার্হস্থ্যপ্রধান সমাজের কিছু রূপান্তর ঘটি-

ই প্রদর্শন করিবে ইহা সমাজের পালন। তেমনি, যাঁহারা কেবল আপনার ঘরের জন্য নহে, পরন্তু, পাব্লিকের হিতের জন্য পন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন মৃত্যুর পরে তাঁহাদের প্রতি কাশ্য ভক্তি স্বীকার করা কি পাব্লিকের কর্ত্তব্য নহে? এবং শ্যে ভক্তি স্বীকার করিতে গেলেই কি ব্যক্তিগত শোককে মনে আনা আবশ্যক হয় না? এবং একজন বিশেষ বন্ধু কদ্ধার ইর যধ্যে যেরূপ ভাবে শোকোচ্ছ্বাসকে মুক্ত করিয়া থাকেন সাধারণের নিকট কি কখনো সেরূপ শোকপ্রকাশ প্রত্যাশা া যায়; এবং সাধারণের পক্ষে সেরূপ শোক সম্ভব নহে বলিয়াই সাধারণ শোকের কোন মূল্য নাই এবং তাহা নিন্দনীয়?

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, আমাদের দেশের ক্ত আমাদের দেশীয় মহাত্মালোকের বিয়োগে যথোচিত শোক ভব করে না। আমাদের এই অল্পবয়স্ক পাব্লিক অনেকটা বালক-ব। সে আপনার হিতৈষীদিগকে ভাল করিয়া চেনে না, যে াবগুলি পায় তাহার সম্পূর্ণ মূল্য বুঝে না, বন্ধুদিগকে অতি ই বিস্মৃত হয় এবং মনে করে আমি কেবল গ্রহণ করিব মাত্র ৃ তাহার পরিবর্ত্তে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই।

আমি বলি, এইরূপ পাব্লিকেরই শিক্ষা আবশ্যক এবং সভা স্থান ও সেই সভায় আলোচনাই শিক্ষার প্রধান উপায়। যাঁহারা শীল সহৃদয় ভাবুক ব্যক্তি তাঁহারা যদি লোকহিতৈষী মহোদয় াদিগের বিয়োগশোককে নিজের হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবা , তাহাকে যদি সাধারণ শোকের উদার বৃহত্ত্ব দান না করেন, রা যদি সাধারণকে ক্ষুদ্র ও চপল বলিয়া ঘৃণা করিয়া দেশের বড় ঘটনার সময় শিক্ষাদানের অবসরকে অবহেলা করেন, ন কি, যখন দেশের লোক সুসময়ে দুঃসময়ে তাঁহাদের দ্বারে

হ পক্ষে বড় দুঃসাধ্য। উপহারের সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি স্নেহ-
দেখা যায় তবে সেই উপহারের মূল্য অনেক বাড়িয়া যায় এবং
র স্মৃতি হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। মানুষের পক্ষে মানুষ বড়
মের বড় আকাঙ্ক্ষার ধন। মানবহৃদয় ও মানবজীবনের সহিত
ত হইয়া যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তাহা অতি সহজে
আনন্দে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। যখন একটি সুকণ্ঠ
মধুরস্বরে গান করে তখন সেই গানের সৌন্দর্য্যের মধ্যে
টি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবহৃদয়ের জীবন্ত সম্পর্ক অনুভব করিয়া
রা প্রবলতর আনন্দ সম্ভোগ করি—যন্ত্রের মধ্য হইতে অবি-
সেই সঙ্গীত প্রবণ করিলে আনন্দের অনেকটা হ্রাস হয়। তখন
রা যন্ত্রবাদককে অথবা সঙ্গীতরচয়িতাকে গানের ভাবো-
সের সহিত জড়িত করিয়া থাকি। যেমন করিয়া হৌক,
ন্ম সহিত কর্ত্তাকে অব্যবহিত ভাবে দেখিলে কর্ম্মটি সজীব
ন হইয়া উঠে এবং আমাদের চেতনার সহিত সহজে মিশ্রিত

এই জন্য কোন কার্য্য আমাদের মনোরম বোধ হইলে তাহার
র সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমাদের আগ্রহ জন্মে। সদুপা
মাদের হৃদয় যেন তাহার পূরা খাদ্যটি পায় না—তাহার অর্দ্ধেক
য়া থাকিয়া যায়।

আমাদের দেশে সমাজ, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে
ং অন্তঃপুর ও বহির্ভবনে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত হওয়াতে আমরা
সকলে নিকটস্থ করিয়া দেখিতে পাই না; তাহার উপহার এবং
পকারগুলি দূর হইতে আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে—
মাদের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা কোন একটি সজীব মূর্ত্তিকে অবলম্বন
য়া আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে পারিতে পারে না।

আকাশ ধূলিহীন স্বচ্ছ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরি-
সেই মৃদুতার মধ্যে স্থাপন করিয়া দেখিলে মানুষকে
র্থভাবে দেখা যাইতে পারে।

জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন
র্দ্ধিকবর্ত্তী বায়ুস্তর এই পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত
বিশেষতঃ বায়ুর নিম্নস্তরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অস্বচ্ছ। এই
ধর জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে অনুকূল স্থান।

জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণেও আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুস্তরে
দিবা থাকে। আবর্ত্তিত আলোড়িত সংসারে উড্ডীয়মান
রমাণু দ্বারা এই বায়ু সর্ব্বদা আচ্ছন্ন। ইহাতে মহত্ত্বের
কে স্থানভ্রষ্ট পরিমাণভ্রষ্ট করিয়া দেখায়। বর্ত্তমানের
বায়ুতে অনেক সময় কিরণলেখা অথবা বৃহৎ দেখিতেও
সে বৃহত্ত্ব বড় অপরিস্ফুট—কিরণটিকে যথাপরিমাণে
লে হয়ত তাহার হ্রাস হইতে পারিত কিন্তু তাহা
স্বলতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত।

তশিখরের ন্যায় আমাদিগকে এই ঘন বায়ুস্তর হইতে
লইয়া যায় যেখানে মহত্ত্বের সমস্ত রশ্মিগুলি নির্ম্মল
আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়ে।

শিখরে বন্ধুদিগের সাহায্যে আমাদের জ্যোতিষ্কদিগের
পরিচিত হইতে চাহি।

ব্যক্তিকে অন্যের নিকট পরিচিত করা কার্য্যটি তেমন
জীবনের ঘটনার মুখ্য গৌণ নির্ব্বাচন করা বড় কঠিন।
র নিকট সুপরিচিত তাহার কোন্ অংশ অন্যের নিকট
ন পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা বাহির করা
ঘটনা অনেক ঘটনাকে সহসা সামান্য মনে হইতে

পাবে পরিচয়ের পক্ষে যাহা সামান্য নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক ক্ষমতাশালী বন্ধু আছেন যাঁহাদের সমালোচনশক্তি, নির্ব্বাচনশক্তি, গঠনশক্তি সামান্য নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের ভার তাঁহাদের নওয়া কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞ বলিয়াই যে আমাদের পাব্লিক অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহা নহে, সে ভাল করিয়া বোঝে না, সম্পূর্ণরূপে জানে না বলিয়াই তাহার কৃতজ্ঞতা জাগ্রত হইয়া উঠে না। মৃত ব্যক্তির বীর্য্যগুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে এবং তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে। লেখক বলিয়া নহে, কিন্তু স্নেহপ্রীতি-সুখদুঃখে মনুষ্যভাবে তাঁহার লেখার সহিত এবং আমাদের সহিত তাঁহাকে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাঁহাকে কেবল দেবতা বলিয়া পূজা করা নহে, কিন্তু স্বজাতীয় বলিয়া আমাদের আত্মীয় করিয়া দিতে হইবে।

আমরা আমাদের মহৎব্যক্তিদিগকে দেবলোকে নির্ব্বাসিত করি দই। তাহাতে আমাদের মনুষ্যলোক দরিদ্র এবং গৌরবহীন হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যদি রক্তমাংসের মনুষ্যরূপে সুনির্দ্দিষ্ট-পরিচিত হন, সহস্র ভালমন্দের মধ্যেও আমরা যদি তাঁহাদিগকে মহৎ বলিয়া জানিতে পারি তবেই তাঁহাদের মনুষ্যত্বের অন্তর্নিহিত সেই মহত্বটুকু আমরা যথার্থ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, তাঁহাকে ভালবাসি এবং বিস্মৃত হই না।

এ কাজ কেবল বন্ধুরাই করিতে পারেন। এবং বন্ধুগণ যখন প্রস্তরমূর্ত্তিস্থাপনে উদাসীন পাব্লিককে অকৃতজ্ঞ বলিয়া ধিক্কার করিতেছেন তখন পাব্লিকও তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ আনিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা বঙ্কিমের নিকট হইতে কেবল-মাত্র উপকার পান নাই, বন্ধুত্ব পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল বাহির

পান নাই, স্বচরিতাকে পাইয়াছেন। অর্থ থাকিলে প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করা সহজ, কিন্তু বঙ্কিমকে বন্ধুভাবে মনুষ্যভাবে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করা কেবল তাঁহাদেরই প্রীতি এবং চেষ্টাসাধ্য। তাঁহাদের বন্ধুকে কেবল তাঁহার নিজের স্মরণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যথার্থ বন্ধুঋণ শোধ করা হইবে না।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

জাপানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" নামক পত্রিকায় বেধর সাহেব জাপানের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রকৃতির প্রতি জাপানীদিগের যেরূপ বদ্ধমূল আন্তরিক অনুরাগ, এমন অতি অল্প জাতিরই আছে। এই অনুরাগ, তাহাদের ধর্ম্মে, শিল্পকার্য্যে, কবিতাতে, দৈনিক কার্য্যকলাপে, অবকাশের আমোদে—সমস্ত জীবনে ওতপ্রোত। ইহাদের চারুশিল্পে, সচরাচর শিল্পের চলিত বাধা নিয়ম কিছুই দৃষ্ট হয় না, পরন্তু "ওকিও" ও "হকুসাই" শিল্পীদ্বয় যে জীবন্ত স্বাভাবিকতার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহাদের সমস্ত শিল্পকর্ম্মে দীপ্যমান। এই প্রাকৃতিক জগতের অতি ক্ষুদ্রতম বস্তুসমূহকেও উহারা উহাদের শিল্পকার্য্যে প্রকাশ করে—এমন কি, সেই সকল বস্তুকে উহারা কাল্পনিক ভাবে অনুরঞ্জিত করে। নিতান্ত নিয়মবহির্ভূত ও অসম্ভব হইলেও, উহাদের শিল্পকর্ম্মে স্বাভাবিকতার অভাব হয় না—উহা যেন প্রীতিকর বলিয়া মনে হয়। শুধুই কি সুমহান পদার্থ এই সকল

শিল্পীদিগকে ভাব-রসে মুগ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু যাহা অতি নিকটতম, যাহা একটু অদ্ভুত রসাত্মক, যাহা টুটকি ধরণের সুন্দর তাহাই উহাদিগের অন্তরে ভাব-রসের দৈব-স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। উহাদের কবিতার নিয়ম অতিশয় কঠিন ও বহুল হওয়া সত্ত্বেও, উহাদের কবিতাতে প্রকৃতির সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। কখনও, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যটি দেখাইবার জন্য একটা ছবির অসম্পূর্ণ আদর্শ মাত্র দেওয়া হয়; কখনও বা এমন একটা কিছুর বর্ণনা থাকে, যাহা জগতের আত্মার সহিত যেন মর্ম্মে মর্ম্মে সন্নিবদ্ধ—যাহা এত সূক্ষ্ম ও সুকুমার যে, চিরকালই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অথচ নিজে কখনই ধরা দেয় না।

যদি জাপানী চরিত্রের কোন বিশেষ লক্ষণ থাকে তবে ফুল-ভালবাসা সেই লক্ষণ বলিতে হইবে। জাপানে এমন একটি ক্ষুদ্র বাড়ি দেখা যায় না যেখানে ছবির মত সাজানো একটি বাগান এবং যতই সামান্য পান্থশালা হোক্ না কেন, তথাকার প্রত্যেক অতিথির ঘর পুষ্পগুচ্ছে সমুজ্জ্বল। জন্তুভালবাসাও খুব বেশি না হোক্, যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

প্রকৃতি-জননীর প্রতি এই প্রকৃতির শিশুদিগের যে প্রকার অনুরাগ তাহার দৃষ্টান্ত অসংখ্য। কিন্তু এই ভাবের সহিত বৈজ্ঞানিক স্পৃহার কোন সংশ্রব নাই। আজ-কাল, দ্রুত-আওয়াজকারী বন্দুক প্রভৃতি আধুনিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক স্পৃহা জাপানকে আক্রমণ করিয়াছে। এই স্পৃহাটি ক্রমশ বিকশিত হইয়া আপাতত কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখানো বেধর সাহেবের লিখিত প্রবন্ধের কতকটা উদ্দেশ্য।

জাপানে এই যে আধুনিকীকরণ কিম্বা য়ুরোপীয়ীকরণ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশে। জাপানীদিগের মধ্যে

একদল লোক—বিশেষতঃ রাজনীতিকুশল "কৌণ্ট ইণ্টা" ও "কৌণ্ট ইনুয়ী" এই ব্যাপারের প্রবর্ত্তক। কিন্তু জাপানী রাজসরকারের অধীনে যে বৈদেশিক কর্ম্মচারীরা ছিল তাহারাই এই কল্পনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। এই উন্নতিকর কার্য্যে দুইটি মহা-জাতির হস্ত লক্ষিত হয়। এক—ইঙ্গ-স্যাক্সন্, অপর-জর্ম্মণ জাতিই ইহার প্রধান উদ্যোগী। ইংরাজেরা জীবনের কেজো দিক্‌টার প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়াছেন · তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপ-নাদের ধর্ম্মটাও জাপানীদিগের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজদিগের হইতে রেল-পথ হইয়াছে—এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ হইয়াছে, রণতরীর আয়োজন হইয়াছে, টাঁকশাল হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র হইয়াছে এবং বাইবেল-অনুমোদিত প্রার্থনা-পুস্তক হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, জর্ম্মণেরা প্রধানতঃ ইতিহাস, চিকিৎসা ও প্রাকৃ-তিক বিজ্ঞানের দিকে স্বীয় প্রভাব প্রকটন করিয়াছেন।

যে সকল জর্ম্মণ পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে জাপানে গিয়াছেন তন্মধ্যে ফিলিপ ফ্রান্‌স্‌সিষে বোণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নাগাসাকি নগরে অবতীর্ণ হন। চরিত্র-বল, শিষ্টতা, চিকিৎসানৈপুণ্য —তা ছাড়া উৎকোচদানের প্রভাবে তিনি তাৎকালিক সন্দিগ্ধমনা বশ্যতা-বিমুখ জাপানীদিগকে আশ্চর্য্যরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। হঠাৎ একবার এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, জাপান রাজ্যের প্রধান গুপ্তচর জাপান দেশের একটি মানচিত্র ঐ জর্ম্মণ পণ্ডিতকে বিক্রয় করিয়াছে। পুরাতন জাপানী আইন অনুসারে উহা রাজদ্রোহ। জর্ম্মণ পণ্ডিত কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কারা-গার হইতে মুক্ত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি কড়াকড় হুকুম হইল যে, তিনি যেন জাপান ছাড়িয়া আর কোথাও না যান। এই জর্ম্মণ পণ্ডিত বলেন, কিন্তু তকিমাকাবের প্রতি জাপানীদিগের প্রবল অনু-

রাগ, তাহাদের দৃষ্টি যেরূপ সুতীক্ষ্ণ তাহাদের হস্তও সেইরূপ কার্য্য এবং তাহাদের মনের গতি কেজো ধরণের। উদ্ভিদবিদ্যা তাহ বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়াছে; তাহার কারণ, ঔষধাদি প্র করিতে উদ্ভিজ্জের প্রয়োজন এবং তাহাদের খাদ্য ও পরিধে জন্যও উদ্ভিজ্জের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। নিজের স সাধন ও গৃহবিভূষণের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্লভ বৃক্ষচারাদি উহ চাষ করিয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্যায় উহারা ততটা উন্নতি ল করে নাই। কারণ, এই উদ্ভিজ্জভোজী জাতির পক্ষে পশু অপে উদ্ভিদ বেশী প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে সকল প্রাণী তাহাদের কা আসিত—যেমন মৎস্য, শামুক ও খোলাওয়ালা বিবিধ জী তাহাদের সম্বন্ধে জাপানীদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আছে বলি মনে হয়। শামুক সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে উহারা নানা সামগ্রী প্রস্তুত করে। যে দ্রব্য যত কিম্ভূতকিমাকার, উহা নিকট সেই দ্রব্য তত মূল্যবান।

পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জাপানীরা কি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সা করিয়াছে, তাহা উহাদিগের বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানের তালিকা দৃ প্রতীতি হইবে। "টোকিও" বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিদ্যালয়, ভূ ঘটিত পরিমাপপদ্ধতি স্থাপন, "উএনো" পার্কে রাজকীয় যাদু বিদ্বজ্জনেব সমিতিসমূহ এবং অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ত্তৃমণ্ড প্রাকৃতিক জ্ঞান প্রচার করা যাহাদের কাজ—এই সকল অনু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেয়র সাহেব বলে জাপানীদিগকে প্রকৃতরূপে বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিবার প অনেকগুলি বাধা আছে সত্য কিন্তু বিজ্ঞান অনুশীলনের পক্ষে তা দের চরিত্রগত সকল গুণই অনুকূল—উহাদের উপযোগী কার্য্যে অতীব বিস্তীর্ণ।

বিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত কাণ্ড।

পিয়ার্সন সাহেব বিলাপ করিয়াছেন, বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার সমস্তই হইয়া গিয়াছে—বিজ্ঞানের এখন বেকার অবস্থা। এই কথা শুনিয়া, লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এল্‌স্‌ডেল "ফণ্টেম্পোরারি" পত্রিকায় "বিজ্ঞানের ভাবী সমস্যা" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি যেরূপ উৎফুল্লভাবে বিজ্ঞানের ভাবী ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বলেন, ঊনবিংশতি শতাব্দী অপেক্ষা বিংশতি শতাব্দীতে অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা আছে। সেই অসংখ্য সম্ভাবিত আবিষ্কারের মধ্যে তিনি চারটির বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

প্রথম, বায়ু-মণ্ডলকে আয়ত্তের মধ্যে আনা। এখনই তো ফরাসী গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-বিভাগ হইতে এমন সকল ব্যোম-যান প্রস্তুত হইতেছে যাহার গতি-বেগ ঘণ্টায় ২৫ মাইল হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়। একটা উড়িবার যন্ত্র সহসা যদিও না উদ্ভাবিত হয়, ক্রমশ, অল্প অল্প উন্নতি হইতে হইতে এই প্রকারের ব্যোম-যান একদিন নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইবে। তখন—গ্যাসের আর কোন কাজ থাকিবে না, কেবল উহা বেলুনের ভারটি বহন করিবে মাত্র; আর প্রচালক ইক্ষু-যন্ত্র দ্বারা ঊর্দ্ধোত্তোলন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। এই প্রচালক-যন্ত্রটি ক্রমে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পাখীর ডানার ন্যায় কাজ করিবে, তখন বেলুনটি বাহুল্য হইয়া পড়িবে। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তখনকার যন্ত্র-বিজ্ঞানের অবস্থা-অনুসারে উড়িবার যন্ত্র উদ্ভাবন করা অসম্ভব, এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন যে প্রকার যন্ত্র-বিজ্ঞানের দিন দিন উন্নতি হইতেছে, এই উন্নতির কার্য্য আর ১৪ বৎসর সমানভাবে চলিলে, উড়িবার যন্ত্রের সম্ভাবনাটি বাস্তবে নিশ্চ

রই পরিণত হইবে। আজকাল, উড়ন্ত পাখীদিগের গতি এবং বায়ু-পথে গতিবিধি করিবার সাধারণ নিয়মসকল যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষিত হইতেছে। যদি সুযোগ্য কার্য্যদক্ষ যন্ত্র-কুশল পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তবে অচিরাৎ এই সমস্যাটি পূরণ হইবে সন্দেহ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যাটি এই, কিসে "বায়ু-পথে স্থির-ভাবে অবস্থান" থাকা যায়।

যদি উড়িবার যন্ত্রটি স্থায়ী, মজবুৎ, কার্য্যোপযোগী করিয়া গঠিত হয়, তাহা হইলে গতিবিধির জন্য এমন নিরাপদ যান আর দ্বিতীয় নাই। ৬৬ কিম্বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা হয় তো লণ্ডন হইতে নিউযর্ক নগরে উপনীত হইতে পারিব – কিম্বা প্রাতর্ভোজনান্তে লণ্ডন হইতে প্যারিসে পৌঁছিয়া, আবার মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে প্যারিস হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব। লৌহ ও বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কৃত হইয়া যেরূপ জগতের মধ্যে এক মহাপরিবর্ত্তন আনিয়াছিল—উড়ন্ত যন্ত্রের আবিষ্কারেও তাই হইবে। এই উড়ন্ত যন্ত্রসকল মহাবেগে আকাশপথে ধাবিত হইবে—ঘণ্টায় বোধ হয় ১০০ মাইল করিয়া চলিবে।

সমুদ্র-নাবিকতাতেও মহা পরিবর্ত্তন হইবে। অধুনা, যন্ত্র-কুশল পণ্ডিতেরা পরিচালক-শক্তির পুষ্টিসাধন করিয়া জাহাজের বেগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। লেখক অনুমান করেন, উহাঁরা সকলেই ভুল পথ ধরিয়াছেন। উহাঁদের উচিত, "সামুদ্রিক মৎস্যদিগের ধরণধারণ গতিবিধি" অনুশীলন করিয়া দেখা এবং ইহাও প্রণিধান করিয়া দেখা, কেন পর্পস্ মৎস্য অপেক্ষা টর্পিডোর বহু পরিমাণে অধিক চালক-শক্তির আবশ্যক। লেখক বলেন, "চর্ম্মোপরিস্থ ঘর্ষণ"ই এই প্রভেদের কারণ। এই কারণেই জাহাজ জলে অধিকাংশ বাধা প্রাপ্ত হয়। মৎস্যদিগের বহিঃত্বকের রচনাটি

আমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক। সকল প্রকার আবরণ অপেক্ষা মসৃণ ইস্পাতের আবরণ নিকৃষ্ট। লেখক বলেন, হাঙ্গরের ত্বকের অনুকরণ করিয়া সিমেণ্টিত কাগজের আবরণ জাহাজে দিলে কাজ চলিতে পারে। তাঁহার মতে, কোন সুযোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা চালাইবার জন্য যুদ্ধ-নাবীর কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রতি বৎসর ২।৩ হাজার পৌণ্ড ব্যয় মঞ্জুর করিলে ভাল হয়। আর এক কথা, তিমি-পৃষ্ঠের অনুকারী মার্কিন আদর্শের জাহাজে তরঙ্গ-জনিত বাধা বিদূরিত হইতে পারে। এইরূপ হইলে, আধুনিক জাহাজের যেরূপ চালক-শক্তি, তাহাতে জাহাজ ঘণ্টায় পঞ্চাশ 'নট্' করিয়া সমুদ্রে চলিতে পারিবে।

আর একটি সমস্যা। কয়লা না পুড়াইয়া কিরূপে উহা হইতে তাহার শক্তি বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, কয়লাকে এমন অবস্থায় কিরূপে আনা যায়, যাহাতে কয়লা বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারে। লেখক মনে করেন, এই সমস্যাটিও শীঘ্র পূরণ হইবে।

তাঁহার আর এক আশা—রসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিজ্জ খাদ্য সকল প্রস্তুত হইবে। সেই সকল খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে ঘাস একটি দ্রষ্টব্য। আমরা যদি ঘাসকে কোন উপায়ে পরিপাক করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের খাদ্যের আর অভাব থাকে না।

স্ত্রীলোকের কাজ করা কেন উচিত নহে?

সিসেরোঁর জি ফেরেরো সাহেব "মনিষ্ট" পত্রিকায় "সমাজতত্ত্ব ও জীবনতত্ত্বের দিক দিয়া স্ত্রী সমস্যা" নীমাংসা করিবার চেষ্টা পাই-

থাকেন। তিনি বলেন,—ইহা যেমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, পুরুষ জীবিকার জন্য শ্রম করিবে—যুঝাযুঝি করিবে, সেইরূপ ইহাও আর একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, স্ত্রীলোক জীবিকার জন্য শ্রম করিবে না—যুঝাযুঝি করিবে না। জীবনতত্ত্ববিদ্যা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছে যে, স্ত্রীপুরুষের শ্রমবিভাগের উপরেই জাতিবিশেষের শারীরিক উন্নতি নির্ভর-করে—কারণ ইহারই ঠিক্ সমানুপাতে জীবনের স্থায়িত্ব কাল। উচ্চতর জীবদিগের মধ্যে যে বিবাহ-প্রথা দেখা যায় তাহা কি?—না, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগের উৎকৃষ্ট একটি পদ্ধতি মাত্র। তা-দিবার সময় পুংপক্ষীই স্ত্রীপক্ষীর সমস্ত অভাব যুগাইয়া থাকে। অন্য সময়ে স্ত্রীপক্ষী যখন আহার অন্বেষণ করে, সে কেবল পুরুষপক্ষীকে সাহায্য করিবার হিসাবে। সিংহ ও শিয়ালগোরের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তবে যে, অসভ্য মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীজাতিকে শ্রম করিতে দেখা যায়, সে কেবল পুরুষের স্বার্থপরতা নিবন্ধন; সুতরাং, উহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। লেখক বলেন, যে জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের শ্রম প্রচলিত, সে জাতি অসভ্য অবস্থাতেই থাকিয়া যায়—তাহার আর উন্নতি হয় না। সভ্যজাতির মধ্যে ধনোৎপাদন কার্য্যে স্ত্রীলোকের শ্রম অনাবশ্যক। পুরুষই ধনোৎপাদনে সমর্থ। স্ত্রীলোকে শ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিলে পুরুষ-শ্রমের বাজার-দর কমিয়া যায়। আজকাল স্ত্রীলোকেরা কারখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই জন্য য়ুরোপে কত পুরুষ পালে পালে কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতেছে অথচ কর্ম্ম পায় না—মধ্যে মধ্যে অনেকেই বেকার হইয়া পড়ে। ইহা একটি ভয়ানক অমঙ্গলের কথা—ইহা একটি সামাজিক রোগের লক্ষণ। তথ্যসংগ্রহ-তালিকায় দেখা যায়, যে সকল দেশে মায়েরা শ্রমজীবী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেখানে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের

...ছে। আদর্শস্থানীয় স্ত্রীলোক শ্রীসৌন্দর্য্য ...কাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং ...হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।... শ্রমজীবী ...ড়ে এবং তাহার স্ত্রীসুলভ সমস্ত লক্ষণ ...লভ শ্রীসৌন্দর্য্য ও পুরুষের স্ত্রীলোকের ...ইট ব্যাপার হইতেই বাৎসল্য প্রভৃতি ...র বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রী হ'চ্চে ...।

...তার ফল অধিকাংশ নিজে অর্জ্জন করি- ...স্ত্রীলোকে তাহা অধিক করিয়া ভোগ ...পুরুষ পূর্ব্বেও যেমন খাটিয়া আসিয়াছে ...ছে—ইহাতে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব কিছুই ...বের প্রকৃত কর্ত্তব্য। অতএব, পুরুষের ...অংশী হইলে স্ত্রীলোকের লাভ কি ...সবুর করিয়া থাকিলেই যখন পুরুষেরা ...সমস্ত পরিশ্রমের ফল আনিয়া দিতে ...নিজের জন্য এত মাথাব্যথা কেন?

...বুঝিতে পারি না, রাজ্যতন্ত্রে স্ত্রীলোকের ...বিষয়ে সাধারণের মধ্যে কেন এত ...ীলোকের ইহাতে কোন লাভ নাই। ...ভাব জীবনের সমস্ত সুখ-সামগ্রী সর্ব্ব- ...ন কি তাঁহার স্ত্রীর সেই সকল স্বার্থ ...তাঁহার নিজের পারিবারিক স্বার্থের

ব্যক্তিগত শিক্ষা-প্রণালী।

যদি কোন পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অধীনস্থ ছাত্রদিগকে এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের নিজত্ব না ফুটাইয়া তুলিয়া যদি একটা সাধারণ আদর্শে সকলকেই গঠিত করিবার প্রয়াস পায়, তবে বুঝা যায় যে, সে পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত শিক্ষাবিধানে নিতান্ত অযোগ্য ও অসমর্থ। প্রকৃত শিক্ষা কি? না, আত্মোৎকর্ষ সাধন—উন্নতি সাধন। যাহা আত্মার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে থাকে তাহা উপর দিকে আনা—উন্নয়ন করা—নিজত্বের কর্ষণ করা—নিজেকে নিজের যথার্থ অনুরূপ করিয়া তোলা। কোন ব্যক্তিবিশেষকে একটা স্থানীয় আদর্শের কিম্বা লৌকিক আদর্শের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে গেলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে, এই সোজা কথাটি এখন অনেকে পূর্ব্বাপেক্ষা বুঝিতে পারিতেছেন। তাহার সাক্ষী, পূর্ব্ব ও কলরাডোর সরকারী পাঠশালায় আজকাল "ব্যক্তিগত শিক্ষা-প্রণালী" অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তত্রস্থ বিদ্যালয়সমূহের স্থানীয় তত্ত্বাবধারক সার্চ সাহেব "এডুকেশন রিভিউ"র ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এই বিষয়টি বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "এখানকার বিদ্যালয় সকল যে আদর্শে গঠিত, তাহার প্রধান লক্ষণ হচ্চে ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ।" প্রত্যেক ছাত্র "ব্যক্তিভাবে কাজ করে, ব্যক্তিভাবে উন্নতি লাভ করে, ব্যক্তিভাবে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং ব্যক্তিভাবেই পরীক্ষার চিহ্নিত ধাপে ক্রমশ উত্থান করে।" ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যই সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়। দৈহিক আত্মোৎকর্ষের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ একটি পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ৬ টা হইতে ৬৷৷০ টা পর্য্যন্ত সাহেব কাল নির্দ্দিষ্ট—তাহার অতিরিক্ত কালে কোন কাজ করা

য় না। স্কুলের সকল বিভাগেই "কিণ্ডার গার্টেন" নামক পর্য্যবেক্ষণ-প্রধান শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হয়। 'প্রত্যেক ছাত্র আপনার কাজ যতদূর পারে করিয়া যায়। প্রত্যেক ঘরে কতকগুলি ছাত্র পৃথক পৃথক ডেস্কে বসিয়া পৃথক্ ভাবে আপন আপন কাজ করে—শিক্ষক তাহাদিগকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া কিম্বা মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া অথবা লেক্‌চার দিয়া কিম্বা ব্যাখ্যা করিয়া সময় নষ্ট করেন না। তিনি কেবল প্রত্যেকের ডেস্কের নিকট গিয়া, ছাত্রদিগের সহকারীস্বরূপ হইয়া উৎসাহ উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার এক উদ্দেশ্য কিসে তাহাদের আত্ম-নির্ভর অভ্যাস হয় ও স্বতন্ত্রতা প্রস্ফুটিত হয়। কাজের জন্যই কাজ করিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আর কোন উদ্দেশ্য উহাদের সম্মুখে ধারণ করা হয় না। কাজ ভাল করিলে কোন পুরস্কার দেওয়া কিম্বা কোন চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত কর কিম্বা কোন প্রকার বাহ্য সম্মান প্রকাশ করা—এ সমস্ত কিছুই না—ফলতঃ তাহার প্রয়োজনই হয় না। যাহা হউক, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র কার্য্যসকল সুশৃঙ্খলাক্রমে নিরূপিত হয় এবং বিভিন্ন ছাত্রের উন্নতিক্রম রীতিমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়—তাহাতে প্রত্যেক ছাত্রের কতটা উন্নতি হইল স্বতন্ত্ররূপে জানিতে পারা যায়।

কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই আধুনিক ভাষা সকলের শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যাকরণের কোনও নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ পড়ান হয় না। সার্জ্ক সাহেব বলেন, তাঁহার পদ্ধতির গুণ এই যে, উহাতে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয় এবং আত্ম-নির্ভর অভ্যাস হয়। তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক ছাত্রই ছাত্রের আদর্শস্থল। ইহাতে বেশি কাজ করা যায়—অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে কাজ করা যায়—এবং অপেক্ষাকৃত উৎসাহের সহিত কাজ করা যায়। ইহাতে কেহই নিরুৎসাহ হয় না। যাহারা বুদ্ধিতে ততটা উজ্জ্বল নহে, তাহাদিগকে বেশি-বুদ্ধিমান ছাত্রদিগের

অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। কম-বুদ্ধি ছাত্রদিগকে বেশিবুদ্ধি ছাত্রদিগের সহিত একসঙ্গে টানিয়া-হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয় না। স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে প্রত্যেককেই অবসর দেওয়া হয়।

শিশুদিগের নীতিশিক্ষা।

আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে আজকাল "ধর্ম্মশঙ্কটের" যে মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, সেই বিষয় উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক হিস্‌লপ "কোরমের" ক্ষেত্রযাবী সংখ্যায় বলেন, বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম লইয়া আজকাল বৃথা গণ্ডগোল হইতেছে। কেবল একমাত্র "বাইবেল" গ্রন্থ পড়ান হইবে কি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক উপদেশের শিক্ষা দেওয়া হইবে—এই লইয়া দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে, কি ইংলণ্ড কি আমেরিকা, সর্ব্বত্রই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। অধ্যাপক প্রবারাস্তরে বলিতে চাহেন, তোমরা দুজনেই অবঃপাতে যাও—তোমাদের মধ্যে কোন পক্ষই ঠিক্ কথা বলিতেছ না—তোমরা উভয়ই ভ্রান্ত। আজকাল বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াইয়া, যে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে না ধর্ম্ম—না নীতি কিছুরই প্রকৃত শিক্ষা হয়। অন্য পাঁচ রকম জ্ঞানচর্চ্চা যেরূপে হয় ইহাও সেই জ্ঞানচর্চ্চার সামিল হইয়া পড়িয়াছে। "নীতি-শিক্ষা ইচ্ছাশক্তির পরিচালক হইবে, শুষ্ক ন্যায়-শাস্ত্রের শাণিত অস্ত্র চালনা করা কিম্বা বিবিধ জ্ঞানের দ্বারা মনের উদরপূর্ত্তি করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।"

"কোন প্রকার ধর্ম্মমতের শিক্ষা দিয়া নীতিশিক্ষার কাজ সম্পন্ন হয় না। ইহার দ্বারা মেধা ও শক্তি পরিপুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা ধর্ম্মবুদ্ধি কদাপি পরিপুষ্ট হয় না। তিন প্রকার উপায়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইতে পারে—তাহা সংক্ষেপে তিন কথায় বলা

যায়—দৃষ্টান্ত, মৈত্রী ও আত্মশাসন। একটু বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় এই—(১) শিক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অভ্যাস। (২) ছাত্রদিগের প্রতি শিক্ষকের বাৎসল্য এবং কোন এক যুক্তিমূলক ভিত্তির উপর জীবনের অনুশাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বলেন, "ছাত্রকে নীতিসম্পন্ন করিতে হইলে প্রথমতঃ শিক্ষা-প্রণালীটিকে নীতি-অনুমোদিত করা চাই। ইহা সাধন করিবার একমাত্র উপায়—শিক্ষাকার্য্যে বণিক-সুলভ আর্থিক পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নৈতিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করা। শুদ্ধ ছাত্রের সংখ্যা লইয়া কিম্বা শিক্ষকের বিদ্যাবত্তা লইয়া প্রতিযোগিতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না—কোন্ শিক্ষক কতটা শিষ্য-বৎসল—স্বকীয় নৈতিকগুণের প্রভাবে ছাত্রদিগের শ্রদ্ধাভক্তি কতটা আকর্ষণ করিতে পারেন—এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা হওয়া আবশ্যক। বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধারকদিগের এই কথাটি জানা উচিত যে, পাঠশালা ও বিদ্যালয় নীতি প্রচারের স্থান—উহা জীবিকা-নির্ব্বাহের স্থান নহে। নীতি, সমাজ-প্রসূত ফল; উহা বুদ্ধিচর্চ্চা বা বিজ্ঞান-শিক্ষার ফল নহে। ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত, ব্যক্তিগত কারুণ্যই উহার প্রকৃত ভিত্তি-ভূমি এবং শিক্ষাকে ফলবতী করিতে হইলে উহাকে এই ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য।"

নূতন তাম্রশাসন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

পূর্ব্ব সংখ্যায় নারায়ণ ভট্টারক বা ভট্টনারায়ণের উদ্দেশে রাজা ধর্ম্মপাল-কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাম্রশাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশিত

হইয়াছে তাহাতে জানা যায় পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা বাঙ্গলাদেশে শুভস্থলী নামক স্থানে রাজা ধর্ম্মপালের মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মা এক দেবকুল বা দেউল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার "লাট" দেশীয় কতকগুলি দ্বিজের উপর ন্যস্ত করেন—এবং ভট্ট-নারায়ণ উক্ত দ্বিজগণের স্থানে অতিথিস্বরূপ আগমন করেন। লেখার ভঙ্গীতে উক্ত লাট-দেশীয় দ্বিজেরা বিশেষ গণ্যমান্য ও পূজ্য লোক ছিলেন বোধ হয়; কেন না অভ্যাগত ভট্টনারায়ণ "তৎপ্রতি-পালক-লাটদ্বিজ-দেবার্চ্চকাপি-পাদমূল-সমেত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "পাদমূলসমেত" শব্দে উক্ত ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণের গুরু-শ্রেণীর লোক ছিলেন বিবেচনা করিতে হইবে। প্রাচীন ঘটকেরা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে কাহারই নাম ভট্টনারায়ণ নহে। উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় তাঁহার নাম ক্ষিতীশ। কেহ কেহ বলে ক্ষিতীশ ভট্টনারায়ণের পিতা। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন ভট্ট-নারায়ণের পিতার নাম ভট্টরামেশ্বর*। তাহাতে আদিশূরানীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সহিত ভট্টনারায়ণের সম্পর্ক অনিশ্চিত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক ভট্টনারায়ণের এপ্রদেশে আগমনের অল্পকাল পূর্ব্বেই আদিশূর-কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন, ইহা এক প্রকার অবধারিত। কেন না ভট্টনারায়ণ ধর্ম্মপালের সময় এদেশে আইসেন এবং প্রাচীন ঘটক হরিমিশ্রের পোথাতে প্রমাণ—পালবংশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করার অল্পকাল পূর্ব্বেই আদিশূর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি ভীমশাসনের "লাটদ্বিজ"গণকে কান্য-কুব্জ-দেশীয় দ্বিজ বলিয়া গণ্য করা যায় তাহা হইলে ইহা নিতান্ত

* অগন্মোহন তর্ক অঙ্কার একাশিত বেণীসংহারের মুখবন্ধ ১পৃঃ।

সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায় যে, উক্ত লাটদ্বিজগণই আদিশূর-কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ বা তাঁহাদের সন্তান সন্ততি ছিলেন। তাঁহারা ভট্টনারায়ণের স্বদেশীয় ও পরিচিত গুরুপর্য্যায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারাই অগ্রে আদিশূরের সময়ে এদেশে সমানীত হইয়া বসবাস করেন। ভট্টনারায়ণও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া এদেশে আইসেন।

এখন "লাট"দেশ কোথায় ছিল এই সমস্যা উঠিতেছে। আমি দেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য কোনও কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা "লাট" দেশ কোথায় ছিল সম্যক্ বলিতে পারেন নাই। অলঙ্কার শাস্ত্রে "লাটানুপ্রাস" নামক এক প্রকার শব্দালঙ্কারের উল্লেখ আছে। তাহা লাটদেশবাসী জনগণের প্রিয় ও আদৃত লাটানুপ্রাস বলিয়া উল্লিখিত হয়। তাহাতে লাটদেশ যে বিদ্বান ও সুকবির দেশ তাহা স্পষ্ট।

যাদের ঘটকেরা লেখেন—

আস্তে পশ্চিমদিগ্বিশেষ বিষয়ে শ্রীকান্যকুব্জাভিধঃ
তন্মধ্যেচ বিশিষ্ট-বিপ্রনিলয়ঃ কোলাঞ্চদেশঃ শুভঃ।

এই বিশিষ্ট বিপ্রনিলয় কোলাঞ্চদেশ হইতেই আদিশূর পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই "কোলাঞ্চ" দেশেরই অপর নাম "লাট" দেশ কি না?—অথবা কান্যকুব্জনগর যে প্রদেশে অবস্থিত ছিল—তাহারই নাম "লাট" দেশ ছিল কি না?

কোনও কোনও ইংরাজ পণ্ডিতের মতে গুজরাটি দেশের একাংশের নাম লাট দেশ †। আমার বিবেচনায় ইহা হইতে পারে না। মালব দেশের অন্তর্গত দশপুর নামক নগরে একটি

† Indian Antiquary XXII. P 183.

মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। দশপুর এক্ষণে "মন্দসর" নামে অভিহিত এবং সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত। এই সূর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট একখণ্ড প্রস্তরে জে এফ্ ফ্লীট সাহেব মহোদয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এক অতি বিচিত্র শিলালিপি আবিষ্কার করেন। ইহার প্রতিলিপি Indian Antiquary XV. P 196. তে দ্রষ্টব্য। তাহাতে উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। লেখা আছে যে, এক সম্প্রদায় পট্টবস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায় কুমারগুপ্তের রাজত্বসময়ে "লাট" দেশ হইতে দশপুর নগরে আসিয়া বসবাস করে। তৎকালে বন্ধুবর্ম্মা নামক নরপতি দশপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই তন্তুবায়েরা সুচিক্কণ ও সুচিত্রিত পট্টবস্ত্র বয়নে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা রাজসম্মান লাভ করিয়া বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহাদেরই ব্যয়ে সম্বৎ ৪৯৩ অব্দে দশপুরের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই শিলালিপিতে কুমারগুপ্ত এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন

চতুঃসমুদ্রান্তবিলোলমেখলাং
সুমেককৈলাসবৃহৎপয়োধরাম।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীং
কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি॥

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে লাটদেশীয় তন্তুবায়েরা কুমারগুপ্তের উল্লেখ করে কেন? কুমারগুপ্ত কান্যকুব্জের একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট। তন্তুবায়েরা যখন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে আমরা এদেশে (দশপুরে) আসিয়া-

-তখন কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে তাহারা কুমারগুপ্তের
ছা ছিল? তাহাতে লাট-দেশ কি কান্যকুব্জেরই অন্ত-
না?

উক্ত শিলালিপিতে "লাট" দেশ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়, যথা—

"কুসুমভবানততরুবর দেবকুলস ভাবিহারবয়নীয়াং
লাটবিষয়ান্তর্গতাত্ত শৈলাজ্ঞাতি প্রথিতশিল্পাং॥" ইত্যাদি।

"লাট" দেশ কুসুমভরে অবনত তরুরাজিতে সুশোভিত, তথায় বহুতর দেউল-সভাগৃহ ও বৌদ্ধ বিহার ছিল। তথাকার শৈল সকল বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন ছিল।—এই বর্ণনা কান্যকুব্জ দেশের পক্ষেও খাটে।

বিশ্বকোষ নামক অভিনব বঙ্গভাষার অভিধান-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"যে সময়ে প্রাচীন কনোজের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল তৎকালে এখানে অনেক দেবমন্দির ও বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও সঙ্ঘারাম ছিল। চীন পরিব্রাজক হিয়োন সিয়াং খৃষ্টের ৭ম শতাব্দে লিখিয়া গিয়াছেন নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে তিনটি সঙ্ঘারাম। তন্মধ্যে মণিমাণিক্যবিভূষিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। বহু দূর হইতে যাত্রীগণ এখানে পূজা করিতে আসেন। সঙ্ঘারামের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে এক শত ফুট উচ্চের দুইটি বিহার আছে। সঙ্ঘারামের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বে দুই শত ফুট একটি বৃহৎ বিহার—তন্মধ্যে তাম্রনির্ম্মিত ৩০ ফুট উচ্চ বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। বিহারের চতুঃপার্শ্বের প্রাচীরে খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তরনির্ম্মিত বিহারের নিকটে সূর্য্যমন্দির। তাহারই অনতিদূরে দক্ষিণে মহেশ্বরের মন্দির আছে। সেই দুইটি মন্দির নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বিবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত।"

এই বর্ণনার সহিত শিলালিপিতে লাটদেশের বর্ণনা পাঠকবর্গ তুলনা করিবেন—দেখিবেন মেলে কি না। অধিকন্তু ইহাও

সম্ভব যে, লাটদেশীয় তন্তুবায়েরা কনোজের নীলপ্রস্তরনির্ম্মিত সূর্য্যমন্দিরের অনুকরণ করিয়াই দশপুরের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহাতে কনোজ নগরেই তাহাদের আদি বাসস্থান ইহা অনুমান করার কারণান্তর পাওয়া যাইতেছে।

ফলতঃ "লাট" দেশ যদি গুজরাট হয় তাহা হইলে মালবদেশ যখন গুর্জ্জরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত, তখন উক্ত তন্তুবায়ের দশপুরকে পূর্ব্বদেশস্থ না পশ্চিমদেশস্থ বলিবেন? শিলালিপিতে দেখা যায়—

বিস্তীর্ণতুঙ্গশিখরং শিখরিপ্রকাশং
অভ্যুদ্গতেন্দুমল-রশ্মিকলাপগৌরম্।
যদ্ভাতি পশ্চিমপুরস্য নিবিষ্টকান্তি
চূড়ামণিপ্রতিসমন্নয়নাভিরামং॥

অর্থাৎ তন্তুবায়েরা যে সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করেন তাহা পশ্চিমদেশীয় দশপুর নগরের চূড়ামণিস্বরূপ হইয়াছিল। এখন যদি গুজরাট হয় তাহা হইলে তদ্দেশবাসী তন্তুবায়েরা মালবদেশের অন্তর্গত দশপুরকে কি প্রকারে "পশ্চিমপুরস্য" বলিতে পারে? ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লাটদেশ মালবের পূর্ব্ব বিভাগে অবস্থিত ছিল। সুতরাং গুজরাটের সহিত তাহার কোনও ক্রমেই ঐক্য হইতে পারে না। লাটদেশকে গুজরাটের অন্তর্গত ইহা ফ্লীট সাহেব মহোদয়ের মত। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত শিলালিপিতেই তাঁহার মত খণ্ডন হইতেছে।

রামায়ণে লিখিত আছে কুশের পুত্র কুশনাভ কনোজনগর নির্ম্মাণ করেন।

"কুশনাভস্তু তৎপুত্রঃ পুরং চক্রে মহোদয়ম্।
রামায়ণ আদিকাণ্ড ৩২।৬।

কনোজ নগরের অন্য নাম মহোদয়। সূর্য্যবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায় কনোজে প্রাচীন কালে সূর্য্যদেবের উপাসনা

প্রচলিত ছিল। সূর্য্যই সূর্য্যবংশীয় রাজাদের কুলদেবতা। তাই কনোজে নীলপ্রস্তরনির্ম্মিত কারুকার্য্যশোভিত বিশাল সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান ছিল। কনোজ হইতে দেশান্তরে গিয়াও তাই তন্তরায়েরা সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রাঠোর বা রাষ্ট্রকূট বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের আক্রমণে কনোজ-রাজ্য নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠে। রাষ্ট্রকূটেরা কনোজ হইতে গুর্জ্জর পর্য্যন্ত লুটপাট করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোবিন্দ নামক নরপতি রাষ্ট্রকূটদিগের একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য গঠন করেন (Indian Antiquary V 125.)। এই গোবিন্দের শিলালিপিতে জানা যায় তিনি শকাব্দা ৭৩০ খৃষ্টাব্দ ৮০৮ বৎসরে জীবিত ছিলেন। ইন্দ্র নামক স্বীয় এক ভ্রাতাকে গোবিন্দ "লাটেশ্বর মণ্ডল" প্রদান করেন। ডাক্তার বি উ. র সাহেব এই লাটেশ্বর মণ্ডলকে গুর্জ্জর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা নহে। এই লাটেশ্বর মণ্ডল বাস্তবিক কনোজেশ্বর নরপতির শাসনাধীন দেশ। রাষ্ট্রকূটবংশীয় ইন্দ্র এইরূপে কনোজ রাজ্য অধিকার করিলে আমাদের ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজাকে তাড়াইয়া দিয়া কনোজরাজাকে পুনর্ব্বার স্বীয় সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন। এই কথা আমাদের নূতন তাম্রশাসনে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ-
ভূ'পৈর্য্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধু সঙ্গীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালরুদ্ধোদ্ভূতকনকনগস্বাভিষেকোদকুম্ভো.
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জস্সললিততলিতজ্বলতালস্ত্র যেন॥

অর্থাৎ ধর্ম্মপাল রাজা কান্যকুব্জের অধিপতিকে স্বীয় "অভিষেকোদ-

কুম্ভ" প্রদান করেন। কনোজরাজ শত্রু দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন—ধর্ম্মপাল সেই শত্রুগণকে তাড়াইয়া কনোজরাজকে পৈতৃক সিংহাসন প্রদান করিলে পঞ্চালবৃদ্ধেরা হৃষ্ট হইয়াছিল এবং ভোজ মৎস্যাদি জনপদের রাজারা যাহারা কনোজের সিংহাসনাধীন ছিল পুনরায় কনোজরাজের বশ্যতা অঙ্গীকার করিল।—

নারায়ণপালের তাম্রশাসনে উপরোক্ত ঐতিহাসিক বার্ত্তার টীকা স্বরূপ শ্লোক দেখা যায়—

জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীন্ অরাতীন্
উপার্জ্জিতা যেন "মহোদয়"-শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্চ্চিষিত্রে
চক্রায়ুধায়ানতবামনায়॥

তিনজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতে উত্তরোত্তর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার অর্থ সম্যক্ স্পষ্টীকৃত হয় নাই। প্রথমত রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শ্লোককে আক্রমণ করিয়া তৎ করেন যথা—

Having conquered Indra Raja and other kings, he (Dharma Pala) earned the glorious Sri (goddess of fortune) whom he presented as a sacrifice, to the father of wealth, Vamana, the wielder of the discus (Indo-Aryans Vol II P 270.)

এই ব্যাখ্যা অসমীচীন বিবেচনায় ডাক্তার হুলজ অনুবাদ করিয়াছেন—

This mighty one again gave the sovereignty, which he had acquired by defeating Indra Raja, and other enemies, to the begging Chakrayudha, who resembled

a dwarf in bowing—just as formerly Bali had given the sovereignty (of the three worlds) which he had acquired by defeating Indra and his other enemies (the gods) to the begging Chakrayudha (Visnu) who had descended to earth as a dwarf (Indian Antiquary XV. P 307.)

ডাক্তার হুলজের পর গটিঞ্জেনের অধ্যাপক কিল্‌হরণ সাহেব দেখাইয়া দেন যে, শ্লোকে যে "মহোদয়শ্রীঃ" শব্দ আছে তাহাতে কান্যকুব্জের রাজত্ব বুঝিতে হইবে। মহোদয় শব্দ কান্যকুব্জের নামান্তর মাত্র তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অধ্যাপক কিল্‌হরণের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। তদনুসারে দেখা যায় যে, কনোজের তদানীন্তন রাজার নাম ছিল "চক্রায়ুধ"। তিনি রাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে ধর্ম্মপাল তাঁহার সহায় হইয়া ইন্দ্ররাজকে তাড়াইয়া দেন।—কিন্তু এপর্য্যন্ত এই ইন্দ্ররাজা কে তাহা কেহই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। আমার বিবেচনায় রাষ্ট্রকূটাধিপতি দ্বিতীয় গোবিন্দ আপনার ইন্দ্র নামক যে ভ্রাতাকে লাটেশ্বর মণ্ডল দিয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাভূত ইন্দ্ররাজ তিনিই—আর কেহ নহেন!!! এই ইন্দ্ররাজ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন, ধর্ম্মপালও ঠিক সেই সময়েই রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা পণ্ডিতগণের অনুমোদিত। রাষ্ট্রকূটেরা যদিও কিছু কালের জন্য ধর্ম্মপালের প্রতাপে কনোজ হইতে নিঃসারিত হইলেন, কিন্তু আবার তাঁহারা কনোজ আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। যে জয়চন্দ্র মহম্মদঘোরীর সময় কনোজের রাজা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক জন কনোজাধিপতি রাষ্ট্রকূট বা রাঠোরবংশীয় ছিলেন।

এক্ষণে তাম্রশাসনের ইন্দ্ররাজা যদি দ্বিতীয় গোবিন্দের ভ্রাতা

রাষ্ট্রকূটবংশীয় ইন্দ্ররাজা হয়েন—তাহা হইলে তদধিকৃত লাটেশ্বর মণ্ডল ও কনোজ রাজ্য যে একই তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না এবং লাট-দেশ ও কনোজ-দেশেরও ঐক্য সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

কান্যকুব্জ নগর লাটদেশেই অবস্থিত ছিল বলিয়া আমি বিবেচনা করি। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া কান্যকুব্জ আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান রাজধানী ছিল। সমুদায় প্রদেশের নাম পঞ্চাল দেশ। তাহারই একাংশকে লাটদেশ বলিত বোধ হয়। তথাকার ব্রাহ্মণেরা ও শিল্পীরা দেশ দেশান্তরে সমাদৃত হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে লাটদেশের পট্টবস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়েরা মালব দেশে গিয়া রাজসম্মান পাইয়াছিলেন এবং খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীতে তদ্দেশের ব্রাহ্মণেরা পুণ্ড্র বা বঙ্গদেশে আসিয়া রাজাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন।

ক্রমশ।

যোগসিদ্ধ জ্ঞান ও যোগানন্দ।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসটি সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল যে, ভাষা গঠন করা মানব-শক্তির অতীত—উহা দেব-দত্ত অলৌকিক শক্তি। অগ্নির আবিষ্কার ও ব্যবহার, গোধূমের চাষ, আঙ্গুর হইতে মদ প্রস্তুত করা, এ সমস্ত যদিও মানুষের চেষ্টায় ক্রমশঃ হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ লোকে মনে করিত, এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ দেবতার দান। দেবতার সংখ্যা যত হ্রাস হইতে লাগিল, প্রাকৃতিক কার্য্যকারণের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই সকল প্রাকৃতিক বস্তুর অলৌকিকতা ততই কমিয়া আসিল। কিন্তু ভাষা

সম্বন্ধে এখনও অনেকের বিশ্বাস, ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভাষা আমরা একেবারেই প্রাপ্ত হইয়াছি,—উহা মানুষের স্বাভাবিক চেষ্টায় ক্রমশঃ বিকশিত হয় নাই।

যেমন ভাষা সম্বন্ধে,সেই প্রকার আর কতকগুলি মনোভাব সম্বন্ধে লোকের এইরূপ সংস্কার। মানুষ যখন জীবনের রহস্য চিন্তা করে—কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, সবিস্ময়ে যখন এই সকল কথা ভাবে, তখন তাহার মনে হয়, ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ছাড়া আর কোনও উচ্চতর জ্ঞানের দ্বার অবশ্যই আছে। প্রাকৃতিক জ্ঞান অর্জ্জনের পন্থা অতিশয় অনিশ্চিত এবং উহা কালবিলম্বসাপেক্ষ —সে পথ অবলম্বন করিতে হইলে অনেকটা ধৈর্য্য চাই। মানুষ জীবনের রহস্য উদ্ভেদের জন্য নিতান্ত অধীর। তাহার ইচ্ছা, কোনও অলৌকিক উপায়ে, যদি একেবারেই সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য, মানুষ আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ কল্পনা করিয়া তাহা হইতে অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় চিন্তা করে।

বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে, যে সকল উপায়ে এই অলৌকিক দৈব জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে তাহা স্থূলরূপে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—দেবতা কিম্বা দেব-দূতের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ। অনুগৃহীত ব্যক্তির নিকট দেবতারা প্রত্যক্ষ বাহ্য সঙ্কেত দ্বারা কিম্বা দৈববাণীর দ্বারা আবির্ভূত হন। দ্বিতীয়তঃ—অনুগৃহীত ব্যক্তির অন্তরে দেবতার অধিষ্ঠান হওয়ায়, তাহার দেহ ও মনে দারুণ আবেগ ও আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে অচেতন হইয়া নানা প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতে থাকে—কখন বা যুক্তিযুক্ত বাক্যও উচ্চারণ করে। এই অবস্থাকে দশাপ্রাপ্তি বলে। তৃতীয়তঃ—

যোগ-বলে দিব্যজ্ঞান লাভ। সাধক পরমাত্মা সহিত আত্মার সাক্ষাৎভাবে যোগ সাধন করিয়া, অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, লৌকিক জ্ঞানের অতীত এমন সকল আধ্যাত্মিক জগতের সত্য উপলব্ধি করেন, যাহা সচরাচর বুদ্ধি জ্ঞানের একেবারেই অগম্য।

এই তিন শ্রেণীর দৈবজ্ঞান লাভের উপায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এক এক ধাপ করিয়া যেন উন্নতির সোপান উঠিয়াছে—উত্তরোত্তর যেন অধিকতর মার্জ্জিতভাব ধারণ করিয়াছে। আজকাল দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ কিম্বা প্রলাপোক্ত দৈববাণীর সত্যতা সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকেরা বড় বিশ্বাস করেন না। যে ব্যক্তি বলে আমি দেবতাকে চাক্ষুষ দেখিয়াছি কিম্বা দৈববাণী শুনিয়াছি, তাহাকে পাগল বলিয়াই লোকে উড়াইয়া দেয়। কেবল যোগা; দৈবজ্ঞানের বিষয় সুসভ্য দেশের শিক্ষিত লোকেরাও অনে বিশ্বাস করেন।

এই যোগসিদ্ধ দৈবজ্ঞান বা আপ্তজ্ঞানের আসল ভাবটা কি? আধ্যাত্মিক জগতের সত্য জানিবার পক্ষে ইহাই কি নিশ্চিত উপায় —প্রকৃষ্ট সাধন? গোড়ায় এই কথাটি যেন আমাদের স্মরণ থাকে, যে, এই প্রকার দৈবজ্ঞান লাভ, কোন জাতিবিশেষের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব অধিকার নহে। কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, সকল ধর্ম্মের উপাসকেরাই এই সাধনপদ্ধতিটি অবলম্বন করিয়াছেন। শরীর হইতে—বহির্জ্জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করিয়া কিরূপে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎভাবে যোগনিবদ্ধ করিতে পারা যায়, সকলেরই সেই চেষ্টা। ইহার প্রকরণটি এইরূপ;—কোন বাহ্য পদার্থের উপর কিম্বা নাসাগ্র নাভিদেশ প্রভৃতি শরীরের অংশবিশেষের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কোন একটি

বিশেষ বিষয়ে সুতীব্র দীর্ঘকালব্যাপী তন্ময় চিন্তা-প্রবাহ প্রয়োগ করিতে করিতে সাধকের একপ্রকার আত্মহারা অবস্থা উপস্থিত হয়—তখন জ্ঞান ও বুদ্ধির কার্য্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়া, আত্মজ্ঞান লুপ্ত হইয়া মনে হয় যেন জীবাত্মা পরমাত্মাতে একাকার হইয়া গিয়াছে। তখন সেই ব্রহ্মনিমগ্ন আনন্দময় আত্মার সমক্ষে যে সকল অনির্ব্বচনীয় সত্য প্রকাশ পায়, তাহা যুক্তির শৃঙ্খলানুসারে ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি হয় না, পরন্তু একেবারেই মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

মড্‌স্‌লি বলেন—দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, এই পদ্ধতি অনুসারে যে আপ্তজ্ঞান বা আপ্তবচন পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার। যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা সাধন করিয়াছেন তখন [illegible]য় সত্য বাহির হইয়াছে—যখন হিন্দু সাধক সাধনা করিয়াছেন, [illegible]ন অন্য প্রকার সত্য তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। [illegible]কভেদে সাধনার ফল যে বিভিন্ন হইয়াছে তাহা খৃষ্টসম্প্রদায়দিগের মধ্যেই দেখা যায়। সেণ্ট থেরেসা যেরূপ ঈশ্বরদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত সুইডেনবর্গের ঈশ্বরদর্শনের ঐক্য হয় না। ঈশ্বরের ত্রিরূপ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মত, আবার য়ুনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের ভক্ত সাধক যে ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রাপ্ত হন তাহাতে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বর্জ্জিত। এই পদ্ধতিটির অসুবিধা এই যে, সত্য মূল উৎস হইতে অবিকৃত ভাবে না আসিয়া সাধকের অবস্থা অনুসারে একটু বিকৃত—একটু কলুষিত হইয়া পড়ে।

প্লোটাইনস্ সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টীয়-মণ্ডলীর মধ্যে এই যোগ-সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাঁহার যে এই শিক্ষা হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্লোটাইনস্ বলেন, জ্ঞানের দ্বারা অনন্তস্বরূপকে জানা যায় না, যেহেতু জ্ঞানের

সীমা আছে। সসীম ব্যক্তির যদি অসীমকে জানিতে হয়,তবে সসীমকে অসীমে পরিণত হইতে হয়। কেন না, অসীমই অসীমকে জানিতে পারে। যে জীবাত্মা অনন্তজ্ঞানস্বরূপ হইতে প্রসূত, সেই অন্তরস্থ জীবাত্মা যখন আপনার ক্ষুদ্র আত্মত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়,তখনই সে মহান্ সত্যের অধিকারী হয়। এই তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে যোগসাধনই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই উপায়েই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।.. এই দিব্যজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় স্থায়ী বস্তু নহে। ইহা মনের একটি ক্ষণিক অবস্থা মাত্র। একপ্রকার উন্মত্ত অবস্থার মধ্যে থাকিয়া দিব্যজ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ মাত্র বিদ্যুতের ন্যায় অনুভূত হয়—দেহপিঞ্জর হইতে মনবিহঙ্গ ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়—মানব-অন্তরে যে দিব্য স্ফুলিঙ্গ অধিষ্ঠিত, তাহার অনন্ত উৎসের সহিত সে মুহূর্ত্তের জন্য মিলিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই, যখন জীবাত্মা আবার তাহার নিজত্ব লাভ করে, তখন তাহার এই সসীম অবস্থাতেও অসীমের কথা স্মরণ করিতে পারে। অথচ পূর্ব্বে অসীমে পরিণত না হইয়া অসীমকে জানিবার উপায় ছিল না। তা যদি স্মরণ না হইবে, তবে কি করিয়া প্লোটাইনস্ আপনার সেই তুরীয় অবস্থার কথা অন্যের নিকট পরে বর্ণনা করিতে পারিলেন? তিনি ব্যক্তিরূপে জীবাত্মারূপে পূর্ব্বে যে বিষয়ের জ্ঞানলাভে অসমর্থ ছিলেন, ব্যক্তিরূপে জীবাত্মারূপে সেই জ্ঞানই আবার অন্যের নিকট বর্ণনা করিতে কি করিয়া সমর্থ হইলেন? সহজ বুদ্ধিতে ইহা বুঝা কঠিন। আত্মজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা যখন অনন্ত আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়,তখনকার যে অবস্থা—আর পুনর্ব্বার আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া আসিলে যে অবস্থা হয়—এই দুই অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমাত্মভাবাপন্ন অবস্থা জীবাত্মার আত্মজ্ঞানে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। জীবাত্মা হইয়া জীবাত্মার

ধারণার অতীত সেই পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিবে কি করিয়া? ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক মড্‌স্‌লি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সাধক ধ্যানযোগে যে সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তাহা যে সর্ব্বৈব সত্য তাহা না হইতে পারে, নিজের নিজের কল্পনা দ্বারাও কতকটা তাহা অনুরঞ্জিত হয়। তবে,মূলে যে তাহাতে কোন সত্য নাই এ কথাও বলা যায় না। যে সকল সাধারণ আধ্যাত্মিক সত্য সকল ধর্ম্মেরই পত্তনভূমি তাহাই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। গঙ্গানদী হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া মূল প্রস্রবন হইতে যতই দূরবর্ত্তী হয়, ততই তাহা কলুষিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া গঙ্গানদীর বিশুদ্ধ মাহাত্ম্য একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

পূর্ব্বতন খৃষ্টানেরা যোগসাধনে বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যোগ-পদ্ধতিটি তাঁহাদের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে নাই, তথাপি তাঁহারা যে আনন্দের বর্ণনা করেন, তাহা হিন্দুদিগের পরিব্যক্ত যোগানন্দেরই কতকটা অনুরূপ।

সেণ্ট অগস্‌টিন ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম অর্জ্জন করিবার উদ্দেশে স্বীয় অন্তরে যে প্রকার আকুতি ও অদম্য স্পৃহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা তিনি তাঁহার রচিত "মনের কথা প্রকাশ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমত—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার পরীক্ষার ভার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অর্পিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিও পরিবর্ত্তনশীল, আকুতিমান আত্মার আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধিও পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। অবশেষে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি—উভয় হইতেই আত্মাকে প্রত্যাহার করিয়া এক লক্ষ্যে অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। তিনি বলেন, "আত্মপ্রত্যয়ের দৃষ্টির দ্বারাই আমি যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিলাম—অদৃশ্য বস্তুসকল দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহার উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া অনেকক্ষণ রাখিতে পারিলাম না।

আবার আমার দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িল—আবার আমার পূর্ব্বঅভ্যাস ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্ব উপলব্ধির সুখজনক স্মৃতিটি মাত্র রহিল এবং যে বস্তুর আঘ্রাণটিমাত্র পাইয়াছিলাম—সম্পূর্ণ আস্বাদ পাই নাই—সেই বস্তু লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাটিমাত্র রহিয়া গেল। মড্‌স্‌লি ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করেন;—চিন্তা ও ভাবের একটি বিশেষ বিভাগের উপর মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং সেই তন্ময় চেষ্টাকে স্থায়ীভাবে রাখিয়া সেণ্ট অগস্টিন সেই চিন্তা ও ভাবকে এরূপ সুতীব্র সপ্তম সুরে তুলিয়াছিলেন যে অন্যান্য চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল—সেই একদেশবাহী চিন্তাকে দমন করে বা অনুশাসন করে এমন আর কোন চিন্তা ও ভাব রহিল না। এইরূপে, মনের একটা অর্দ্ধ-বাতুলবৎ অর্দ্ধপ্রলাপী অবস্থা উৎপন্ন হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার অনির্ব্বাচ্য আধ্যাত্মিক দীপ্তি ও আনন্দের ভাব উপলব্ধি হইতে লাগিল।" সেণ্ট অগস্টিন বলেন, "যে শক্তি দ্বারা আত্মা শরীরের সহিত যুক্ত ও জড়িত রহিয়াছে সেই শক্তি অতিক্রম করিতে পারিলেই আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ যে ঈশ্বর তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শক্তিকে অতিক্রম করিয়া অধিকক্ষণ থাকা যায় না।" তিনি বলেন "প্রভু তুমি আমার অন্তরতম দেশে এমন একটি ভাবের প্রকাশ করিয়াছ, যাহা সচরাচর অনুভূত হয় না—কিন্তু এই ভাবটি পরিপক্ক হইলে, না জানি মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনে কি আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিবে—আপাতত এই হীন দেহের ভাবে আমি আক্রান্ত—কিছুতেই স্বর্গের দিকে উঠিতে পারিতেছি না—পুনঃ পুনঃ হীন পার্থিব বিষয়ে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছি।" মড্‌স্‌লি বলেন, এই অবস্থা, মস্তিষ্ক-প্রদেশ-বিশেষের অভ্যাসজনার ফল; সুতরাং ইহার সহিত শরীরের বিলক্ষণ যোগ রহিয়াছে। অতএব শরীরের ভাব কিরূপে অতিক্রম করা

যাইবে? এই অত্যুত্তেজিত অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে কাজেই পারে না।

সেণ্ট অগস্‌টিনের আত্মা যখন এইরূপ ভূমানন্দে পূর্ণ হইত, তখন সেই দুর্লভ মুহূর্ত্তে তিনি ঈশ্বরের যে প্রেমামৃত পান করিতেন তাহার প্রকৃতি কিরূপ? সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভাব তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—"তোমাকে যখন আমি ভালবাসি,তখন আমি কোন্ বস্তুকে ভালবাসি? সে শরীরের সৌন্দর্য্য নহে, সে তালের সুন্দর সৌসাম্য নহে, সে নয়নরঞ্জন আলোকের উজ্জ্বলতা নহে, সে অগুরুচন্দনপুষ্পের সুগন্ধ নহে, সে শর্করা নহে, মধু নহে, আলিঙ্গন-সুখের উপযোগী দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নহে। আমি যখন আমার ঈশ্বরকে প্রীতি করি, তখন আমি এই সকল বিষয়ে প্রীতি করি না। কিন্তু, আমি অন্তরাত্মার গভীরতম দেশের এক প্রকার আলোক, সঙ্গীত, সুগন্ধ, সুখাদ্য, আলিঙ্গন উপভোগ করি। সেখানে এমন এক জ্যোতি বিকীরিত হয়, আকাশ যাহাকে ধারণ করিতে পারে না—এমন এক সুস্বর ধ্বনিত হয়, যাহা কাল অপনীত করিতে পারে না—এমন এক সুগন্ধ অনুভূত হয়, নিঃশ্বাস যাহাকে অপসারিত করিতে পারে না—এমন একটি অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, ভোজনে যাহার লাঘব হয় না—যে আস্বাদটি রসনাতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে, যাহাতে কখনই অতিতৃপ্তি উৎপন্ন হয় না। আমি যখন আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি, তখন আমি এই ভাবেই ভালবাসি।"

সেণ্ট থেরেসার বর্ণিত স্বকীয় জীবনবৃত্তান্তেও এই যোগানন্দের গূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি হয়। সেণ্ট থেরেসার প্রকৃতি শৈশবে অতিশয় কল্পনা-প্রবণ ছিল—তৎকালে স্পেনদেশে নারীসেবাধর্ম্মী বীরপুরুষাদিগের কাহিনী সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিল—

থেরেসাও এই সকল কাহিনী গোপনে পাঠ করিতেন এবং এই-রূপে তাঁহার কল্পনা-প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার যখন ১৮ বৎসর বয়স, তিন মাস কাল আপনার মনের সঙ্গে বুঝা-বুঝি করিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, "চির-কুমারী ব্রত পালনে তাঁহার ইচ্ছাকে বলপূর্ব্বক নিয়োগ করিবেন।" এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি কুমারী-আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বিবিধ কঠোরতা আচরণ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল—অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহার বন্ধু-গণের আশ্রয়ে নিজালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ডে একটা বেদনা অনুভব হইত—মনে হইত যেন কেহ "তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া ধরিয়াছে।" কিছুই আহার করিতেন না—কেবলই পান করিতেন। চারি দিন ধরিয়া অচেতন ছিলেন। তাঁহার অবস্থা এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিজনেরা সমস্ত আশাভরসা ছাড়িয়া তাঁহার সমাধির জন্য গোর প্রস্তুত করিতেছিল; তাঁহার জিহ্বা, নিজের দন্তাঘাতে, খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল; হাত পা মাথা কিছুই নাড়াইতে পারিতেন না—কেবল ডাইন হাতের একটি আঙ্গুল নাড়াইতে পারিতেন। একটা চাদরে জড়াইয়া তাঁহাকে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে হইত। তিন বৎসর কাল এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার পর আরোগ্যলাভ করিলেন। এই প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজীবন এইরূপে আরম্ভ হয়। তিনি প্রত্যক্ষ দেবদর্শনাদি করিয়া অতি বিশদরূপে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দশাপ্রাপ্তিকালে তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইত তাহা এইরূপ বর্ণনা করেন। "এইরূপে, আত্মা যখন ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে, তখন অতীব মধুর অপার আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে বুঝিতে পারা যায়, আত্মার একপ্রকার অচেতন সুষুপ্তির অবস্থা

আসিতেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়—শরীরে বল চলিয়া যায়—এমন কি হাত একটু নাড়িতেও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, ইচ্ছা না করিলেও আপনা-আপনি চক্ষু বুজিয়া আসে—চক্ষু খোলা থাকিলেও কিছুই দেখা যায় না। কিছুই-পাঠ করা যায় না অক্ষর-গুলি অপরিচিতের ন্যায় মনে হয়, চিনিতে পারা যায় না—অক্ষর-গুলি যে দেখা যায় না তাহা নহে, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্য না পাওয়ায় অনেক চেষ্টাতেও কিছুই বুঝা যায় না। কাণে শোনা যায়—কিন্তু যাহা শুনিতেছি তাহা বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয়গণ কোনও কাজে আসে না—কাজে আসা দূরে থাক্, বরং আত্মার কাজে ব্যাঘাৎ করে—উহাদের দ্বারা স্পষ্ট ক্ষতি হয়। কথা কহিতে চেষ্টা করা বৃথা, কারণ কোন কথার ভাব মনে ধারণা হয় না; যদি বা ধারণা হয়, ব্যক্ত করিবার যথেষ্ট বল থাকে না; কারণ, সমস্ত দেহের বল অন্তর্হিত হয়—কেবল সেই যাহাতে করিয়া আত্মার আনন্দ ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত হইতে পারে, আত্মার বল বাড়িতে থাকে, ……সে আনন্দ অপ্রতিহত-গতি……তোমার ভাবিবার অবকাশ না হইতে হইতেই সে আনন্দ তীব্রভাবে ও দ্রুতভাবে সজোরে তোমার উপর আসিয়া পড়ে। তোমার মনে হয়—যেন একটি মেঘ—যেন একটি বলবান গরুড় পক্ষী ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং তাহার পক্ষের দ্বারা তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।" প্রথম যখন এই আনন্দ উপলব্ধি হইত, তখন কোন পরিণাম-ফল প্রকাশ পাইত না—কিন্তু পরে সমস্ত শরীরে বেদনা উপস্থিত হইত—মনে হইত যেন অস্থিগ্রন্থি সকল বিযুক্ত হইয়া যাইতেছে। অপস্মার রোগের মূর্চ্ছার পর যেরূপ শরীরের অবস্থা হয়, ইহাও সেই প্রকার।

থেরেসার যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু ও আচার্য্য ছিলেন, থেরেসার এই অভূতপূর্ব্ব আন্তরিক উচ্ছ্বাসের প্রকৃত ভাব কিছুই

বুঝিতে পারিতেন না—ইহার আসল প্রকৃতি কি, সে বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। থেরেসার অবস্থা-বিষয়ে একটি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য ৫।৬ জন শাস্ত্র-পারদর্শী, পণ্ডিতের দস্তুরমত সন্তাষা-সমিতি বসিল। তাঁহারা স্থির করিলেন, থেরেসাকে সয়তানে পাইয়াছে—এবং তাঁহারা থেরেসাকে এই উপদেশ দিলেন, যেন সে কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত না হয়—নানা বিষয়ে মন দিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত রাখিবার চেষ্টা করে ও কদাপি যেন একাকী বিজনে না থাকে। তাঁহার কোন কোন উপদেষ্টা মনে করিলেন, দশাপ্রাপ্তির সময় থেরেসার অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় বটে, কিন্তু সেই সময় যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা কতকটা ইন্দ্রিয়-লালসা-রঞ্জিত। অতএব, থেরেসার শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি কঠোর তপশ্চর্য্যা অধিকতররূপে সাধন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের নরদেহধারী অবতার খৃষ্টকে প্রীতি করিতে হইলে কতকটা যে পার্থিব প্রেমের ছায়া আসিয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!—থেরেসা বলেন, উহা অনিবার্য্য। তিনি বলেন "অনেকে বলে, আত্মাকে বায়ুর মধ্যে বিচরণ করাইবে—কিন্তু আত্মা যতই ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ হউক না—আত্মা একেবারে হাওয়ার উপর থাকিতে পারে না—একটা পার্থিব ভিত্তির উপর ভর দিয়া থাকা আবশ্যক হয়।.... আমরা তো আর এঞ্জেল নই—আমাদের শরীর আছে—পৃথিবীতে থাকিয়া আপনাকে এঞ্জেল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা—ইহা অপেক্ষা বাতুলতা আর কিছুই নাই।"

আর একটু অধিক বয়সে, থেরেসা যখন একটা কুমারী-আশ্রমের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত অনেকগুলি আশ্রম-ধারিণীর দশাপ্রাপ্তির সময়ে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। তখন তিনি বুঝিলেন, এই অবস্থাতে সকল সময়ে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় না।

কখন কখন সয়তানেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। আশ্রমধারিণী চিরকুমারীরা অনেক সময়ে খৃষ্টকে পতিরূপে বরণ করে—কাজেই তাহাদের প্রেমে আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা পার্থিবতা অধিক পরিমাণে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমে এইরূপ পার্থিব ভাব বর্ত্তমান। সেণ্ট অগষ্টিনের "মনের কথা প্রকাশ" পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি তাহাতে এক এক স্থলে যে আনন্দের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে জঘন্য ইন্দ্রিয়-লালসার গন্ধ পাওয়া যায়—এমন কি তাহা বিশুদ্ধমনা যুবক যুবতী-দিগের পাঠেরও অযোগ্য। তাই, কোন জর্ম্মণ গ্রন্থকার বলিয়াছেন "রুসো সর্ব্বসাধারণের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেণ্ট অগষ্টিন ঈশ্বরের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন"।

কিন্তু আমাদের দেশের ঋষিরা উপনিষদে যে যোগানন্দ—ভূমানন্দের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কেমন আধ্যাত্মিক—কেমন [illegible]ত—কেমন বিশুদ্ধ—তাহাতে পার্থিবতার লেশমাত্র নাই। সেই ঋষিদিগের স্বর্গীয় আনন্দের সহিত পার্থিব কোন সুখের তুলনা হয় না বলিয়া তাঁহারা উহা তন্নতন্নরূপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা পান নাই কেবলমাত্র বলিয়া গিয়াছেন—উহা অনির্ব্বচনীয়।

কৃতজ্ঞতা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নয়টা বাজিয়া মিনিট পনর হইতে না হইতে সস্ত্রীক কালেক্টর সাহেব বগী হাঁকাইয়া কুণ্ডলায় প্রবেশ করিলেন। পুলিসের উপর কোন হুকুম জারি না হইয়া থাকিলেও দারোগা সাহেবের সর-

ফরাজীতে মাজিষ্টর কালেক্টরের অভ্যর্থনার জন্য লালপাগড়ী কনষ্টেবল এবং নীলপাগড়ী লাটিহাতে চৌকীদারের দল গ্রামের প্রবেশপথে দুধারে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অতএব সাহেব বাহাদুরের শ্রীমুখপঙ্কজ হইতে ছোট তরফের নাম ধ্বনিত হইবামাত্র দুইজন চৌকীদার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া শ্রান্তক্লান্ত অশ্বটীকে পথ দেখাইয়া চলিল। দারোগাজী তখন বড় তরফের ম্যানেজারের মোকদ্দমা লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলেন এবং নিজে ভূতের প্রতি আস্থাবান হইলেও মাজিষ্টর সাহেবের ভয়ে রাত্রের ঘটনাটা একদল অসন্তুষ্ট প্রজার উপর ফেলিবার আয়োজন করিতেছিলেন। এদিকে আসল ঘোড়ার চেয়ে মানুষ-ঘোড়ার দৌড়-শক্তি কিছু কম নহে এই নূতন তথ্য প্রত্যক্ষ করিয়া মেমসাহেব হাসিয়া অস্থির হইলেন। স্বয়ং সাহেবেরও ধৃতচুরট অধরৌষ্ঠে আনন্দরাগ দেখা দিতেছিল। কে অব্যক্তনামা পত্রপ্রেরকের প্রেরিত পত্রে এ সম্বাদ অবগত হ এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহারই উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে তখনকার একজন সম্পাদক বলিয়াছিলেন যে, প্রান্তসীমার যুদ্ধের আয়োজন সম্ভাবনা এবং তজ্জন্য রাজপুরুষেরা ব্যবস্থাঘরের যে প্রস্তাব গোপনে গোপনে করিয়া কোন সন্তোষজনক উপায় স্থির করিতে পারেন নাই, এই মুহূর্ত্তে তাহার একটা মীমাংসার ভরসা ডোনাল্ড্ সাহেবের মনে অকস্মাৎ প্রতিভাত হইয়াছিল। ডোনাল্ড্ সাহেব নাকি সেদিনকার বহুদর্শিতার বলে রিপোর্টে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, দৌড়পটু এই শ্রেণীর দেশীয় লোকের বহুল নিয়োগ দ্বারা অশ্বরক্ষার অনর্থক ব্যয়ভার প্রভূত পরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে। হিসাব করিয়া তিনি ইহাও দেখাইয়াছিলেন যে "জানোয়ার ঘোড়া"র প্রত্যেকটার যেমন তেমন করিয়া ৭।৮ টাকা মাসিক খরচ পড়ে, কিন্তু মোটে তিন টাকা এবং—বৎসরে চাবিবার মাত্র

বেতন পাইয়াও এই "মানুষ ঘোড়ার" দল ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এ দিকে অকালী সিং প্রভুকন্যা সুরবালার ইজ্জৎ আবরু রক্ষার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছিল, এবং যাহাতে বালিকা কালেক্টর সাহেবের সামনে বাহির না হয় সে জন্য ভগীদাসীকে বারম্বার সাবধান করিতেছিল। কিন্তু সুরবালা বাপের একমাত্র আদরের মেয়ে এবং তাহার জমাদারের পূজনীয়া ও সোহাগের সুরো দিদি,—সে কোন বিধি নিষেধের ধার ধারে না। বিশেষতঃ পিতা প্রমথনাথ সাহেবি মেজাজের লোক ছিলেন, সাহেব মেমের রাঙ্গা মুখ দেখিলে সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের যেমন জুজুর ভয় জাগিয়া উঠে, কন্যাকে তিনি তেমন শিক্ষা দেন নাই। বাপের সঙ্গে সুরো একবার সাহেববাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে এবং সাহেব দম্পতির হৃদ্য আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। কাজেই আজ বাড়ীতে তমুখ অতিথির আগমন হইবে শুনিয়া তাহার আহ্লাদের সীমা ছিল না। চুল না বাঁধিলে মেমসাহেব দেখিয়া নিন্দা করিবেন বলিয়া ভগীদাসী তাহাকে স্থির হইয়া বসাইতে পারিয়াছিল বটে কিন্তু সিঁথি কাটিয়া সেই অসংযমিত চূর্ণকুন্তলদামে দুইবার চিরুনি টানিতে না টানিতে বহির্দ্বারে গাড়ীর ঘর্ঘর শোনা গেল। ভগী তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উদ্যম করিবার পূর্ব্বেই সুরবালা তিন লাফে অন্দরমহল ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। অতএব অকালীসিং সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া যাইতে না যাইতে সুরো আসিয়া চিরপরিচিতের মত মেমসাহেবের হাত ধরিল। সে মহিমাময়ী সরলা বালিকা-মূর্ত্তি দেখিয়া মিসেস্ ডোনাল্ড্‌ও আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন Charming! কালেকটরও ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কেবল অকালী সিংহের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ডোনাল্ড সাহেব অকালী সিংহের অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "ইনিই বোধ করি তোমার প্রভুকন্যা। বিবাহ হইয়াছে?"

ভাবি সপ্রতিভ হইলেও সুরবালা বিবাহের নামে অবনতমুখী হইল। লজ্জায় তাহার ক্ষুদ্র গণ্ড দুটী লাল হইয়া উঠিল। সাহেব দম্পতি তাহাতে নূতন শোভা দেখিলেন এবং দুজনে আনন্দদৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

অকালী সিং তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। ক্ষুব্ধস্বরে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কথায় বলিল "না বিবাহ হয় নাই। আর হইবার উপায়ও নাই। যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তিনি মরিয়া গেছেন।"

ডোনাল্ড ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন "Nonsense! সেদিন এক জন শিক্ষিত জমীদারের সঙ্গে আমার ঠিক্ এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছিল। একেই না বলে অন্যপূর্ব্বা! পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরা বিধবাবিবাহ প্রচলিত করে তুল্‌লে, আর পঞ্জাব এ পারে আজও এত কুসংস্কার! এর অর্থ এই যে এ প্রদেশে শিক্ষা এখনও তেমন বিস্তার হয় নি। আচ্ছা, এই বালিকা প্রথমে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে লেখা পড়া শিখুক, তার পর দেখা যাবে কে ইহার বিবাহ বোধ করে!"

ডোনাল্ড সাহেব "জন্ বুলো"চিত অভ্যস্ত দৃঢ় ভাষায় এদেশীয় সমাজনীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহধর্ম্মিণীর প্রশংসমান উদার দৃষ্টিটুকু অর্জ্জন করিলেন বটে, কিন্তু কথাটা অকালী সিং বা সুরবালা কাহারও ভাল লাগিল না। অকালী বুঝিল, এখন সাহেবের

কথায় প্রতিবাদ করিলে কার্য্যোদ্ধারের বিঘ্ন হইতে পারে, কথাটা যেমন-তেমন হইলে সে কিছুই বলিত না, কিন্তু যাহাতে তাহার প্রভু-গৃহের "খানদানের" উপর হাত পড়ে, এখন কোন প্রস্তাব "তাঁবেদার"বৎ নীরবে শুনিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। যথোচিত বিনীতভাবে মৃত প্রভুর তৈলচিত্রখানির প্রতি সজল দৃষ্টিস্থাপন করিয়া অকালী সিং বলিল "জনাবআলী, একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দিয়া সুখী হবেন প্রভুর আমার এই বড় আশা ছিল। যে দিন বাকৃদত্ত পাত্রের মৃত্যুখবর আসিল, আমায় ডাকিয়া বলিলেন, অকালী, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। সুরোর আবার বিয়ে দিলে সে হয়ত সুখী হবে, কিন্তু আমি কি সুরোকে পতিতা করে আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিয়ে যাব! আমা হতে তা হবে না।"

কালী সিং চক্ষু মুছিল। দেখিয়া সুরবালার চক্ষু ছলছল হইল। দেখিয়া মেমসাহেব আদর করিয়া সুরবালাকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অকালী সিং এবং সাহেবকে অপেক্ষাকৃত একান্তে রাখিয়া তিনি বালিকাকে বৈঠকখানার অন্য সীমায় লইয়া গেলেন। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদের নির্ম্মিত অনেকগুলি খেলনা ছিল। মিসেস ডোনাল্ড্ একে একে সুরবালাকে সেগুলির পরিচয় জিজ্ঞাসার ছলে নানা কথায় তাহার মুখে হাসি দেখিলেন, তাঁহার শিক্ষিত সংযত রমণী-হৃদয় অকালী সিংহের কৃতজ্ঞতা এবং সরলা বালিকার স্নেহকোমলতায় গলিয়া গিয়াছিল।

এ দিকে অকালী সিংহের বিনীত স্পষ্টবাদিতায় ডোনাল্ড্ সাহেব বুঝিলেন তিনি তাহার হৃদয়ে একটু আঘাত করিয়াছেন। সচরাচর সাহেবেরা এটা বোঝেন না, জনবুলের বিরাট আদর্শে আমাদের সকল ক্ষুদ্র আশাভরসা সকল ক্ষুদ্র সুখদুঃখ "কুত"

করিয়া থাকেন। সুশাসিত বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্নিহিত বিপদ যে এইখানে, মন্ত্রণাকুশল ইংরেজরাজ আজও তা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ডোনাল্‌ড সাহেবও তাহা বড় বুঝিতেন না। কিন্তু মনুষ্যহৃদয় তিনি একটু একটু বুঝিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বড় তরফের ঘোড়সওয়ার রওনা হইতে বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। তার উপর ঘোড়সওয়ার বাহাদুর সেখ ক্রোশ তিনেক পথ মাত্র অতিক্রম করিয়া তাহার ফুপার বাড়ী সিমুলি গ্রামের পথের ধারে বটগাছতলায় যখন কালেক্টর সাহেবের ডাকের ঘোড়া বাঁধা এবং সহিসকে নিদ্রাবস্থায় দেখিল, তখন সেই সিপাহীর বেশে কুটুম্ববাড়ী গিয়া একছিলিম তামাক খাইয়া আসিতে তাহার বড় সাধ হইল। কিন্তু কুটুম্ববাড়ী গিয়া তখন তখনি কে ফিরিয়া আসিতে পারে? একছিলিম তামাকের জায়গায় চারিছিলিম এবং খোসগল্পের পর খোসগল্প চলিতে চলিতে শোনা গেল যে, কালেক্টর সাহেবের ডাক বদল ও গাড়ী রওনা ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব সদর রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের আইলপথে বাহাদুর সেখ যখন বড়তরফের দেউড়ীতে মহাব্যস্তভাবে উত্তীর্ণ হইয়া এত্তালা করিল যে সোজাপথে কালেক্টর সাহেবের গাড়ী ধরিবার চেষ্টা করিয়া সে ভারি ঠকিয়াছে, সমেম ডোনাল্‌ড সাহেব তখন মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া গিয়াছেন।

কাজেই বেলা সাড়ে এগারটার আগে ম্যানেজারের অভাবনীয় অবস্থার কথা ডোনাল্‌ড সাহেবের কর্ণগোচর হইল না। দারোগা পীরবক্স ঘোড়সওয়ার রওনার খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং ভরসা করিতেছিলেন মোকদ্দমার কতকটা কিনারা করিয়া একে-

বারে জনাব আলীর কাছে রিপোর্ট লইবা হাজির হইবেন। কিন্তু বাহাদুর সেখ ফিরিয়া আসিলে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। সদলবলে পীরবক্স যখন ছোট তরফের আমবাগানে দেখা দিলেন, মেম ও সাহেবের ভোজন-টেবিলে তখন গল্প ও হাস্য যুগপৎ উছলিয়া উঠিতেছিল।

মিসেস্ ডোনাল্ড বলিতেছিলেন, "এই বালিকাকে দেখে আমার বড় মায়া হয়েচে। এলোচুলে আচমকা যখন এসে সে আমার হাত ধরেছিল, তখন মনে হল যেন কবিচিত্রিত বন-বালিকা আমার সম্মুখে, তারপর ঐ প্রভুভক্ত দরওয়ানের মুখে মৃত পিতার কথা শুনে যখন তার চোক ছলছল হল, তখনও আমি বিচলিত হয়েছিলাম, বালিকাকে অন্যমনস্ক করবার জন্য গুতুলগুলির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে করতে দেখি, দিব্য তার বুদ্ধিশুদ্ধি। বালিকা যে ভিতর ধর্ম্মতঃ বিধবা হয়েচে শুনেও ওর প্রতি আমি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। আমাদের দ্বারা অনাথা বালিকার স্থায়ী কোন উপকার যদি হতে পারে, তার চেষ্টা তুমি অবশ্য করবে এই আমার অনুরোধ। আর ঐ প্রভুভক্ত দরওয়ানকে তুমি কি মনে কর? তাকে দেখে আমার মনে হয়েচে কৃষ্ণবর্ণ নেটীভের বুকের ভিতর দৃঢ় বলিষ্ঠ মনুষ্যোচিত হৃদয় থাকতে পারে।"

ডোনাল্ড বলিলেন—"যথার্থই বালিকার বড় অসহায়াবস্থা, তুমি বিচলিত হয়েছ এতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। আমি স্থির করেছি, ওর ঋণভারগ্রস্ত বিষয় কোর্টঅবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে রাখব এবং উহাকে সুশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করব। তাতে বিষয়টা ৪।৫ বছরের মধ্যে ঋণমুক্ত হবে এবং ঐ সময়ে বালিকা এরূপ সুশিক্ষা লাভ করবে, যে, সে দেশীয় ঘৃণিত প্রথাগুলোকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। তা হলে হিন্দুসমাজ তাকে জোর করে

বিধবাবস্থায় থাকতে পারবে না। আর অকালীসিংহের কথা বলচ? প্রথম দর্শনেই তাকে আমি একটা মানুষের মতন মানুষ বলে অনুভব করেছি। এরকম প্রভুভক্ত ভৃত্য সচরাচর দেখা যায় না। আমি মনে করি ষ্টেট্ থেকে তার একটা উপযুক্ত পেন্‌শেন্ হওয়া উচিত। কিন্তু বালিকার কাছে থাকতে পেলে সে তার শিক্ষা ও মার্জ্জিত রুচির পথে সর্ব্বদা কণ্টকস্বরূপ হবে। এই ভোজপুরিসাগুলার বীরের হৃদয় আছে, কিন্তু সে বীরত্ব এবং সাহস শিক্ষা দ্বারা সংযত হতে পায় না। কুসংস্কারান্ধ হয়ে অনেক সময় তারা হিংস্র পশুর মত ভীষণ হয়ে ওঠে।"

আহার সম্পূর্ণ করিয়া সাহেব দম্পতি অকালীসিংহকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এবং উভয়ে একবাক্যে তাহাকে ভরসা দিলেন যে, তাহার প্রভুকন্যার সম্বন্ধে আর তাহাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। অকালীসিংহের কানে সে কথা বড়ই মধুর শুনাইল। তাহার মনে হইল সাহেব মেমের রূপ ধরিয়া হরগৌরী মূর্ত্তি তাহাকে বরাভয় দান করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুরবালার ভাগ্য সঞ্চারের আশায় আনন্দে আত্মহারা হইলেও অকালীসিং বুঝিল, রাত্রের ঘটনায় তাহার হৃদয়ে যে মলিনতা জন্মিয়াছে, সহজে তাহা দূর হইবে না। এই মুহূর্ত্তে সাহেবের সমক্ষে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনার কাছে অন্ততঃ আপনি সাফাই হইবার জন্য হৃদয় তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। করযোড়ে অকালী বলিল, "ধর্ম্মাবতার স্বর্গীয় প্রভু আমার উপর যে ভার দিয়াছিলেন, আজ আপনি তা গ্রহণ করায় আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ঘটনাবশে আজ যদি আমি প্রভুগৃহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হই, প্রভুকন্যার জন্যে

আমার মনে কোন অসুখ থাকবে না। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।" অকালী সিং থামিল, যে কথাটা বলিবার জন্য প্রাণ তার আকুলিব্যাকুলি করিতেছিল, কণ্ঠে তাহার ভাষা ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতেছিল না। তাহার উপর নিজের সেই অতিক্রোধের অসংযত অবস্থা মনে করিয়া অকালী সিং লজ্জায় মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছিল। আর কিছুই বলিতে না পারিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে সে দৃষ্টি নত করিল।

এমন সময়ে চাপরাশী খোদাখাঁ আসিয়া এত্তালা করিল যে, দারগা হাজীর, বিশেষ সঙ্গীন কথা আছে। সাহেব তাহাকে আসিতে বলিলেন। পীর বক্স খাঁ প্রথমতঃ মেম্‌সাহেবকে তারপর স্বয়ং ম্যাজিষ্টর সাহেবকে যথারীতি সেলাম করিয়া কৈফিয়ৎ দিল যে বড় সঙ্গীন মোকদ্দমার "তাখিখৎ লইয়া বিব্রত থাকায় এতক্ষণ বেদার জনাব আলীর খিজ্‌মতে হাজির" হইতে পারে নাই। সাহেব বাহাদুরকে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে দেখিয়া পীরবক্স আপনার ঊর্দ্দুবহুল জবানি রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিত রিপোর্ট তাঁহার হাতে দিল।

অতঃপর পীর বক্স আদেশমত আপনার লিখিত রিপোর্ট আপনি পড়িয়া ম্যাজিষ্টর সাহেবকে শুনাইয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, পড়িতে বড় একটা ভুলচুক হয় নাই; তবে কথায় কথায় "আর" ও "রেফ" সংযুক্ত না করিলে সাধুভাষা হয় না দারোগাজীর এই রকম একটা ধারণা থাকায় এবং তাহার উপর প্রায় প্রতি চারি অক্ষরের পর "অ্যাঁ অ্যাঁ" ও "ওরনাম কি" প্রভৃতি শব্দালঙ্কার প্রযুক্ত হওয়ায়, পীরবক্সের রিপোর্টখানি ডোনালড্ সাহেবের সহিষ্ণুতাকে বিষম অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়াছিল। দারোগাজী রিপোর্টের শেষ ভাগে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা বলিতেছে বটে যে ভূতে

ম্যানেজারে সে দশা করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না থাকিলেও তাহার বিশ্বাস যে রাজবাড়ীর লোকেদের যোগসাযোগে বিদ্রোহী প্রজাদের দ্বারা এ কার্য্য হইয়াছে।

ডোনালড্ সাহেব অকালী সিংকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস আছে কি না। অকালী শুষ্কমুখে বলিল যে, ভূত সে কখন দেখে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া নাই একথা বলা তার সাধ্য নহে। আর ঘটনাচক্রে অবস্থাবিশেষে মানুষ ভূতের মত কাজ করিতে পারে।

সাহেব বলিলেন, দারোগা বলিতেছে, তার বিশ্বাস, বড়তরফের লোকেদেব যোগসাযোগে বিদ্রোহী প্রজারা ম্যানেজাবের প্রতি এ অত্যাচার করিয়াছে—তুমি অনেক কাল এখানে আছ, অকালী সিং তোমার কি মনে হয় ইহা সত্য?

এতক্ষণ অকালী সিং আত্ম এবং আত্মেতর ভাবের সংগ্র আপনাআপনি সংক্ষুব্ধ হইতেছিল। সাহেবের শেষ কথাব স নঙ্গে সেও প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। প্রায় হাস্যবিকসিত মুখে, দৃঢ় ওষ্ঠ দন্তে চাপিয়া অকালী বলিল—"ম্যানেজার এই ছোট তবফের মুহুরী ছিল, সম্প্রতি বড় তবফে চাকরী পাইয়া সে পূর্ব্ব প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছিল। আমিই স্বহস্তে সে নিমকহারামটার এদশা করিয়াছি।"

তখন অকালী সিং ডোনালড্ সাহেবের প্রশ্নমতে একটী একটী করিয়া রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিল।

সমালোচনা।

ঐকতানিক স্বর-সংগ্রহ।*

থিয়েটারের চলিত গৎ ও গানের স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া দক্ষিণা বাবু আমাদের একটি অভাব দূর করিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। অবশ্য, থিয়েটারের সকল সুরই যে শ্রুতিমধুর কিম্বা অধিকাংশ গান যে কাব্যাংশে সুরচিত, এরূপ বলা যায় না। তথাপি, যখন দেখা যাইতেছে, অনেকে এই সকল গান শুনিতে ভাল বাসে ও উহাতে তৃপ্তি লাভ করে, তখন ইহার স্বরলিপি প্রকাশ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের ধ্য দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে, যাহাতে লোকে একটু বিশুদ্ধ আমোদ—একটু আরাম—একটু শান্তি উপভোগ করিতে পারে, ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সঙ্গীত, সামাজিক রোগেরও একটি মহৌষধ। সঙ্গীত অনুশীলনে অনুরাগ জন্মিলে, পাশব বৃত্তিসমূহের তেজ অনেকটা হ্রাস হয়। এই জন্য, সাধারণের মধ্যে সঙ্গীত যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল। এবং সঙ্গীতকে সাধারণের সাধ্যায়ত্ত করিবার পক্ষে স্বরলিপির ব্যবহার ও প্রচারই একটি প্রধান উপায়। আর একটি কারণে, থিয়েটারের সুরগুলি লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। আমাদের নাট্য-সঙ্গীতের এই আরম্ভকাল। নাট্যসঙ্গীতের অনুশীলনে আমাদের সাধারণ সঙ্গীতেরও উন্নতি হইবে এরূপ আশা করা যায়। আমাদের প্রচলিত বৈঠকী কালোয়াতি সঙ্গীতে সুরের সহিত

---

* ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ—অর্থাৎ কনসার্টের গৎ ও থিয়েটারের গানের স্বরলিপি। (৬০ টি গৎ ও গানে সম্পূর্ণ) প্রথম ভাগ। শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ) "ডোয়ার্কিন এণ্ড সন" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ভাবের চিরবিচ্ছেদ। নাট্য সঙ্গীতে এই বিচ্ছেদ দূর হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। বিবিধ সুর মিশ্রিত করিয়া ভাবের অনুরূপ নূতন সুর রচনা করিবার দিকে কতকটা চেষ্টা হইতেছে। ইহা একটি উন্নতির চিহ্ন। এখন হইতে এই সুরগুলি লিপিবদ্ধ হইতে থাকিলে, সঙ্গীতের উন্নতির একটা ইতিহাস থাকিয়া যাইবে।

দেখা যাইতেছে, এই ঐকতানিক সংগ্রহে, দক্ষিণা বাবু ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিটি অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বে, দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিটি যতটা জটিল ছিল, যদিও এখন ততটা নাই, তথাপি এই পদ্ধতিটিতে এখনও কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ—অক্ষর ও চিহ্নগুলি ফরমাইস্ দিয়া প্রস্তুত না করাইলে সকল ছাপাখানায় ছাপা হইতে পারে না—সুতরাং ছাপাইতে অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ—কতকগুলি চিহ্নের অনর্থক বাহুল্য আছে। তৃতীয়তঃ তালের ভগ্নাংশ প্রকাশ করিবার সময়, ডমরু ও চন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি চিহ্ন পাশাপাশি যেঁষাঘেঁষি স্থাপন করা প্রযুক্ত, তালের ভাগটি সহজে ধরা যায় না;—চোখে কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়। মাত্রা-প্রয়োগ, স্বরলিপির একটি প্রধান সাধন। ইহাতে জটিলতা থাকিলে, স্বরলিপির কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করা গেল তাহা পরিহার করিবার উদ্দেশেই আকারমাত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উহাতে এমন কোন নূতন চিহ্নের ব্যবহার নাই যাহা সকল ছাপাখানাতেই পাওয়া না যায়। এই হেতু, কোনও নূতন কল্পিত চিহ্নের দ্বারা কোমল ও কড়ি সুর প্রকাশ না করিয়া, প্রচলিত অক্ষরের দ্বারাই উহা প্রকাশ করা হইয়াছে। অক্ষরের উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে, যাহা শুনিতে কাণে কোমল ও কড়ি

বলিয়া সহজে অনুভূত হয়, মূল সুরের অক্ষরগুলির সহিত তুলনা করিয়া সেইরূপ স্বরাক্ষর কোমল কড়ির জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যথা ;—ধ অপেক্ষা দ উচ্চারণে কোমল বলিয়া, কোমল ধ ব্যবহার করিবার সময় দ ব্যবহার করা হয়। ম অপেক্ষা ক্ষ বর্ণের উচ্চারণ একটু কঠিন বলিয়া 'ক্ষ' অক্ষরের দ্বারা কড়ি ম প্রকাশ করা হয়। মনে রাখিবার এই মূলসূত্রটি বিদ্যমান থাকায়, কড়ি কোমলের অক্ষরগুলি মনে রাখিতে কোন কষ্ট হয় না। আকারমাত্রিক পদ্ধতিটির বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে তালবিভাগের রূপটি সহজে চোখে পড়ে—প্রত্যেক মাত্রা আকার দ্বারা সূচিত হওয়ায়; প্রত্যেক তালবিভাগের অন্তর্ভূত মাত্রাগুলি এক দৃষ্টিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি গুণ এই যে, উহাতে চিহ্নের জটিলতা আদপে নাই। অথচ ইহার দ্বারা সুর ও তাল বিশুদ্ধ রূপে প্রকাশ করা যায়। দণ্ডমাত্রিক ও আকারমাত্রিক স্বরলিপির দৃষ্টান্ত পাশাপাশি রাখিলেই এই কথার যথার্থতা পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি।

সা	গ ঋ গ গ	গ-ম-গ ম	পা মা পা
সা	ধে — র ত	র ণী ০ ০	আ মা র

আকারমাত্রিক পদ্ধতি।

সা। গা - গরগা গা। গা মা - গমা। পা মা-পা।

সা। ধে —র ত। র ণী —। আ মা র।

পাঠক দেখিবেন, আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে প্রতি তাল-বিভাগের অন্তর্গত তিন তিনটি মাত্রা কেমন স্পষ্টরূপে চোখে পড়ে এবং "আগ্" এর চিহ্ন স্বরূপ নীচে কসি না টানিয়া অক্ষরের মধ্যে হাই-[illegible] এক মাত্রা

কালের মধ্যে দুটি স্বর উচ্চারণ করিতে হইবে, দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিতে দুটি স্বর পৃথক্ ভাবে লিখিয়া প্রথমটির উপর দণ্ড-চিহ্ন প্রয়োগ করা হয় এবং উভয় স্বরের উপরে ব্র্যাকেট্ দেওয়া হয়। সেই স্থলে আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে, দুটি স্বরাক্ষর যুক্ত করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে একটি আকার বসাইলেই যথেষ্ট হয়। তবে, এত বাহুল্য ও আড়ম্বরের প্রয়োজনটা কি?

এই সব কারণে, আমরা দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতির পক্ষপাতী নাই। এ কথা সত্য বটে, আজকাল এত বিভিন্ন প্রকার স্বরলিপি বাহির হইতেছে যে, সাধারণ লোকে ভাবিয়া পায় না কোন্‌টিতে বাস্তবিক সুবিধা। কিন্তু আমরা দক্ষিণা বাবুর ন্যায় বিচক্ষণ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশা করি, তিনি প্রচলিত স্বরলিপিগুলির দোষ-গুণ বিচার করিয়া, যে স্বরলিপিপদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক তাহাই ব্যবহার করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করেন। শেষে বক্তব্য এই, এই গ্রন্থখানির লিখিত স্বরলিপি দৃষ্টে সঙ্গীত সাধনা করিলে সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই যে প্রভূত আনন্দলাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাধনা।

ভারতবর্ষে।*

বারাণসী।

হিন্দুদের অনেক দেবতা। অদ্ভুত ধরণের দেবতা। এই সকল দেবতার কল্পনায় কোন শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না—উহাদের প্রকৃত ভাবটি স্পষ্টরূপে ধরা যায় না। প্রায় সকল দেবতাগুলিরই কল্পনা-তলে এমন একটি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দার্শনিক ভাব নিহিত, যাহা সামান্য বুদ্ধির দ্বারা সহজে আয়ত্ত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত কালী দেবী। কালী "শিবের শক্তি" এবং নিজে শিবও অনন্তশক্তি—এই শক্তি সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে ধ্রুবভাবে বর্ত্তমান। অতএব দেখ, ধর্ম্মের এই সকল ভাবে মানবীকরণের দোষ কিছুমাত্র স্পর্শে না—এবং উহাদের মূর্ত্তিকল্পনাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথচ, এই সকল মন্দির কালীর মূর্ত্তিতে পূর্ণ। কালীদেবী রক্ত-পিপাসু রাক্ষসী। পূর্ব্বে কালীর সমীপে নরশিশুর বলি হইত, এক্ষণে ছাগ বলি হইয়া থাকে। তাঁহার যে সকল নামে 'ম' বর্ণ আছে সেই সকল নাম আবৃত্তি করিয়া যে পূজা হয়, সেই পূজাই তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই মাত্র মনে করিলাম, তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছি—বুঝিতে পারিয়াছি—কিন্তু পরক্ষণেই দেখি তাঁহার রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তিনি তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত,

---

* আন্দ্রে সেভিরে প্রণীত।

তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ সকল ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি কখন দুর্গা—কখন পার্ব্বতী—কখন চামুণ্ডা। এই সকল দেবতা তাঁহাতে একত্র মিশিয়া গিয়াছে। তিনি কখন কৃষ্ণবর্ণা ভীষণ মূর্ত্তি—কখন বা বিলাসিনী সুন্দরী। তাঁহার অসংখ্য মূর্ত্তি। কখনও মোহিনী ষোড়শী বালা—কখনও ছিন্নমস্তা দিগম্বরী—কখনও সারস-পক্ষী—কখন বা ধূমাবতী। সেইরূপ শিবও কখন মহাকায় পুরুষ; কখন খর্ব্বাকৃতি বামন; তিনি নীলকণ্ঠ, তিনি বাঘাম্বরধারী, তিনি দস্যুদলের প্রতিপালক, তিনি সর্ব্বসংহারী দৈত্য, তিনি দয়াবান প্রেমাসক্ত দেবতা। তাঁহারও সহস্রাধিক রূপ ও নাম। কখন কখন বিষ্ণুর সহিত তাঁহার পার্থক্য থাকে না; শিবের ভক্ত উপাসক বিষ্ণুকে ও মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি বিষ্ণুর বিবিধ অবতারকে ভক্তি করিয়া থাকে। শিব-ভক্ত ব্যক্তি গণেশকেও পূজা করিয়া থাকে। কোন গ্রন্থ রচনা করিলে, সাহিত্যের দেবতা-স্বরূপ তাঁহাকেই সেই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়। গণেশের রূপ-কল্পনা কিরূপ শোনো:—একটু স্থূলকায় গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি—তাহাতে শুণ্ড-সমেত গজমুণ্ড সংযোজিত। শিবোপাসক, পূজা করিবার সময়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া একই মন্ত্র চৌষট্টি বার আবৃত্তি করেন। তিনি বাক্যবিশেষের অলৌকিক বিশুদ্ধতাতে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, দুর্গাকে পূজা করিবার উদ্দেশে "ললাটের জন্য 'অম্', বাম ও দক্ষিণ কর্ণের জন্য 'উম্' এবং দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্রের জন্য 'ধং' প্রশস্ত।" তেত্রিশ কোটী দেবতাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জীবজন্তু উদ্ভিদ প্রস্তরকেও তিনি পূজা করেন। পবিত্র গোমূর্ত্তিতে মন্দির সকল পূর্ণ। বৃষেরা অবাধে রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করিতেছে। তাহাদের ভোজনের জন্য ঘাস ক্রয় করা পুণ্য কর্ম্ম। এই মন্দিরগুলি পশুশালা-বিশেষ। এখানে হনুমানের গদারা

তাকিতেছে ও বানরেরা কিচির-মিচির রব করিতেছে। এই মানুষ ও পশুর গোলমালের মধ্য হইতে একপ্রকার অদ্ভুত গন্ধ এবং কর্ণ-বধিরকর কোলাহল উত্থিত হইতেছে। এখানে বানরদিগের জন্যও মন্দির আছে—জুতা খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। শোনা গেল, একজন রাজা ঘটা করিয়া দুই বানরের বিবাহ দিয়াছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বানরের মাথায় টোপর পরাইয়া তাহাকে একটা গাড়িতে বসাইয়া গাড়ি টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—এবং শত শত ভক্তবৃন্দ তাহার অনুগামী হইয়াছিল। এবং সেই উপলক্ষে দশদিন ধরিয়া আমোদ প্রমোদ চলিয়াছিল। ইহার অতি সন্নিকট আলা-বাবাদে নাগপূজা হইয়া থাকে। যে পাহাড়ের উপর মন্দিরটি স্থাপিত, তাহার উপর উঠিবার সময় ভক্তবৃন্দ উদরের উপর ভর দিয়া সর্পগতির অনুকরণে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে থাকে। এই প্রকার, ময়ূর কচ্ছপ কাক হস্তীরেরও পূজা হইয়া থাকে। একটা মন্ত্রে আছে "কুকুরকে নমস্কার, কুকুরের প্রভুকেও নমস্কার, অশ্বকে নমস্কার, অশ্বের প্রভুকেও নমস্কার।" এই প্রকার, বৃক্ষ-বিশেষ, পুষ্পবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ শিলা, গোলাকার শিলা, ক্ষুর, লাঙ্গল প্রভৃতিরও পূজা হইয়া থাকে। এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, জীবজগতে এমন জীব নাই, উদ্ভিদ জগতে এমন উদ্ভিদ্ নাই, ধাতব জগতে এমন ধাতু নাই, ভাবতের কোন না কোন অংশে যাহার পূজা না হয়। এই সকল পাগলামির মধ্যেও প্রকৃতির দেবত্ব সম্বন্ধে—এই সকল বাহ্য আবির্ভাবের অন্তর্নিহিত একত্বের সম্বন্ধে কতকগুলি সহজ আত্মপ্রত্যয়—কতকগুলি গভীর তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দু গাহেন;—"সেই অনন্ত সনাতন পুরুষকে নমস্কার—সেই পুরুষকে নমস্কার যাঁহার অসংখ্য নাম—অসংখ্য আকার—

যাঁহার সহস্র পদ, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক, সহস্র উরু, সহস্র বাহু এবং যিনি কোটী কোটী যুগ ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।"

আমাদের হিন্দুর একটি নীতি-তন্ত্র আছে। তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকে কতকগুলি কাজ করিতে আদেশ করে, যাহা করিলে পুণ্য হয় এবং না করিলে শাস্তি পাইতে হয়। আমাদের নীতিতন্ত্রের সহিত তাঁহার নীতিতন্ত্রের কোন মিল নাই। কতকগুলি উচ্চভাব যাহা প্রত্যেক সমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধারণ, সেই সকল ভাবের উপরেই সকল সমাজ প্রতিষ্ঠিত। যে স্বার্থপ্রবৃত্তির প্রবলতাই এই—প্রতিবেশীর ক্ষতি করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে আপনার উন্নতিসাধন করা, সেই স্বার্থ-প্রবৃত্তিগুলিকে দমন ও যথাপথে নিয়োগ করাই এই উচ্চতর ভাবগুলির কাজ। উচ্চভাবের সহিত স্বার্থপ্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যেরূপে সামাজিক জীবন নিয়মিত হয়, সেই সামাজিক নিয়মের উপর সকল সমাজ প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য, এই ভাবগুলি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। যে সমাজের যেরূপ ভাব, তদনুসারে সমাজের গঠন, শক্তি, ও জমাটভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। প্রাচীন পুরাতন নগরে যেরূপ ভাব ছিল, তাহার ন্যায় এই ভাবগুলি অত্যন্ত সাদা-সিধাও হইতে পারে; আবার আধুনিক সমাজের ন্যায় এই ভাবগুলি অত্যন্ত জটিল হইতেও পারে। কত কত শতাব্দী হইতে সামাজিক অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়া তবে সেই প্রাচীন সহজ ভাবের উপর আর কতকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবের স্তর পড়িয়াছে। কিন্তু সরলই হউক বা জটিলই হউক, সকল সমাজেরই একটা অবশ্যপালনীয় নিয়ম আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যে নীতিতন্ত্র দেখা যায়, তাহার মূলসূত্র ও প্রকৃতি আমাদিগের নীতি হইতে অনেক ভিন্ন। অন্যের প্রতি কি কর্ত্তব্য সে বিষয় ইহাতে কিছু নাই:

কেবল, আপনার বাহ্য জীবন, আপনার অঙ্গভঙ্গী, আপনার আহার পরিচ্ছদ কিরূপে নিয়মিত করিতে হইবে, তাহারই উপদেশ আছে। কল্পনা কর, এই সকল সামাজিক সহজ সংস্কার, যথা,—বিশ্বাসঘাতী ও মিথ্যাবাদী হইও না, চুরী করিও না, হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, যুদ্ধে সাহসী হও, আপনার অধীনস্থ লোককে রক্ষা কর, নিজ প্রভুর অনুসরণ কর, নিজ সঙ্গীকে পরিত্যাগ করিও না, আপনার দলের প্রতি অনুরক্ত হও, প্রতিজ্ঞাপালন করিও, আপনার যশকে অকলঙ্ক রাখিও—কল্পনা কর যেন এই সকল সংস্কার মধ্যযুগে লোপ পাইয়া গিয়াছে—আর কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে; যথা, Mass-এ যাইতে হইবে, "ইষ্টর" অনুষ্ঠান করিতে হইবে—আত্মদোষ পাদ্রির নিকট প্রকাশ করিতে হইবে, উপবাস করিতে হইবে, "লেণ্ট" পালন করিতে হইবে, সন্তানদিগকে ব্যাপটাইজ্ করিতে হইবে, মুমূর্ষুকে তৈলাক্ত করিতে হইবে—এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি আরও অনন্তগুণ বৃদ্ধি কর—যাহাতে মানুষের সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তবে আমাদের হিন্দুর নীতিতন্ত্রের কতকটা আভাস পাইবে। তাঁহার নীতিতন্ত্রে মিথ্যা কথা কহিতে কিম্বা চুরি করিতে নিষেধ নাই। ইংরাজ-আধিপত্যের পূর্ব্বে, কতকগুলি সম্প্রদায় গুপ্তহত্যার শিক্ষা দিত, অথবা দলবদ্ধ চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা শিবের পূজা করিত। কিন্তু এই হিন্দু যদি কাহাকে মাংস খাইতে দেখে—যদি দুগ্ধ পান করিবার সময় দৈবক্রমে তাহার সহিত গরুর একগাছি লোম গলাধঃকরণ হয়, তাহা হইলে সে পতিত হইয়া থাকে—মৃত্যুর পর তাহার নিকৃষ্ট জন্ম হয়—সে বজ্র-নরকে, ফুটন্ত জ্বলন্ত তৈল-নরকে—সবিষসর্প-সঙ্কুল নরকে—উত্তপ্ত তাম্রের নরকে দণ্ডভোগ করে। শাস্ত্রের এই সকল আদেশ লঙ্ঘন

করিতে তাহার নিজেরই একটা আন্তরিক আতঙ্ক উপস্থিত হয়—শুদ্ধ বাহ্য শাসনের ভয়ে সে যে এরূপ করে তাহা নহে। এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক কুলাগত বদ্ধমূল হৃদয়ের ভাব সকল পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ধরিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে—এক্ষণে উহা সহজ প্রত্যক্ষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হত্যা করিও না বা চুরি করিও না—এ যেরূপ সহজ প্রত্যয়জাত নীতি, এই সকল কৃত্রিম বিধি-নিষেধও তেমনি হিন্দুর নিকট সহজ প্রত্যয়ের বিষয়।

বুদ্ধিমান বাঙ্গালী বাবুরা যাঁহারা আমাদের য়ুরোপীয় ভাব, চিন্তা, বিজ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত—যাঁহারা দর্শন ও নীতিবিষয়ে য়ুরোপীয় বলিলেও হয়—দেখা গিয়াছে তাঁহারাও অমনোযোগবশতঃ দৈবক্রমে গোমাংস-সূপ খাইয়া আতঙ্কে মূর্চ্ছা গিয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, সিপাহীরা মনে করিয়াছিল চর্ব্বিমাখানো বন্দুকের টোটা তাহাদিগকে দাঁত দিয়া ছিঁড়িতে হইবে, এই মনে করিয়া তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল—'মরিয়া' হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে, যখন ইংরাজেরা জেলখানায় জাতিভেদের নিয়ম রক্ষা করিতেন না, তখন গুপ্তহত্যাকারী অপরাধীরা অনশনে মরিতে প্রস্তুত, তথাপি অপবিত্র মাংস স্পর্শ করিত না।

কোন উপদেশ যাহার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য একেবারে বুদ্ধির অগম্য—যাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই—সেই উপদেশ পালন না করিলে পাপ এবং এই পাপের জন্য তোমাকে কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। এ এক অদ্ভুত ধরণের পাপ—অনুশোচনা কিম্বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। যান্ত্রিক ভাবে কোন একটা অর্থহীন অনুষ্ঠান করিলে, কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করিলে, গঙ্গায় একবার অবগাহন করিলে, পৌরোহিত কোন তিমিরকূপে একবার ডুব দিলে, ব্রাহ্মণের কর্ণ স্পর্শ করিলে,

গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, সমস্তবিশেষে হবিষ্যান্ন আহার করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।..... সকল হিন্দুই সেই চোর বাল্মীকির কথা জানেন, তিনি "মরা" "মরা" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করায় তাহা উল্টাইলে "রাম" "রাম" হয় বলিয়া শিব তাঁহার কৈলাসে বাল্মীকিকে স্থান দিয়াছিলেন।

হিন্দুর আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি এক এক সময়ে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। এই দেখ না কেন; আমার সম্মুখে, মানুষের মধ্যে থাকিয়া পাখীরা কেমন শান্তিতে বাস করিতেছে, ময়ূরেরা অবাধে নগরে বিচরণ করিতেছে। এই দেখ পশু-আশ্রম, এইখানে কুকুর হরিণ চীল প্রভৃতি সকল জাতীয় পীড়িত জীবের যা শুশ্রূষা হইতেছে। হিন্দুজাতির গভীর আন্তরিক মাধুর্য্য ও করুণার ইহা কি একটি নিদর্শন নহে? তথাপি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরাই নিষ্ঠুরতাতে, মার্কিনের আদিমনিবাসী লোহিতচর্ম্ম জাতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। এবং যদিও ইংরাজ শাসনে নরবলি প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও কালীমন্দিরে শিশুর মৃতদেহ কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রেম অজানা সামগ্রী। এখানে নয় বৎসরের শিশু দিগের বিবাহ দেওয়া হয়; যতদিন না যৌবনে উপনীত হয় ততদিন উহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা হয়। বিবাহ হইয়া গেলে, স্ত্রীলোক চিরকালের মত অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ। তাহার পিতামাতা ছাড়া তাহাকে আর কেহই দেখিতে পায় না। তাহার বন্ধুরা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও উল্লেখ করিতে পারে না—নিতান্ত অস্পষ্টভাবেও তাহার বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না—এমন কি, "বাড়ির সকলে কেমন আছেন?" একথাটিও বলিবার যো নাই। যদি স্বামী জানিতে পারে, তাহার স্ত্রীর কোন আত্মীয় তাহার স্ত্রীকে দেখিয়াছে

কিম্বা তাহার ভাই তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছে, তবে আর রক্ষা নাই—স্বামী তাহাকে বিধিমতে অপমানিত করে। স্বামী তাহার নাসিকা ছেদন করিতে পারে। বিধবা হইলে সে একেবারে "পারিয়া"র ন্যায় সমাজের পরিত্যক্তা—তাহার মুখদর্শন অশুভজনক বলিয়া তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লয়। বিবাহিত পুরুষ বিবাহের প্রতিজ্ঞা পালন করে না; এমন কি, বাহিরেও একটু ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলে না। আমরা যেস্থলে নানাপ্রকার গণ্ডি বচনা করিয়া—আবরণ দিয়া রাখি, উহারা সেইস্থলে প্রকাশ্য দিবালোকে যেন দোকান সাজাইয়া বসে। ধর্ম্মের এমন কোন নিয়ম নাই যাহা এই ব্যাপারটাকে গোপন করিয়া রাখিতে বলে। তা ছাড়া, অন্যান্য জাতিভেদের মধ্যে বেশ্যাশ্রেণীও একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া সমাজের মধ্যে পরিগণিত ও অনুমোদিত এবং উহাদের ব্যবহার ধর্ম্মকাজে নিতান্ত আবশ্যক। দাক্ষিণাত্যে, প্রতি দেবমন্দিরের কতকগুলি নর্ত্তকীদল নির্দ্দিষ্ট থাকে। শাক্তদিগের মতে, "শিবের শক্তি" সেই শক্তি যাহা হইতে জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে অনুষ্ঠান জগৎ উৎপাদনের প্রতিরূপী সঙ্কেত, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠান আর কিছুই নাই—সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্মিলন—সেই জড়ের সহিত আত্মার সংযোগ। পর্ব্বোৎসবে দীক্ষিতব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হয়। সেইসব উৎসবদিনে জাতি গোত্র আত্মীয়তার ভেদাভেদ একেবারে বিলুপ্ত হয়। নরনারীগণ তখন একপ্রকার রহস্যময় আবরণে আবৃত হয়—তখন আর তাহারা সীমাবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি নহে—তখন তাহারা শিব ও কালীর সাক্ষাৎ অবতার। শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন "সকল পুরুষই আমি।" উন্মত্তকর মদ্যপান করিয়া ও মৎস্য মাংস অন্নাদি আহার করিয়া স্ত্রীপুরুষেরা শিব কালীর সম্মিলন-উৎসব ঘোষণা করে। এই মুহূর্ত্তে

ভক্তের মনে হয় যেন তাহার ব্যক্তিত্বের বন্ধন সকল খসিয়া পড়িল—শিবের মধ্যে আত্মস্বরূপ বিলীন হইয়া গেল—জগতের আত্মার সহিত তাহার আত্মা এক হইয়া গেল। এই ধর্ম্ম সেই, যাহা উচ্চতম মুক্তির পথে লইয়া যায়—যাহার দ্বারা পরম পুরুষের সহিত জীবের লয়ভাব উপস্থিত হয়। এই ধর্ম্ম যে জানে সেই "সিদ্ধপুরুষ," যে না জানে সে "পশু"। কেননা, শাস্ত্রের একটা শ্লোকে আছে, মদ্যমাংস পানাহার স্ত্রীসহবাস না করিলে মুক্তি হয় না। হিন্দুজগৎ হইতে আমরা কতদূরে অবস্থিত ইহাতেই বেশ বুঝা যায়। অবশ্য, সকল হিন্দুই এই শাক্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, কিন্তু এই সকল ভাব ও কল্পনা যাহা আমাদের নিকট কল্পনার অতীত ও বিষম স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাহা হিন্দুমাত্রেরই সুপরিচিত—এবং বুদ্ধিগত ও নীতিগত বিকার, সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইলেও ইহার বীজ সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে বর্ত্তমান।

তাই বলিতেছি, ইহাদের মনের গঠন অত্যন্ত অদ্ভুত, শৃঙ্খলাবিরহিত, বিকৃত ও কলুষিত। এই অস্বাস্থ্যকর মানসিক ভূমিতে এখনও নানাপ্রকার অসম্পূর্ণ কুগ্নবীজ অজস্রকপে পতিত হইতেছে। সহস্র সহস্র হিন্দুযুবক রাজসরকারে কাজ পাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবর্ষের বহুল বিদ্যা এই সকল ছাত্রে পূর্ণ। অনেকেই তথায় সংস্কৃত, ফারসী ভাষা এবং পুরাতন প্রাচ্য দর্শন এবং দুই তিন অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সে ইংরাজি ভাব সর্ব্বত্র ভাসমান, সেই ভাবসকল তাহারা করিতেছে। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে শ্রেণীতে "আডিসন" "মেকলে

কাল পরে তাহারা, হয় হামিল্টন্ নয় স্পেন্সরের দর্শন আত্মসাৎ করে এবং ইংরাজি সমালোচন-পত্র ও সংবাদপত্র পাঠ করে। ঐ সকল পত্রে সাহিত্য, রাজনৈতিক ব্যাপার, বিবিধ সংবাদ, তথ্যসংগ্রহ তালিকা এবং ইংলণ্ডের জ্ঞানগত, নীতিগত, শিল্পগত, ধর্ম্মগত, বাণিজ্যগত সমস্ত বিষয়ের শ্রেণীবদ্ধ তন্ন তন্ন বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকে। তাহারা যে ইংরাজি সামাজিক উপন্যাস পাঠ করে তাহাতে ইংরাজের সকল প্রকার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রমজীবী, পাদ্রি, খালাসী, বালিকা, মধ্যবিৎ গৃহস্থ ও বণিক; এবং এই সকল বিচিত্র তার মধ্য হইতে উহারা একটি ভিন্ন জাতির—শুদ্ধ ভিন্নজাতি নহে—একটি স্বতন্ত্র মনুষ্যমণ্ডলীর জীবন, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, প্রেম, মৃত্যু এই সমস্তের একটা আভাস প্রাপ্ত হয়। কেবল যে উহারা এই সকল ভাব আত্মসাৎ করে মাত্র তাহা নহে, বৈদেশিক ভাবে জীবন যাপন করে—যাহা উহাদের নিতান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ তদনুসারে উহারা চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, অনুভব করে। এই নূতন শোণিত উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা উদ্বেগ ও অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। খুব সম্ভব, সুদূরবর্ত্তী অত্যন্ত ভিন্ন জাতির মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ ঘটিলে যে ফল হয়, ইহাতেও সেই ফল হইবে। অর্থাৎ, হয় একবারে গর্ভপাত, নয় এমন অস্বাভাবিক বিকটাকার জীব উৎপন্ন যাহা অধিকদিন বাঁচিবার নহে।

তাতে নদীর ধারে একটি ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত হইল। যুবকের মুখশ্রীটি বেশ বুদ্ধি-বিকশিত ও চখে পড়ে। তাহার সহিত কথা কহিতে কহি- গুলি আমার মনের উপর দিয়া চলিয়া র ইংরাজি ইস্কুলের ছাত্র—"সিভিল আলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের

পাঠ্য-ক্রম অনুসরণ করিতেছে। যুবক "ওডিসন" পাঠ করিয়াছে, এক্ষণে উপনিষদ অধ্যয়ন করিবে। ইতিমধ্যে গণিতের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। 'ভারতের জন্য ভারত' এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সে তর্ক বিতর্ক করিল এবং দেখিলাম, আত্মশাসনপ্রার্থী, আলাহাবাদ কংগ্রেসের সম্বন্ধে তাহার খুব উৎসাহ, অথচ এদিকে, সে যে জাতির অন্তর্গত, সে জাতি হইতে তাহার বাহির হইবার যো নাই; সে লিঙ্গপূজা করে—শিবপূজা করে, গণেশ পূজা করে, বিষ্ণুপূজা করে; ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া, গঙ্গাদিগকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, সে পূজা অর্চনা করে। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে কুলাগত রীতি অনুষ্ঠান কতকটা ধ্বংস হইবার কথা ; কিন্তু এটি যেন স্মরণ থাকে সে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বাস করি-ছে—নানাপ্রকার অনুষ্ঠান চক্ষের সামনে ক্রমাগত দেখিতেছে। তাহে তাহার অন্তরাত্মার অন্তরতম দেশে এমন একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, যাহা কোন বক্তৃতা—কোন তর্ক অপনীত করিতে পারে না। আমাদের নিকট যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত, উহার নিকট তাহাই খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। হিন্দু-দের মানসিক গঠন আমাদের হইতে এত ভিন্ন যে আমরা সহানু-ভূতির দ্বারা তাহাদের ভাব ও চিন্তা মনে ধারণা করিতে পারি না। প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকিলে একজন য়ুরোপের লোক মধ্যযুগের মঠধারী "অফের" ভাব—কিম্বা অ্যাথেন্‌স্-বাসী বাস্তুনির্মাতার নির্মাণ-কল্পনা মনে ধারণা করিতে পারে। কেন না, যদিও বহুশতাব্দী অতীত হই-য়াছে, তথাপি উহারা আমাদের সম্বন্ধে নিতান্ত পর নহে। আমরা উহাদেরই সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা গ্রীস দেশীয় মন্দির-গঠন কিম্বা নবম শতাব্দীর গোথিসাবাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু বল দেখি, আমাদের মধ্যে এমন

কে আছে, যে কোন পুরাণের তাৎপর্য্য কি? বা হিন্দু মট্টালিকার গঠনপ্রণালী সম্যকরূপে বুঝিতে পারে? এই হিন্দুদিগের সহিত আমাদের যদি কোন বংশসম্বন্ধ থাকে, তবে কৃষ্ণবর্ণজাতিদিগের সহিত উহাদের মিশামিশি হওয়ায় এবং বিরুদ্ধ জলবায়ুর প্রভাবে তাহা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে। এক প্রকার অদ্ভুত রহস্যময় উপাদানে উহাদের মন গঠিত—উহা আমাদের কল্পনার অতীত। শুদ্ধ কল্পনার অতীত নহে, উহা আমাদের কল্পনার বাহিরে অবস্থিত। উহাদের মনের বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, উহাদের বহির্ভাগ, উহাদের মুখাবয়ব, উহাদের অঙ্গভঙ্গী, উহাদের রীতি অনুষ্ঠান, উহাদের দেব-প্রার্থনা, উহাদের ধরণ-ধারণ, শিল্প, আচার ব্যবহার সমস্ত আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু উহা[illegible] স্তরের গভীরতম দেশে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।

প্রতীচ্য গণিত।

প্রাচীন জাতির আদিম ইতিহাস লইয়া আজকাল মহা আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু এই আন্দোলন ও অনুসন্ধানের ঈপ্সিত ফল প্রায়ই দেখা যায় না। ইহার জন্য অনুসন্ধানকারীগণের প্রতি দোষারোপ করিতে পারা যায় না, কারণ, ইতিহাসহীন ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঈজিপ্ট, গ্রীস, ও ইটালি প্রভৃতি অন্যান্য সভ্যদেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি খুঁজিলে, তৎকালিক আচার ব্যবহার ও প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়; এই প্রয়াসে যদি বা কখন দুই একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ধার হয়, কিন্তু তাহা এত অসম্বদ্ধভাবে এবং অতিরঞ্জিত ও অসংযত ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকে যে, প্রকৃত ও কাল-

নিত্য ঘটনার মধ্যস্থ পার্থক্য, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঐতিহাসিকেরও নয়ন-গোচর হয় না। এই প্রকার নানা কারণে কখন কখন প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণ, কবিকল্পিত অপ্রকৃত ঘটনাকে, প্রকৃত অনুমান করিয়া তদানুষঙ্গিক অলঙ্কারাদি পরিবর্জ্জন করিয়া, ঘটনাটীকে আধুনিক লোকবিমোহন পরিচ্ছদে সাজাইয়া, ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া খাড়া করিয়া তোলেন।

প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে, উত্তর পুরুষের উপকারার্থে ও জাতীয় গৌরব সংরক্ষণ করিবার জন্য, ইতিহাস লেখা পদ্ধতিটি প্রচলিত না থাকায়, আমরা অনেক অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিতেছি না, এবং এ জন্যই পূর্ব্বপুরুষের আচার-ব্যবহার, উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস আলোচনাজনিত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। অল্প দিন হইল, কয়েকটী য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্, গণিত শাস্ত্রের আদিম অবস্থা ও য়ুরোপে ইহার বিস্তার এবং ক্রমোন্নতির ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। এই দুরূহ কার্য্যের ভার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহারা যে নানা দেশীয় দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থস্থ অসম্বদ্ধ বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য গণিতের পূর্ব্বাপর অবস্থা ইতিহাসাকারে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

গণনা শাস্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা কোন্ সময় হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা হয় না। তবে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭০০ অব্দেও গণিতের চর্চ্চা ছিল দেখা যায়। এই সময়কার গণিতকে "শাস্ত্র" বা "বিদ্যা" আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়, কারণ তখন ইহা একটী পৃথক্ বিদ্যারূপে অধীত

হইত না, কেবলমাত্র ইজিপ্ট ও ফিনিসিয়া প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকিয়া; গণিতবিদ্যা, মনুষ্যভাগ্যের শুভাশুভ ও ভবিষ্যৎনিরূপক শাস্ত্র-রূপে কয়েকটী সমাজের মধ্যে বিচরণ করিত মাত্র, এবং গণিত যে প্রাত্যহিক গৃহকার্য্যে পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাও কেহ জানিত না।

সংগৃহীত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে আহেমে নামক জনৈক ইজিপ্টীয় ধর্ম্মযাজকলিখিত গণিতপুস্তক, সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; অতি প্রাচীন ব্যক্তিগণের জীবনীর ন্যায়, আহেমের জীবনী ও জন্ম-মৃত্যু-সংক্রান্ত কোন কথাই আজও জানা যায় নাই; প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক, গ্রীসের প্রথম গণিতজ্ঞ পণ্ডিত থেলিসের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার গণিতগ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়াতে, গণিতশাস্ত্রে প্রাচীনত্ব যে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধ্যাপক ক্যাণ্টর প্রমুখ পণ্ডিতগণ, আহেমের হস্তলিপি পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ত্রিকোণমিতির স্থূল বিষয় সম্বন্ধে এই প্রাচীন ধর্ম্মযাজকের কতকটা জ্ঞান ছিল এবং ত্রিকোণমিতির সাহায্যে তিনি যে কয়েকটী প্রাচীন পিরামিডের উচ্চতা ও আকার নির্দ্ধারণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা ক্যাণ্টরের কথার সত্যতা বেশ প্রমাণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থস্থ অন্যান্য কৌতূহলজনক লিপির মধ্যে, সংখ্যাসকলের ক্রিয়াজ্ঞাপক চিহ্ন-সকল অতি অদ্ভুত উপায়ে লিখিত আছে,——ইহাতে অজ্ঞাত সংখ্যা প্রায়ই স্তূপ বা রাশিবোধক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,*

* আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গালার আধুনিক গণিতজ্ঞও সংখ্যা "রাশি" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

এবং যোগ ও বিয়োগের চিহ্নদ্বয়, যথাক্রমে অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী পদযুগলের প্রতিকৃতি দ্বারা ব্যক্ত আছে, এবং ॥/ চিহ্ন সমান-বোধক সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিখিত চিহ্ন সকল যতই অসুবিধাজনক ও কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হউক না কেন, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অঙ্কবিদ্যার অতি শৈশবাবস্থায় বীজগণিতের সঙ্কেতসকলের ব্যবহার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই চিহ্নসকল কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই; পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে কোন চিহ্নেরই ব্যবহার দেখিতে না পাওয়ায়, অনেকে অনুমান করেন, আহেমি স্বয়ংই ইহার প্রবর্ত্তক, এবং পরবর্ত্তী গণিতবিদ্‌গণ এগুলি অসুবিধাজনক বিবেচনা করিয়াই হউক, বা ইহাদের ব্যবহার না জানার কারণেই হউক, তাহাদের গ্রন্থাদিতে সঙ্কেত ব্যবহার করেন নাই। আধুনিক যোগ বিয়োগের সঙ্কেতাদির (+ এবং —) সহিত, আহেমে প্রবর্ত্তিত চিহ্নগুলির কোন ঐক্যই নাই এবং বাস্তবিকই এগুলি প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত হয় নাই; উইণ্ডম্যান সাহেব কৃত "মার্কেণ্টাইল আরিথমেটিক্" নামক গণিত গ্রন্থে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং সঙ্কেতগুলি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সুবিধাজনক বলিয়া অনুমোদিত হইলে, সেই সময় হইতে, গণনাক্রিয়ায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

আহেমের জন্মকাল নিরূপিত না হওয়ায়, প্রাচীন গণিতের জন্মকাল সম্যক স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী গ্রীক্ গণিতাচার্য্য থেলিসের আবির্ভাবসময় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, উক্ত গণিতবিদের জীবিতকাল হইতে, কয়েকজন গণিতের ইতিহাস গণনা করিতেছেন। এপ্রকার গণনাতেও অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, এবং আপত্তির যথেষ্ট

ভিত্তি আছে, কারণ আহমে ও থেলিসের অভ্যুদয় সময়ের মধ্যবর্ত্তী সহস্র বর্ষে যে গণিতচর্চ্চা ছিল না, এবং থেলিস্ হঠাৎ অঙ্কবিদ্যায় মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এপ্রকার একটা সিদ্ধান্ত করা বড় যুক্তিসঙ্গত নয়। যাহা হউক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে থেলিস্‌ই গ্রীসদেশে অঙ্কবিদ্যার প্রথম সূত্রপাত করেন, এবং কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮৫ অব্দে একটী সূর্য্যগ্রহণসম্ভাবনা গণনা করিয়া এবং গণনালব্ধ সময়ে গ্রহণ সংঘটিত হওয়ায়, থেলিসের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং অনেকে গণিতশিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। আরও শুনা যায়, এক সময়ে পিরামিডের উচ্চতা নিরূপণের একটী অতি সহজ উপায় আবিষ্কার করিতে কৃতকার্য্য হওয়ায়, অনেক রাজা ও ধনবান ব্যক্তি থেলিসের শিষ্য হইয়া গণিত শি করিয়াছিলেন।

গণিত সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা গল্প ও ইহার প্রচলনের অন্য অনেক প্রমাণাদি নানা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হইলেও, থেলিসের অভ্যুদয়কাল হইতে প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ইউক্লিডের সময় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কালে লিখিত গণিত সম্বন্ধে কোন হস্তলিপি বা গ্রন্থাদি কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উক্ত সময়ে বংশানুক্রমে মৌখিক শিক্ষাদান প্রথা প্রচলিত ছিল, নবাবিষ্কৃত বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিয়া উত্তরপুরুষের উপকারার্থে সংরক্ষণ করা, পণ্ডিত সমাজের প্রচলিত নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইত; পিথাগোরাস-প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ "গুপ্তসমাজ" এই অদ্ভুত প্রথার একটী বিশিষ্ট উদাহরণ। পিথাগোরাস তাঁহার মণ্ডলস্থ শিষ্যগণের মধ্যে পুস্তক ব্যবহার এককালীন রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং মণ্ডলস্থ প্রত্যেককে সমভাবে মৌখিক শিক্ষা প্রদান করিতেন;

আরও নিয়ম ছিল, যে, কোন শিষ্য স্বীয় প্রতিভাবলে কোন অপরিজ্ঞাত বিষয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলে, আবিষ্কারজনিত সকল সম্মানই মণ্ডলস্থাপয়িতার উপর অর্পিত হইবে। এমন কি প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত দোষাবহ ও বিধি-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যদি কখনও মণ্ডলাধ্যাপিত বিদ্যাবিষয়ক কোন সংবাদ বহিঃস্থ ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িত, তাহা হইলে শিষ্যগণকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইত। পিথাগোরাসের গণিতমণ্ডলস্থ হিপোসস্ নামক জনৈক শিষ্য, একটী জ্যামিতিক ঘন ক্ষেত্র * আবিষ্কার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া সাধারণে প্রচার করায়, নিয়ম ভঙ্গাপরাধে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭০ অব্দে, তাঁহাকে সলগ্ন করিয়া নির্দ্দয় ভাবে বধ করা হইয়াছিল। এই সকল প্রথা প্রচলিত থাকায়, অনেকগুলি প্রাচীন গ্রীক গণিতাধ্যাপকের অধ্যাপনা ও গবেষণার ফল প্রায়ই পণ্ডিতগণের ক্ষুদ্র জীবনের সহিত সমাহিত হইয়া গিয়াছে, এবং যাহা কিছু প্রথাবিরুদ্ধোপায়ে উত্তরপুরুষের হস্তগত হইয়াছে, তাহা কালসহকারে এত বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে, যে, তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যাপারের কোনই সহায়তা হইতেছে না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই সকল কুপ্রথা অধিককাল প্রচলিত ছিল না, গণিত বিদ্যার ক্রমিক প্রসারণের সহিত, ধীরে লিপিপ্রথা ইহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। লিপিপ্রথা প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী বহুসংখ্যক প্রাচীন গণিতগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ফাইলোলস্ প্রণীত হস্ত-লিপিই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও গণিতবিদ্ প্লেটো এই অমূল্য গ্রন্থ হস্তগত

* Dodecahedron.

করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

গ্রীসীয় গণিতের আদিগুরু থেলিসের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য আনেক্‌জিমাণ্ডার, তাঁহার গুরু অপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি বিখ্যাত পণ্ডিতের শিক্ষকতা করিয়া সকলের নিকটই মাননীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পিথাগোরাস্ তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন। গণিতের ইতিহাসের এই যুগে, গ্রীসে অনেকগুলি গণিতবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়া অঙ্কবিদ্যার অশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের প্রিয়শিষ্য আরকাইটস্ নামক পণ্ডিত ইয়োডক্সস্, ফিলোলস্, প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে গণিত শিক্ষাদান করেন; আবার প্লেটোর প্রধান শি মেনিকনস খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া, নানাপ্রকা গণিতবিদ্যার সম্যক বিস্তার ও উন্নতির উপায় বিধান করেন. মেনিকনসের জীবনের শেষ ভাগে বিখ্যাত গণিতবেত্তা ইউক্লিডের অভ্যুদয় হয়। সংগৃহীত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে, থেলিস এবং ইউক্লিডের অভ্যুদয়কালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, উল্লিখিত পণ্ডিতগণের সামান্য পরিচয়াদি ব্যতীত আর অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। ইহাঁদের মধ্যে প্লেটোর সমসাময়িক নিড্‌স্‌নিবাসী ইয়োডক্সসের অনেক কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র গণিতে পারদর্শী ছিলেন না, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রাজনৈতিক ব্যাপারেও একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; কথিত আছে বক্ররেখা ও তাহার লক্ষণ সকল ইয়োডক্সসই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং অনেকগুলি অভিনব গণিতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থাদিই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গ্রীসের পূর্ব্ববর্ণিত উন্নতি যুগের পর, টলেমি কর্ত্তৃক আলেক্‌

আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর ও তত্রস্থ সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন গণিত-বিদ্যার প্রাচীন ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা; আলেকজাণ্ড্রিয়াতেই গণিতের যথার্থ চর্চ্চা আরম্ভ হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ পুস্তকালয়, পরীক্ষাগার, চিত্রশালিকা ও নানা প্রাচীন গ্রন্থের একত্র সমাবেশ হওয়াতে, এবং ইহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা টলেমির অদম্য যত্নে ও যত্নে প্রথম হইতেই আলেকজেণ্ড্রিয়া সার্ব্বভৌম বিদ্যার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং এই বিদ্যাক্ষেত্রে নানাদেশীয় পণ্ডিত সমাগত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রের গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এমন সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইত, যে, ইহার সংস্থাপনের পরবর্ত্তী একশতাব্দীর মধ্যে, ইউক্লিড, আরকিমিডিস্, আপোলোনিয়স্ প্রমুখ কয়েকটী পণ্ডিত আলেকজেণ্ড্রিয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া গণিতবিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন, এই সময়েই আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতের মূলভিত্তি প্রোথিত হয়।

আলেকজাণ্ড্রিয়ার পণ্ডিতগণ যে সকল পুস্তকাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি আজও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থই সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রাপ্তগ্রন্থগুলির মধ্যে ইউক্লিড ও আরকিমিডিসের পুস্তকাবলীই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত আপোলোনিয়সের "কনিকস্," টলেমির গ্রন্থাবলী, পেপসের "গণিতসংগ্রহ" এবং ডাইওফন্টসের পাটীগণিত ও বীজগণিত প্রভৃতি পুস্তক, গণিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এক একখানি অমূল্য পুস্তক বলিয়া পণ্ডিতসমাজে আদৃত হইয়াছে। আলেকজেণ্ড্রিয়া মহাগৌরবে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে অনেক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু

তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী পণ্ডিতের কীর্ত্তির সহিত আমরা বিশেষ পরিচিত, অপর পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও সম্পূর্ণ জীবনী বা পুস্তকাদি হস্তগত হয় নাই।

৬৪১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ কর্ত্তৃক আলেকজেণ্ড্রিয়া ধ্বংস হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান দার্শনিক ও ছাত্রগণ আক্রমণকারী মুসলমানগণের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে গ্রহণ করেন এবং সেখানে সকলে একত্রিত হইয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রাচীন বিদ্যাক্ষেত্র আলেকজেণ্ড্রিয়ায় যে সুবিধা হইয়াছিল, সুবিধাটী আর ফিরিল না—এখানে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও কোন ছাত্রই ইউক্লিড আর্কিমিডিসের ন্যায় যশস্বী হইতে পারেন নাই এবং বিশ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী নয় শত বৎসরের মধ্যে গণিত সম্বন্ধে উল্লে যোগ্য কোন আবিষ্কারই হইতে দেখা যায় নাই। কনষ্টাণ্টিনো পণ্ডিতগণ নূতন বিষয় আবিষ্কারে ও অনুসন্ধানে মনোনিবেশ না করিয়া যাহাতে অনাবিষ্কৃত বিষয় সকল লিপিবদ্ধ হইয়া সংরক্ষিত হয় এবং তৎসমুদয়ের বিস্তার হয় তৎপক্ষে কতকটা সচেষ্ট ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আলেকজেণ্ড্রিয়ার পণ্ডিতগণের পুস্তকসকলের সংস্করণ ও প্রসারণ ব্যতীত কনষ্টাণ্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি দেখা যায় না।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধঃপতন হয়; ইহার পর হইতে পশ্চিম য়ুরোপে আরবগণ কর্ত্তৃক গণিত শাস্ত্রের বিস্তার আরম্ভ হইতে দেখা যায়। আরবগণ প্রসিদ্ধ হারুণ-আল্-রসিদের রাজত্বকালে, কনষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থান করিয়া এবং ভারতবর্ষের আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান

ীতগণের গণিতগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া প্রাচীন গণিতে বিশেষ
পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং আল্‌কারিস্মি, আলহাজেন, আব-
াজেল প্রভৃতি গণিতবিৎগণ, স্বাধীন গবেষণা দ্বারা নানা বিষয় আবি-
ও করিয়াছিলেন। কথিত আছে, টার্টাগ্লিয়া ঘনবাশির ফল বাহির
বার উপায় উদ্ভাবন করার সার্দ্ধ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, আরব-
ভবিৎ টাবিটইবন-কোরা তাহা প্রথম আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ
া রাখিয়াছেন; এবং দুইটী ঘনবাশির সমষ্টি কখনই একটী ঘন-
ধ হইতে পারে না এ সিদ্ধান্ত বহুকাল পূর্ব্বে আব্বাজান্দি নামক
ক আরব গণিতবেত্তা প্রথম প্রচার করেন বলিয়া শুনা যায়।
গণ এই প্রকারে নানাস্থান হইতে গণিত শিক্ষা করিয়া, য়ুরো-
অনেক দেশে, ইহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।
ত বিস্তার ব্যাপারে আরবীয় প্রভাব সম্বন্ধে আধুনিক কয়েক-
প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আর এক সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার জন্য সচেষ্ট
ন। ইহাঁরা বলেন, আরবগণ কর্ত্তৃক গণিতবিস্তারের পূর্ব্বে,
িজরী আফ্রিকাবাসী মুরগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে
প প্রাচীনগণিতের আংশিক বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়।
গণ যাহাই অনুমান করুন না কেন, মুসলমানগণ যে পশ্চিম
রোপে গণিত বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাতে
ার সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী
ক শত বর্ষে য়ুরোপে গণিত বিদ্যার এত অধিক প্রসারণ হইয়াছিল
, ইউক্লিড, আপোলোনিয়স, টলেমি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রাচীন
ই প্রত্যেক দেশের বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল
বং এই অত্যল্প সময় মধ্যে রজার, বেকন, লিওনার্ডো প্রভৃতি
েক জন পণ্ডিত, গণিতবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়া সারগর্ভ গণিত
াদি পর্য্যন্তও রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

য়ুরোপে প্রথম হইতেই অপ্রতিহত গতিতে গণিতের বিস্তার আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সহিত গণিত বিদ্যার নানা উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে ডেকার্টিস্ প্রণীত জ্যামিতি প্রথম প্রকাশিত হয় য়ুরোপীয় অঙ্কবিদ্যায় এক যুগান্তর উপস্থিত করাইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী এক শতাব্দীতে য়ুরোপে অনেক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা গণিতশাস্ত্র নানা প্রকারে উন্নত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে ষ্টীপেল, টর্টাগ্লিয়া, কার্ডে কেরারি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বীজগণিতের সংস্কার করিয়া ইহাকে একটী সুন্দর তর্কবিদ্যা করিয়া তুলিয়াছেন এবং বেটিকা নেপিয়ার প্রমুখ গণিতবেত্তাগণ ত্রিকোণমিতির সংস্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, এই সময়ের মধ্যে কোপার নিকাস্, কেপ্লার, গ্যালিলিও প্রভৃতি পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া জ্যোতির্বিদ্যার যে কি অভাবনীয় উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ডেকার্টিসের পরবর্ত্তী, কাভেনারি, পাস্কাল, ওয়ালিস্, ও হিজেনজ্ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ নানা গণিত-পুস্তকাদি লিখিয়া করিয়াছেন, এবং তাহাতে পূর্ব্বপরিজ্ঞাত গণিত সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কাভেনারি ও ব্যারো, তাঁহাদের পুস্তকে আধুনিক ইনটিগ্রাল ও ডিফারেনসিয়াল কালকুলস্‌এর রচনা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের পরেই নিউটনের অভ্যুদয় হয়, তদাবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া ও জ্ঞ বর্ম্মক্রম দ্বারা গণিতের বহুল উন্নতিসাধন হইয়াছে, এবং প্রাচী গতি ও স্থিতি-বিজ্ঞান তাঁহার গবেষণাফলে সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কয়েকটি অধ্যাপক গণিতগ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, ক্লেরাণ্ট ও ডি-আলাম্বার্ট নামক দুই জন ফরাসী অধ্যাপক এবং টেলর ও মাক্লারিন নামক ব্রিটিশ অধ্যাপকদ্বয়ের নামই উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মাথু ষ্টুয়ার্ট নামক জনৈক গণিতবেত্তা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; মাক্লারিণের মৃত্যুর পর, এডিনবরার গণিতাচার্য্য পদ শূন্য হইলে, ষ্টুয়ার্ট উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি স্বাধীন গবেষণাদ্বারা গণিত শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু নিউটন মাক্লারিণের ন্যায় তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, অধিকাংশ সময়েই জ্যামিতিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকায়, স্বাধীন চিন্তার অবসর না পাইয়া প্রতিভাকে অলস করিয়া রাখিয়াছিলেন।

উপসংহারে পাশ্চাত্যগণিতের বর্ত্তমান যুগের আরও দুই একজন গণিতজ্ঞের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। লাগ্রেঞ্জ, লাপ্লাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় এবং আধুনিক জ্যামিতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা গণিতকে আরও ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ইউলার, উথান, সিম্পন, ব্যাবেজ, হার্সেল, পিকক্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ নানা গণিতপুস্তকাদি লিখিয়া এবং এই কঠিন শাস্ত্রে নানা সুবিধাজনক সঙ্কেতাদির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত এবং তদ্দ্বারা ইহার সাধারণের আয়ত্তাধীন করিয়া, সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

Bull's Short History of Mathematics.

নূতন তাম্রশাসন।

॥ তৃতীয় প্রবন্ধ ॥

এই তাম্রশাসনের সম্প্রদান "নারায়ণ ভট্টারক" এবং বেণী-সংহারের বচয়িতা "ভট্টনারায়ণ" যে একই ব্যক্তি তাহার প্রমাণ কি?

প্রথমতঃ ভট্ট ও ভট্টারক সমানার্থক শব্দ। সচরাচর বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিতকে ভট্ট বলা যায়। ভট্ট শব্দ স্বামিত্ব বোধক। ব্রাহ্মণ বেদাভিজ্ঞ হইলেই তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়। প্রায়ই তিনি অধ্যাপক হয়েন এবং বহুসংখ্যক ছাত্র প্রতিপালন করেন। ছাত্রেরা অধ্যাপককে ভট্ট বা স্বামী বলিয়া সম্বোধন করেন। এদিকে "ভট্টং স্বামিত্বং ঋচ্ছতি ইতি ভট্টারঃ,"—তাহার পর স্বার্থে কৃ বলিয়া ভট্টারক শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হয়। এবং অভিধানে "রাজা ভট্টারকো দেবঃ" এইরূপ প্রতিশব্দ দেখা যায়। অমরকোষ অভিধানে ঐরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। তাহাতে ভট্টারক শব্দের অর্থ রাজা। মেদিনী অভিধানে তদতিরিক্ত "তপোধনে চ" বলিয়া অপর অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে ভট্টারক শব্দে যেমন রাজা বুঝায় তেমনি তপোধন ব্রাহ্মণকেও বুঝায়। এদিকে ভট্টিনী শব্দে তদ্রূপ যেমন রাজার স্ত্রীকেও বুঝায় তেমনি ব্রাহ্মণের স্ত্রীকেও বুঝায়।

পুংলিঙ্গ ভট্ট ভট্টার ভট্টারক ও স্ত্রীলিঙ্গ ভট্টিনী সকলই বোধ হয় সংস্কৃতে "ভর্ত্তৃ" বা "ভর্ত্তর" শব্দের প্রাকৃত আকার। হে ভর্ত্তঃ (সং) = হে ভট্ট (প্রা)। বাঙ্গলায় যে "ভাতার" (স্বামী) শব্দ স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করেন—তাহার সহিত "ভট্টার" শব্দের নিকট সম্বন্ধ আছে বোধ হয়।

তাম্রশাসনের দাতা ও সম্প্রদান উভয়েই "ভট্টারক" শব্দে

উল্লিখিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপাল "পরমেশ্বরঃ পরম ভট্টারকঃ" এদিকে "ভগবন্নৃ নারায়ণ ভট্টারকায়" চারিখানি গ্রাম দেওয়া হইল। ধর্ম্মপাল ভট্টারক অর্থাৎ রাজা; নারায়ণও ভট্টারক বা ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ। মূলশব্দ "ভট্টার"; তাহারই পরিবর্দ্ধিত আকার "ভট্টারক"। যেমন "ঘোট" "ঘোটক"। আর "ভট্ট" ও "ভট্টার" উভয়ই "ভর্ত্তৃ" শব্দ হইতে উৎপন্ন ও সমানার্থক বলিয়া বোধ হয়।

অতএব "নারায়ণ ভট্টারক" এবং "নারায়ণ ভট্ট" একই শব্দ। আর ভট্ট শব্দ নামের প্রথমেও বসে শেষেও বসে। কুল্লূক ভট্টের পিতা ভট্ট দিবাকর। তাহাতে যে ব্যক্তিকে ভট্টনারায়ণ বলা যায় তাহাকে নারায়ণ ভট্ট বা নারায়ণ ভট্টারকও বলিবার কোনও আপত্তি নাই।

কিন্তু ভট্টনারায়ণ এবং নারায়ণ ভট্টারক নামে সমান হইলেও তাঁহাদের সম্প্রদান এবং বেণীসংহারের রচয়িতা যে অভিন্ন তাহার প্রমাণ কি? ইহার এক প্রমাণ এই যে, নারায়ণ ভট্টারক পুণ্ড্র দেশে লাট বা কনোজ-দেশীয় ব্রাহ্মণদের নিকট অতিথিস্বরূপ আসিয়াছিলেন। ইহাতে সম্ভবতঃ তিনিও নিজে লাট বা কনোজ-দেশীয় লোক ছিলেন। বেণীসংহারের রচয়িতাও কনোজদেশীয় লোক। ফলতঃ যদি ইহা ভিন্ন আর কিছু প্রমাণ না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই বিষয়টি অনিশ্চিত থাকিয়া যাইত।

কিন্তু বেণীসংহারের রচয়িতা ভট্টনারায়ণ যে রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণান্তর রহিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে আমরা সেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে জানা যায় যে, রাজা ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞী ওঝাকে ধাগনার নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই কথা এক্ষণে আমাদের নূতন তাম্রশাসনের দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় লেখেন "এবং হি প্রাসাদোইস্তি, স মহাকবিরিদং নাটকং প্রণীয় নরপতয়ে আদিশূরায় উপহারং দাতুমাগিনিবে। তদানীমসৌ ভূপতী রামপালনগর্য্যাং প্রাসাদে অবিরাজতেস্ম। অভিনবপ্রণীতং নাটকমাদায় কবাবুপস্থিতে রাজা সবহুমানং স্বীচকার, সন্তুষ্টেন চ তেন বঙ্গদেশস্য পূর্ব্বস্যাং দিশি প্রভূততবাং ধরাং দত্ত্বা কবিঃ পরিতোষিতঃ।"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের লেখাতে সত্য ও কল্পনা অতি বিচিত্র রূপে জড়িত হইয়াছে। তাঁহার উল্লিখিত প্রবাদে জানা যায় ভট্টনারায়ণ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে এদেশে আইসেন নাই; নূতন নাটক লিখিয়া এতদ্দেশীয় রাজাকে তাহা উপহার দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে রাজাকে উপহার দিতে আইসেন তাঁহার নাম আদিশূর নহে, তাঁহার নাম ধর্ম্মপাল। আদিশূর তখন কিছু দিন হইল গত হইয়াছেন। প্রাচীন নাটক হরিমিশ্রের লেখায় জানা যায় আদিশূর পালবংশের পূর্ব্বে গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কি আদিশূর কি ধর্ম্মপাল কাহারই সময়ে রামপাল নগরীর অস্তিত্ব ছিল না। কেননা বিক্রমপুর বিভাগে রামপাল নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামপাল পালবংশের শেষ রাজা, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, আর ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন—আদিশূর তাহার দ্বারো কিছু পূর্ব্বে। আর রাজা ধর্ম্মপাল যে কবি ভট্টনারায়ণকে "প্রভূততরা ধরা" দান করিয়াছিলেন তাহা আমাদের তাম্রশাসনে স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। তাম্রশাসন দ্বারা যে ভূমি ভট্টনারায়ণকে প্রদান করা হয়—তাহা এক্ষণকার হিসাবে লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের। দানের মূল্যে সম্প্রদানের গুণাধিক্য প্রকাশ করিতেছে।

যে সময়ে ভট্টনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হয়েন তখন তাঁহার জন্মভূমি
ল দেশের বড়ই দুরবস্থা। রাষ্ট্রকূট রাজাদের আক্রমণে কবির
শীয়েরা তৎকালে ভীষণরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। দেখে
জক হইয়াছিল। স্বদেশের এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে কবির হৃদয়
ভ উদ্বেলিত হইয়াছিল বোধ হয়। দেশীয় যোদ্ধাদের বীরভাব
ত করিবার জন্যই আমার বোধ হয় বেণীসংহার রচিত হয়।
ংস্কৃত ভাষায় বীররসের ঈদৃশ কাব্য দ্বিতীয় নাই। হে
বাসীগণ! তোমাদের প্রাচীন রাজকন্যা দ্রৌপদী শত্রুহস্তে
কর্ষণরূপ অবমাননা সহ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,
ন সময়ে শত্রু বিনষ্ট না হয়—তত দিন এ কেশ বাঁধিব না।
মণীর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল। তোমরাও রাজ-
া সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, শত্রু নিপাতের প্রতিজ্ঞা কর।
ি ভীমের ন্যায় সমরে প্রাণপণে অগ্রসর হও।

'যদি সমরনপাস্য নাস্তি মৃত্যো-
র্ভয়মিতি যুক্তমিতোঽন্যতঃ প্রযাতুং।
অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বম্?"

পঞ্চালরাজের সেনাগণকে এইরূপে বীরমদে মাতাইবার জন্যই বেণীসংহার রচিত হইয়াছিল। কবি মনে করিয়াছিলেন রাজা তাঁহার কাব্যে মুগ্ধ হইবেন—স্বদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সঙ্গীতে মাতিয়া যুদ্ধে শত্রুসংহার করিবে। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। পঞ্চাল তখন নির্বীর। পাঞ্চালেরা স্বীয় বাহুবলে স্বাধীনতার উদ্ধার করিতে পারিল না। গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপাল আসিয়া কনোজকে ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। চক্রায়ুধ তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিয়া পৈতৃক

সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এরূপ রাজার নিকট বেণীসংহার সমাদর হইল না; কবি তখন রামভট্টের প্রতিপালক হর্ষবর্দ্ধন স্মরণ করিয়া বিলাপ করিলেন,

কাব্যালাপপ্রকটিতকলানিষ্ণতে রাজহংসাগতা
যা গৌড়ঃ হৃদয়মগতা গুণলব্ধপ্রতিষ্ঠা বাচঃ সতাম্।
সা সাম্প্রতং কবিপ্রসাদমধুমাকারাঃ কবীনাং গিরঃ
প্রাপ্তা নাশম্—অহন্ত ভূমিবলয়ে জীয়াৎ প্রবন্ধো মহান্।

কবি আপনার প্রতিভা আপনি বুঝিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর যদিও তাঁহার কাব্যের সমাদর করিলেন না—তত্রাচ সেই কাব্য পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে তদ্বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। অনেক আশা করিয়া স্বীয় রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—

দয়িতভুবনো বিদ্বদ্বন্ধুর্গুণেষু বিশেষবিৎ।
সততসুকৃতী ভূয়াদেষ প্রসাধিতমণ্ডলঃ॥

ভাবিয়াছিলেন রাজা তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তির বন্ধু হইবেন, তাঁহার অসাধারণ গুণের বিশেষজ্ঞ বুঝিবেন, কিন্তু সে আশা ফলিল না। তখন তিনি যে মহাবীর ধর্ম্মপাল তাঁহার জন্মভূমিকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—তাঁহারই হস্তে আপনার কাব্য উপহার দিবার জন্য গৌড়দেশে আগমন করিলেন। তথায় ধর্ম্মপালের মহাসামন্তাধিপতির সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। উক্ত মহাসামন্তাধিপতির নাম নারায়ণ বর্ম্মা। তাঁহারই সুপারিশে ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণকে চারিখানি গ্রাম দিয়াছিলেন ইহা আমাদের তাম্রশাসনে প্রকাশ।

বেণীসংহারের অভিনয়ে যথায় যুধিষ্ঠির দূত শ্রীকৃষ্ণের মুখে দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন, তথায় এই কবিতা দেখা যায়—

ইন্দ্রপ্রস্থং বৃকপ্রস্থং জয়ন্তং বারণাবতম্।
দেহি মে চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমং কপিলেবতু॥

ভিনয়ে "দেহি মে চতুরো গ্রামান্" এই কথা শুনিয়াই রারণ বর্ম্মা ধর্ম্মপালের পুত্র যুবরাজ ত্রিভুবন পালকে দূতস্বরূপ ঠাইয়া কবিকে চারিখানি গ্রাম দিতে অনুরোধ করেন বিবেচনা ।। ধর্ম্মপালও তদনুসারে কবিকে চারিখানি গ্রাম প্রদান করেন। ং পঞ্চম আর একখানি গ্রাম কবির পুত্র আদিগাঞী ওঝাকে ন করেন। এই অতি বিচিত্র কথা অভিনব তাম্রশাসনে প্রকাত হইতেছে।

আর এক আশ্চর্য্য। পূর্ব্বে যে

সতত সুকৃতী ভূয়াদ্ ভূপঃ প্রসাধিতমণ্ডলঃ।

কাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, বেণীসংহারের পাশ্চাত্য হস্তলিপি সফল খানেই শেষ। কিন্তু বঙ্গদেশীয় হস্তলিপিতে আর এক নূতন শ্লোক দেখিতে পাই তাহা এই—

অবনিনবনিপালাঃ পান্তু বৃষ্টিং বিধত্তাং
জগতি জলধরালী শস্যপূর্ণাশু ভূমিঃ।
ত্বয়ি মুদনয়কারো ভক্তিবৈতন্তযোগাদ্
ভবতু সম মুদীর্ণং হব্যমস্তু দেবাঃ॥

আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কবি বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ধর্ম্মপালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এই শ্লোক রচনা করেন। "অবনিনবনিপালাঃপান্তু"—ইহার অর্থ এই যে পালবংশীয় রাজারা পৃথিবী পালন করিতে থাকুন। নতুবা, অবনিকে অবনিপালেরা পালন করুন বলিলে—এবং অবনিপাল অর্থে সামান্যতঃ রাজা বুঝিলে অতি অকিঞ্চিৎকর অর্থ পাওয়া যায়। পালবংশীয় রাজারা অবনিপাল বংশ, ভূপাল বংশ, ক্ষমাপাল বংশ ইত্যাদি নামে

তৎকালে কীর্ত্তিত হইতেন। তজ্জন্য তাঁহাদের আদিপুরুষ গোপাল কোনও কোনও লেখক কর্ত্তৃক "ভূপাল" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আমাদের তাম্রশাসনেই ধর্ম্মপালের প্রপিতামহ দয়িতবিষ্ণু "প্রকৃতি রবনিপালাং" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই অবনিপাল পাল বংশেরই সমাখ্যা। ভট্টনারায়ণের "অবনিমবনিপালপাস্ত" শব্দে তজ্জন্য পালবংশীয় রাজাদেরই বিশেষ উল্লেখ আছে বুঝিতে হইবে।

অতএব সমুদায় প্রমাণ ঐক্য করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টই তাম্রশাসনের নারায়ণ ভট্টারক বেণীসংহারের ভট্টনারায়ণের সহিত অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ধনঞ্জয়ের রচিত দশরূপকে ধনিকের রচিত অবলোক নাম বৃত্তিতে বেণীসংহার হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ডাক্তার হল সাহেব বিবেচনা করেন এই বৃত্তি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর রচনা। তাহা হইলে বেণীসংহার তৎপূর্ব্বের রচনা হয়। আমরা দেখিতেছি ভট্টনারায়ণ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি এবং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা হল সাহেবের মতের সহিত সুসঙ্গত হইতেছে।

মিশ্রমিল অলঙ্কারযুক্ত সুরের স্বরলিপি।

কতকগুলি পৃথক্-ধ্বনিত সাঙ্গীতিক স্বরের সুবিন্যস্ত পরম্পরানুভূতিকে সুর বা রাগরাগিণী বলে। এই সকল সরল সুর-বিন্যাসই

আমাদের দেশে প্রচলিত, মিশ্রমিল-যুক্ত স্বর-বিন্যাসের ব্যবহার নাই।

একই সময়ের মধ্যে এক সঙ্গে ধ্বনিত তিনটি বা ততোধিক পরস্পর-মিলাত্মক স্বরাবলীকে মিশ্রমিল কহে। ইহার ইংরাজি নাম "কর্ড"। পিয়ানো কিম্বা হার্মোনিয়ম বাজাইতে হইলে এই মিশ্রমিলের পর্দ্দাগুলি একসঙ্গে টিপিয়া ধরিতে হয়। এইরূপ মিশ্রমিলযুক্ত সুর দুই হাতে একসঙ্গে বাজাইতে হয়—উচ্চসুরগুলি বাম হস্তে ও খাদসুরগুলি বাম হস্তে। এই মিশ্রমিলগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও সংযোগকে মিশ্রমিল-ঐকতানসাধন কহে। ইহার ইংরাজি নাম "হার্মনি"। আমাদের দেশে মিশ্রমিল ঐকতান মূলেই ছিল না একথা বলা যায় না। সেতারের "ছেড়" সাধনে তম্বুরার চারিটি ভিন্ন সুরের তার হইতে সুর ধ্বনিত হইয়া ঐকতান নিঃসারিত হয়, তাহা ইংরাজী "হার্মনির" কতকটা অনুরূপ। তবে আমাদের মিশ্রমিল সাধনের আর উন্নতি হয় নাই—সেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। আর য়ুরোপীয়েরা মিশ্রমিলের প্রকৃতি, ভেদাভেদ ও প্রয়োগ-নিয়ম তন্নতন্নরূপে নির্ণয় করিয়া উহাকে বিজ্ঞানের সামিল করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে, আমাদের কৃতবিদ্য সঙ্গীতবেত্তাগণ যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তবে আমাদের একটি বিশেষ অভাব দূর হইতে পারে। অবশ্য, এ কাজটি বড় সোজা নহে। ইচ্ছা করিলে একদিনের মধ্যেই যে আমরা কৃতকার্য্য হইব, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে, এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য থাকা চাই—চেষ্টা থাকা চাই। কেহ কেহ আপত্তি করেন, মিশ্রমিল আমাদের সঙ্গীতের অনুপযোগী, উহার দ্বারা আমাদের রাগরাগিণীর রূপ রক্ষা করা কঠিন। অলঙ্কারের অতিপ্রাচুর্য্যে রূপের স্ফূর্ত্তিহানি হয় বটে, কিন্তু যথাযোগ্যরূপে স্বল্প

অলঙ্কার প্রয়োগ করিলে কি তাহাতে রূপ আরও ফুটিয়া উঠে না আমাদের সঙ্গীতে মিশ্রমিল অলঙ্কারের প্রয়োগ সম্বন্ধেও এইক বলা যাইতে পারে।

আমার মতে, সঙ্গীতের দুইটি বিভাগ স্বতন্ত্র রাখিয়া সঙ্গীত আ শীলন করা ভাল। রাগরাগিণীর রূপ রক্ষা করিয়া আমাদের দে পদ্ধতি অনুসারে একদিকে সঙ্গীত আলোচনা কর; অপর দি কতকগুলি সুরে মিশ্রমিল প্রবর্ত্তিত করিয়া সঙ্গীতের বিচিত্রতা ব কর। এ কথা কে না স্বীকার করিবে, সাঙ্গীতিক সৌন্দর্য্যের এ সমুজ্জ্বল দিক্ আমাদের নিকট একেবারেই অন্ধকার। ইংরাজি ব সঙ্গীত সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু ইংরাজি যন্ত্রসঙ্গীতবি বোধ হয় আমাদের সকলেই এক মত। মিশ্রমিলের বিচিত্র প্রয়ে ঐকতান বাদ্যের সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতা যে কত সহস্র পরি বর্দ্ধিত হয়, তাহা কোন ভাল ইংরাজী কন্‌সর্ট শুনিলেই বুঝা য এবং সেই তুলনায় আমাদের দেশীয় কন্‌সার্টের হীনতাও তীব্ররূপে উপলব্ধি হয়। অতএব এবিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশ্রমিলাত্মক সুর প্রকাশ করিবার পক্ষে ইংরাজী সাঙ্কেতিক স্বরলিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। তবে ইংরাজি স্বরলিপিতে গান প্রকাশ করা এ দেশে ব্যয়সাধ্য। এই জন্য, আমাদের প্রচলিত বর্ণাত্মক স্বরলিপিতেই যাহাতে আপাতত এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা চেষ্টা করা মন্দ নহে। আকার-মাত্রিক পদ্ধতি অনুসারে যেরূপ স্বরলিপি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

চিহ্ন ব্যাখ্যা।

১। এই প্রকার স্বরলিপিতে উপরের পংক্তিগুলি ডান হাত দিয়া ও নীচের পংক্তিগুলি বাঁ হাতে বাজাইতে হয়।

২। এক সঙ্গে ধ্বনিত দুইটি স্বরের মিলকে দ্বিমিল এবং তিনটি বা ততোধিক স্বরের মিলকে মিশ্রমিল কহে। এই দ্বিমিল ও মিশ্রমিলের অন্তর্গত স্বরগুলি হাইফেন্‌দ্বারা যুক্ত থাকে। মাত্রাবিশিষ্ট হইলে কেবল শেষ স্বরের গায়ে মাত্রা থাকে—পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের গায়ে কোন মাত্রা থাকে না। যথা স-গ-পা। স-র্সা। এখানে আর দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক। যথা ; স-গমগা। কিম্বা যথা ; গমা। এখানে স কেবল গ-এরই সহিত একসঙ্গে ধ্বনিত হইবে। পরবর্ত্তী স্বরগুলি স্বতন্ত্র বাজিবে।

৩। দুইটি পাশাপাশি দ্বিমিল বা মিশ্রমিলের মধ্যে যখন আশু-বন্ধনী থাকে, তখন তাহার অর্থ এই, ঐ উভয়ের মধ্যে যে স্বরটি সাধারণ সেই স্বরের পর্দ্দা,দুইবার পৃথক্‌রূপে টিপিতে হইবে না, এক টিপেই চলিবে। যথা ;—"গ-র্সা—র্গ-না"। এস্থলে, যে গা ও র্সা এক সঙ্গে টিপিতে হইবে ; তাহার পর 'গ'-র টিপটি না ছাড়িয়া পরবর্ত্তী দ্বিমিল 'গ-না' বাজাইবে। 'গ-না' বাজাইবার সময় সাধারণ স্বর 'গ'-কে পৃথক্ টিপে আর বাজাইতে হইবে না, উহা পূর্ব্ব 'গ'-টিপেরই অনুবৃত্তি মাত্র।

৪। উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন রেফ। এক সপ্তক উচ্চ হইলে একটি রেফ্, দুই সপ্তক উচ্চ হইলে দুইটি রেফ্ ইত্যাদি। যথা র্সা ; র্সা। খাদ সপ্তকের চিহ্ন হসন্ত। এক সপ্তক খাদ হইলে একটি হসন্ত, দুই সপ্তক খাদ হইলে দুইটি হসন্ত ব্যবহৃত হইবে। যথা স্‌া ; স্‌া।

৫। নীচের পংক্তির কোন কোন মিশ্রমিল যদি একরূপ হয় তবে প্রত্যেক বার পুনরাবৃত্তি না করিয়া সেই স্থলে "ঐ" লিখিলেই চলিবে।

স্বরলিপি।

সুর-রচয়িতা।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিশ্রমিল-রচয়িতা।—সিয়োঁর মান্‌জাটে

"পথহারা তুমি পথিক যেন গো"*

৩।৩

।গ-র্সা র্গা -র্না। -না। ম-ধা গ-পা গ-প।
।স্-পা স্-পা — ।। স্-ধা স্-পা —

।ব-ক্কা -র-পা। ক্কা। গা গা গমগ
।স্-ধা ন্-পা ন্-ধা। গ্-পা —। স্-

।রা গা। রা। গা ন্-মা —ন্-
।ন্-প্। —। —। ন্-পা প্-র্-পা —

।স-গা —গ-না —ন্-রা। -। সা না।
।প্-ন্-পা প্-ম্-পা —। স্-গ্-পা —। —।

।সা ধ্-ধা —। -। সা না।
।ধ্-স্-গা ঐ ঐ। ঐ ঐ দ্-স্-মা।

। পা গ-গা -। -। ম-দা গ-পা।
।প্-স্-গা ঐ ঐ। প্-স্-গা প্-ন্। —প্-মা।

।স-গমগা —স-রা —র-না। রা সা ন্-পা।
। প্-পা —। ঐ। স্-গ্-পা —। প্-র্-প্।

---

* এই গানের স্বরলিপি প্রথম বর্ষ প্রথম ভাগ সাধনায় (২১৯পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে।

১ ক-র্গা । । । । । ।
১ স্-গ্-প্যা ঐ ঐ । স্-গ্-প্যা — —॥

১ র্সা ধা র্সা। র্গা র্সা র-র্রা ।
১ ধ্-স্-গ্যা ঐ ঐ। ধ্-স্-গ্যা ঐ দ্-স্-মা ॥

১ গ-র্গা গ-র্গা গ্-র্গা। র্গর্পা র্পর্রা র্সা।
১ প্-স্-গ্যা ঐ ঐ। প্-স্-গ্যা প্-ন্-প্যা ঐ ।

১ র-র্রা গ-র্গা প-র্পা। ধ-র্ধা র্নর্বা ন-র্সা।
১ প্-ন্-ম্যা প্-স্-গ্যা —। প্-ন্-ম্যা —। —। ।

১ র্স-র্সা । । । র্ধ-র্ধা গ-র্গা।
১ স্-গ্যা গ্-গ্যা প্-প্যা। গ্-সা । । ।

১ প-র্গা র-র্রা । । স-র্সা ন-র্রা ।
১ প্-স্-গ্যা প্-ন্-প্যা ম্যা। প্-স্-ম্যা গ্যা দ্-ন-ম্যা ।

১ প-র্পা গ-র্গা । । র্ম-র্ধা গ-র্পা।
১ প্-স্-গ্যা ঐ। ঐ । প্-স্-গ্যা প্-ন্-প্যা —প-ম্যা ।

১ র্স-র্গর্মর্গা —ন-র্রা ন-র্রা । গ-র্রা —গ-র্পা ন-র্পা ।
১ প্-প্যা —। ঐ । স্-গ্-প্যা —। প্-র-ম্-প্যা।

১ র্স-র্গা । । র্স-র্গা । ।
১ স্-গ্-প্যা ঐ ঐ। স্-গ্-প্যা । । ॥

১ পা পা গ-র্সা। গর্সা —গ-র্সা গ-র্সনা।
১ স্-গ্-প্যা ঐ ঐ । স্-গ্-প্যা ঐ স্-প্-সা।

১ ম-ধা —ন-না —ম-ধা। প্যা প-রা ব-র্রা।
১ স-ম-ধা ঐ ঐ। ম-র-প্যা ন্-রা ন-র্সা।

। র-র্রা র-র্রা র্গর্রা । গ-র্গা র্স-র্মা র্স-র্মা
। প্-ন্-ব-প্া ঐ প্-ন্-মা। স্-গ্া ধ্-স্-মা দ্-স্-ম

। র্স-র্গা —র্গ-র্না —ন-র্রা। র্সা -। -।
।প্-স্-প্া প্-ম্-প্া —। । স্-গ্-প্া —। —

। র্সা র্স-র্র-র্গা র্রা । র্সা না র্সা
।স্-গ্-প্া ঐ ন্-ম্-প্া। স্-গ্-প্া ব্-গ্-দ্া স্-গ্-

। না নর্সর্বা র্সা। না ধপা প
।ব্-প্-না ঐ র্-ক্-ধ্া। র্-প্-না র্-ক্-সা প্-

। ক্ষা ক্ষপধা ধা। প্া ক্ষা পঃ
।র্-ক্-ধ্া ঐ ঐ। প্-না প্-ধ্-না ঃ

।গমগা রা র্। -। পা
।গ্-প্া প্-ন্-প্া। ঐ। র্-না র্-ধ্া -।

। পা র্-না র্-না। র-ধা পক্ষা —পক্ষা।
। প্-না —। —।। র্-ক্-ধ্া ক্-ধ্-না ঐ।

।গমগা রা -। -। সা সা।
।গ্-প্-না ন্-প্া প্-ন্-প্া। প্-ন্-মা স্-গ্া —।

। সা ধ্-ধা -। -। স-র্সা র্-র্রা।
।স্-গ্া ধ্-স্-গ্া ঐ। ধ্-স্-গ্া ঐ দ্-ন্-গ্া।

। প-র্পা গ-র্গা -। -। ধ-র্ধা প-র্পা।
।প্-স্-গ্া ঐ ঐ। প্-স্-গ্া ধ্-ন্-গ্া ঐ।

। র্গর্মর্গা র্-র্রা -। । -। স-র্সা প-র্পা।
। ধ্-ন্-প্া র্-ম্া ম-। -মা। প -ন-মা স-গা প -ন-পা।

। র্স-র্গা -। -। । র্স-র্গা -। -। ॥ ॥
। স্। গ্-গ্। প্-প্। । গ্-গ্-প্। -। -। ॥ ॥

পত্র।

শ্রীযুক্ত "সাধনা" সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নয় নিবেদন এই—

জ্যৈষ্ঠের সাধনায় ঐকতানিক স্বরসংগ্রহের সমালোচনা পাঠ য়া আমার কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

কেহ যেন মনে না করেন, আমি দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির ন দাঁড়াইয়াছি। ও স্বরলিপি দেখিলেই আমার মনে হয়—

অলজ্জটাকলাপস্য ভ্রুকুটীকুটিলং মুখং।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে ধৈর্যং যো ন গতোভয়ং॥

এই প্রসঙ্গে কোন্ স্বরলিপি সুবিধাজনক তাহার প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রচলিত স্বরলিপির দোষ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, তাহা পরিহার করিবার উদ্দেশেই আকারমাত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, দণ্ডমাত্রিকের উপর আকারমাত্রিকের শ্রেষ্ঠতা আপনি কতকটা প্রমাণিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন কিছু কারণ দেখাইতে পারেন নাই যে, নূতন একটা স্বরলিপি উদ্ভাবন করার আবশ্যক ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমি অবশ্য শিক্ষার্থীর দিক চাহিয়াই বলিতেছি। স্বরলিপি দেখিয়া শিক্ষার্থী যখন বাজাইবেন তখন কিরূপ প্রণালীটি হইলে তাহার সুবিধা হয় কেবলমাত্র এই কথারই বিচার হউক।

দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতির আপনি তিনটি দোষ দেখাইয়াছেন। তিনটি দোষের মধ্যে একটিই টনিক সলফা (১) প্রণালীতে নাই। সুতরাং একটি স্বরলিপি আবিষ্কার করার কোন আবশ্যক দেখা যায় না। আকারমাত্রিক পদ্ধতির এমন কোন গুণই দেখি না, যা টনিক সলফাতে নাই, অথচ টনিক সলফার এমন গুণ আছে, যা আকারমাত্রিকে নাই।

প্রথমতঃ, কড়ি কোমলের চিহ্ন টনিক সলফার (২)দুটি, আর

(১) আমাদের বিবেচনায়, টনিক সলফা পদ্ধতিতে একটি দোষ বিলক্ষণ আছে। সে দোষটি না থাকিলে আমরা ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করিতাম। কুলষ্টপ, কমা প্রভৃতি ছোট ছোট বিন্দু ও বিন্দুপ্রায় চিহ্নের দ্বারা মাত্রা প্রকাশ করায়, উহা সহসা চোখ এড়াইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ভগ্নাংশগুলি সহজে চোখে পড়ে না—হিসাব করিয়া মাত্রার ভাগ করিতে হয়। আকারমাত্রিক পদ্ধতির সহিত পাশাপাশি তুলনা করিলে ইহার দোষগুণ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে।

বিন্দুমাত্রিক পদ্ধতি।

। সা. র : গ. ম : প. ধ : ন. ধ : প. ম : গ. র। স, র. গ, ম:
। প, ধ. ন, স :গ, স. প, ধ।

আকারমাত্রিক পদ্ধতি।

। সরা গমা পধা। নধা পমা গরা। সরগমা পধনসা গমপধা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে কোমল কড়ির স্বতন্ত্র স্বরাক্ষর প্রণালীটি ভাহার মর্ম্মান্তিক দোষ নহে—কেননা আবশ্যক হইলে উহাতে স্বতন্ত্র স্বরাক্ষরের নিকটে স্বতন্ত্র চিহ্নেরও ব্যবস্থা আছে, (ভাগ সাধনার ৩য় পৃষ্ঠা দেখ)। তবে আমরা স্বরাক্ষরের মাথায় অতিরিক্ত চিহ্নের বোঝা অনর্থক চাপাইতে নারাজ। কেন না,বাস্তবিক আবশ্যকীয় অন্যান্য আকারিক চিহ্নের জন্য স্থান রাখা দরকার। এপর্য্যন্ত কোন শিক্ষার্থীর নিকট শুনিয়া শুনি নাই, যে, কড়ি কোমলের স্বতন্ত্র স্বরাক্ষর মনে রাখা কঠিন। মনে রাখিবার যে যুক্তিসূত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্মরণের একটা সাহায্য হয় এই মাত্র। আবশ্যক হইলে আমরা কড়ি কোমলের স্বতন্ত্র চিহ্নও ব্যবহার করিব। কোমলের চিহ্ন ও 'ি' কড়ির চিহ্ন। কড়ি কোমলের স্বরাক্ষরে আমাদের এই চিহ্ন প্রয়োগ করিলে অতি কোমল কড়ি প্রকাশ হয়। সাধনা.

ত্রিশে পাঁচটি। অথচ চিহ্নের বাহুল্য যে একটা দোষ তাহা আমিও বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া অক্ষরের উচ্চারণের তারতম্যের বচনাটাকে আনিয়া কড়ি কোমলের ভিতরে ঢুকাইয়া শিক্ষার্থী বোর বোঝের উপরে বিস্ফোটকের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। 'ধ'-কোমল দ; বুঝি কারণ, ধ মহাপ্রাণ, দ অল্পপ্রাণ। ক্ষটাকে ব মহাপ্রাণ বলা যায় না, কারণ 'হ'টি আগে। যাহা হউক গুরুতর বটে। কিন্তু 'গ'-এর চেয়ে ক্ষ-টাকেই আমার গুরু-গিরি বোধ হয়। আমি ভূত পেত্নী মানি না (অন্ততঃ মুখে তথাপি 'ন'র চাইতে 'ঞ'টা আমার কাছে কেমন ক্যেমন ! সকলের বোধশক্তি সমান প্রখর নহে, কিন্তু নিয়মটা এমন সকলেই বুঝে। তাই বলিতেছিলাম, আকারমাত্রিকের কোমলের কায়দাটা সুবিধাজনক হয় নাই। তবে যদি ইয়াদ ই লইতে হয়, তাহা হইলে দুটি চিহ্নের অধিক না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কড়ি ধ আর কোমল নি এক সুর নহে; সুতরাং কেবল কোমল 'নি'র একটি চিহ্নের দ্বারা সঙ্গীতের সকল কাজ বিশুদ্ধরূপে চলিবে বলিয়া বোধ হয় না। আপাততঃ একরকম চলিবে বটে, কিন্তু তেমন ভাল কান হইলে বেসুরা বোধ হইবে। যদি সমজদার লোক-দিগকে ত্যাগ করিয়া স্বরলিপি করিতে চাহেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। বলিতে পারেন যে, হিন্দু সঙ্গীতে এ সকল নাই। কিন্তু হিন্দু ওস্তাদগণ অতি কড়ি কোমল ব্যবহার করেন। আপনি নাট্য সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সঙ্গীতের প্রচার দেশে যতই বাড়িবে, ততই ষড়্জ সংক্রমণ ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রয়োজন হইবে। তখনকার সঙ্গীত বিশুদ্ধরূপে লিখিতে হইলে আমার বোধ হয় সকল প্রকার কড়িকোমল সুরেরই প্রয়োজন হইবে। আমার কথাগুলি যেন কতকটা বক্তৃতার ন্যায় শুনাইতেছে, কারণ, কাজের বেলায়

আমাদের ইহার চেয়ে অনেকটা মোটামুটি হিসাবেই চলিয়া যা আসল কথা, সঙ্গীতে যাহা হইতে পারে তাহার উপযোগী কি স্বরলিপির প্রণালী স্থির করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যাহা অ তাহার অবস্থা ততটা উন্নত না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ত ব্যর্থ উন্নতির আশা কেন ত্যাগ করি।

দ্বিতীয়তঃ চিহ্নের বাহুল্য সম্বন্ধে যদি প্রণালীতে দোষ থ তবে তাহাতে অসুবিধা হইতে পারে; কিন্তু চিহ্ন যদি অল্প হ তবে তাহাতে কাজ একেবারেই আট্‌কাইতে পারে। আশ বিষয় এই যে, আপনি দণ্ডমাত্রিক এবং আকারমাত্রিক প্রণ তুলনা করিতে যাইয়া যে সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা হ আমার কথা প্রমাণিত হইতেছে। দেখুন—

।	।	ঁ	×	×	।		ঁ	×	×	।
স	।	গ	ঋ	গ	গ	এস্থলে	গ	ঋ	গ	গ
সা	।	ধে	—	র	ত					

এই চারি সুরের স্থায়িত্ব পরিষ্কার বুঝা যায়। কিন্তু

স	।	গ-	গরগা	গ
সা	।	ধে-	—র	ত

এ স্থলে 'গরগা' এই একমাত্রাভুক্ত তিনটি সুরের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যদি কোন অর্থ হয় তবে তাহা এই, যে, উহাদের প্রত্যেকটি মাত্রার তৃতীয়াংশ কাল স্থায়ী। সুতরাং এস্থলে বিশুদ্ধ স্বরলিপি হইয়াছে, কি করিয়া বলি? যে স্বরলিপি বিশুদ্ধ নহে, অন্য সহস্র গুণ থাকিলেও (৩) তাহা অগ্রাহ্য।

(৩) দ্রুত তালের লয়ে, যে স্থলে তিনটি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ-মাত্রাবিশিষ্ট সুর একমাত্রার অন্তর্ভুক্ত, সে স্থলে তাহার ভগ্নাংশগুলি পৃথক্‌রূপে ও স্পষ্টরূপে কার্য্যতঃ ধরা যায় না। এক মাত্রার মধ্যে ঐ তিনটি সুর উচ্চারণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। ইহাতে গানের বিশুদ্ধতার কোন হানি হয় না। সুতরাং এই স্থলে মাত্রার সূক্ষ্ম ভাগ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বরং উহাতে শিক্ষার্থীর একটু ধাঁধা লাগিতে পারে। স্থলবিশেষে সূক্ষ্ম ভাগ প্রদর্শন করা আবশ্যক বটে। এ স্থলে আবশ্যক হইলে, আমরা "গরগা" এই-রূপ না লিখিয়া, "গঃ-রগঃ" এইরূপ লিখিতাম। আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে

তৃতীয়তঃ তালের ভাগ এবং মাত্রা প্রয়োগের স্থল সহজ-বাধ্য হওয়া। অধিকাংশ স্থলেই শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র মোটা-মুটি মাত্রাগুলি নয়, আধ মাত্রা সিকিমাত্রা পর্য্যন্ত, মাত্রা প্রয়োগ করিয়া আদায় করিতে হয়। আবার বলিয়াছেন যে, আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক তাল-বিভাগের অন্তর্গত মাত্রাগুলি একদৃষ্টিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বলিয়াছেন যে, এটি আকার-মাত্রিক পদ্ধতির একটি বিশেষ গুণ। টনিক সল্‌ফায় মাত্রার প্রত্যেকটী চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত আবশ্যক হইলে ঐরূপ পরিষ্কার করিয়া দেখান যায়। মাত্রার প্রথম চতুর্থাংশ কোন্‌টী, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ কোন্‌টী, তৃতীয় কোন্‌টী, শেষ কোন্‌টী, তাহা পর্য্যন্ত চোখেই চক্ষে পড়ে।

আশেষ চিহ্নস্বরূপ নীচে কসি না টানিয়া অক্ষরের মধ্যে যেন-চিহ্ন ব্যবহার করিলে কি বাস্তবিকই পরিষ্কার দেখায়? (৪)

অতিক্ষুদ্র মাত্রাও আবশ্যক হইলে প্রকাশ করা যায়। তাহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। (১ভাগ সাধনা ৩৯পৃষ্ঠা দেখ)

তবে, পরিবর্ত্ত-পক্ষে আমরা মাত্রার ভগ্নাংশগুলি বিশ্লিষ্টভাবে না দেখাইয়া, একমাত্রার মধ্যে ভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করি। সংশ্লিষ্ট-ভাবে দেখাইলে ভগ্নাংশের স্থায়িত্ব কাল একেবারেই মনে ধারণা হয়। ভাগা-ভাগি করিয়া হিসাব করিতে হয় না। এই জন্য, শিক্ষা ও সাধনার পক্ষে আকারমাত্রিক পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। শ্রীজ্যোঃ—

(৪) আশেষ চিহ্নস্বরূপ ছোট ছোট কসি স্বরাক্ষরের মধ্যে বসাইলে, পর-স্পরের মধ্যে একটা যোগের ভাব—একটা অনুভূতির ভাব সহজে মনে আইসে। কেন না, সাহিত্যের চিহ্নপদ্ধতিতে, হাইফেন্‌ই যোগের চিহ্ন।

"গা—গরগা" এই স্বরলিপিটুকুতে স্বরাক্ষরগুলির সাইত নীচের গানের অক্ষর মে—— ব

মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় "গা"-এর টানটি কতদূর পর্য্যন্ত চলিবে। "গরগা"-র মধ্যে যে স্বরাক্ষরটি পৃথক্ রূপে উচ্চারিত হইবে তাহার ঠিক নীচে গানের একটি অক্ষর আছে। ইহা তো সহজেই বুঝা যায়। শ্রীজ্যোঃ—

আপনার প্রদত্ত দৃষ্টান্তের "গা—গরগা" এই স্থলে আশটি পরিষ্কার হয় নাই। কারণ, ঐ হাইফেন দ্বারা প্রথম গা দুটিই আশভুক্ত হইতেছে, কিন্তু পরের 'রগা' এই সুর দুটিও যে আশভুক্ত তাহা বুঝা যায় না। যদি উহাদের জন্যও হাইফেন ব্যবহার করা যায় (যথা গা—গ-র-গা) তবে বিষয়টা দেখিতে খুব পরিষ্কার হয় কি না প্রশ্নের বিষয়। একটি লাইনের জায়গায় তিনটি লাইন টানিতে হয়। তাহার উপর আবার মাত্রার বিভাগ ঝাপসা হইয়া আসে।

"এক মাত্রা কালের মধ্যে দুটি সুর উচ্চারণ করিতে হইলে ..... আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে দুটি স্বরাক্ষর যুক্ত করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে একটি আকার বসাইলেই যথেষ্ট হয়।" এ কথা বলিয়া আপনি প্রশ্ন করিতেছেন, "তবে এত বাহুল্য আড়ম্বরের প্রয়োজনটা কি?"

ঐরূপে এক মাত্রার অন্তর্গত সুরগুলিকে যুক্ত করা হইলে আকারটি বসাইবার আর প্রয়োজনই হয় না। যথা—

স	গ	গগরগ	গ
সা	ধে	---র	ত

ইত্যাদি | সুতরাং ঐ আকারটিও এই হিসাবে (৫) বাহুল্যের ভিতরেই দাঁড়ায়। ঐরূপ করিয়া সাজাইলে দণ্ডমাত্রিকেরও প্রত্যেকটি মাত্রা স্পষ্টরূপে চক্ষে পড়িবে। দেখুন—

।	।	৺ × ×	।
সা	গ	গঋগ	গ
না	ধে	---র	ত

ইত্যাদি | একটি চিহ্ন বেশী দিলে যদি শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝিবার আর একটু সুবিধা হয়, তবে সেই

(৫) আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে আকার বাহুল্য নহে। এক মাত্রাই হ'চ্চে আদর্শ-মাত্রা। সুতরাং প্রত্যেক এক মাত্রার আকার থাকাতে স্পষ্ট হয়—কোন ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীজ্যোঃ—

চিহ্নটি দেওয়াই শ্রেয়ঃ। যে স্থানে চিহ্নও একটা বেশী, অথচ লিখিবার অধিক কিছু সুবিধা হইল না; সেখানেই বলি, (৬) দোষ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আপনারা যাহা প্রচার করিতে যাইতেছেন তাহা টনিক্ সলকার চেয়ে সর্ব্বাংশেই (৭) নিকৃষ্ট পদ্ধতি। তবে এ হেন টনিক সল্‌ফা থাকিতে কেন আবার নূতন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন? আপনাদিগকে এই কথাটি বিশেষ করিয়া বলাই আমার এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য। কারণ, দেশীয় পুস্তকব্যবসায়িগণ প্রায়ই দরিদ্র। বই বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহা তাঁহাদের ছাপাইবারই সাহস হয় না। প্রচলিত বর্ণলিপি অধিকাংশ শিক্ষার্থীই চাহে, সুতরাং তাহাকে ছাড়িয়া পুস্তক বিক্রয়ের পথে কণ্টক দেওয়া কি দরিদ্রের কাজ? আপনাদের ন্যায় যাঁহাদের ভিতরে বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, নেতৃত্ব এবং দেশানুরাগ একাধারে আছে, প্রচলিত দূষিত স্বরলিপির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদেরই এ কার্য্য কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

---

(৬) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাত্রার সূক্ষ্ম অংশ দেখাইবার জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীজ্যোঃ—

(৭) টনিক সলফার কি অসুবিধা পূর্ব্বেই প্রদর্শন হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট পদ্ধতি পাঠক বিচার করিবেন। যাহা হউক, উপেন্দ্র বাবু এই প্রতিবাদটি পাঠাইয়া ভাল করিয়াছেন। এই সূত্রে, বিবিধ স্বরলিপির দোষগুণ আলোচিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে নির্ব্বাচনের সুবিধা হইবে। শ্রীজ্যোঃ—

বিহারীলাল।

বর্ত্তমান নববর্ষের প্রারম্ভেই কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের হাস প্রবেশ করিয়াছে তাহার নিষ্ঠুর শরসন্ধানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল।

তন্মধ্যে বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত নির্জ্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতি প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্ত্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহার নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।

বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবার বহুপূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক পত্র বাহির হইত। তখন বর্ত্তমান লেখক বালকবর্গসপ্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে যখন বোধোদয় হইল তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থাদি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি,— অবোধবন্ধুর বন্ধুত্বপ্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুষ্কর্ম্মের জন্য কোনরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে

কু বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা এখনো ত হই নাই।

এখনো মনে আছে ইস্কুল ফাঁকি দিয়া একটি দক্ষিণদ্বারী ঘরে র্ঘি নির্জ্জন মধ্যাহ্নে অবোধবন্ধু হইতে পৌল্‌বর্জ্জিনীর বাঙ্গলা বাদ পাঠ করিতে করিতে প্রবল বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া ত। তখন কলিকাতার বহির্বর্ত্তী প্রকৃতি আমার নিকট অপরি- ছিল—এবং পৌল-বর্জ্জিনীতে সমুদ্রতটের অরণ্যদৃশ্যবর্ণনা আমার ; অনির্ব্বচনীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত, এবং সেই ঘাতশব্দনিত বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ সমুদ্রবেলায় পৌল-বর্জ্জিনীর মিলন ঃচ্ছিদ্যবেদনা হৃদয়ের মধ্যে যেন মূর্চ্ছনা সহকারে অপূর্ব্ব তব মত বাজিয়া উঠিত।

ই ক্ষুদ্র পত্রে যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাঙ্গলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিক পত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন—এই জন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এই জন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাঙ্গলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করি- বেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গ- দর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র

কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল এক ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই ও বাঙ্গলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগৎ মূর্ত্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া ওঠে—সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যূষকিরণে মূর্ত্তির বিকাশ হইতে লা। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া গে

"সদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারিদিকে ঝালাফালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে মাইকেলের চতুর্দ্দশপদীতে কবির আত্ম-নিবেদন কখন কখন প্রকাশ পাইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দ্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশ-

অথবা সভাবনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই ভাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের স আকর্ষণ করিয়া আনিল।

পাঠকদিগকে এইরূপে বিশ্রব্ধভাবে আপনার নিকটে টানিয়া নিবার ভাব প্রথম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি রীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পৌলবর্জ্জিনীতে যেমন রর এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম বিহারী-র কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সঙ্গীত মনশ্চক্ষের সমক্ষে চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত।

"কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার;—
গিয়ে তার তীরতরুতলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শবসম রব স্থির
কান দিয়ে জলকলকলে।
যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে কোটরে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন;—

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গল্প জড়াইয়ে,
মৃত্যুকালে মিত্র এলে
লোকে যেমি চক্ষু মেলে,
তেমিতর থাকিব চাহিয়ে।"

কবি যে মন "হুহু" করার কথা লিখিয়াছেন তাহা কি প্রকৃত বলিতে পারি না কিন্তু এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জ্জগতের একটি বালক পাঠকের মন হুহু করিবা উঠিত। ঝরণার ধারে শীকরসিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনঘাসের মধ্যে দেহ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে জলকলধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটি আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইত; এবং যদিও জানে জানি কুরঙ্গিণীগণ কবির দুঃখেও অশ্রুপাত করিতে আসে না এবং মতে কবির আলিঙ্গনে ধরা দিতে চাহে না তথাপি এই নির্জ্জন ঘনশষ্পতটে মানবের বাহুপাশবদ্ধ মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর দৃশ্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে সম্ভববৎ চিত্রিত হইয়া উঠিত।

"কভু ভারি পল্লীগ্রামে যাই,
নামধাম সকল লুকাই;
চাষীদের মাজে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ ঝর্,
চারিদিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম:
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী ;
খাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদপ্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে সর্ব্বরী।
বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙ্গে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;
সে নিশায় আমি ক্ষেত্রতীরে,
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব গিহিরে।"

কলিকাতার ছেলে পল্লিগ্রামের এই সুখময় চিত্রে যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় অসন্তোষ মানবপ্রকৃতির সহজাত। অট্টালিকার অপেক্ষা নড়বোড়ে পাতার কুটীরে যে সুখের অংশ অধিক আছে অট্টালিকাবাসী বালকের মনে এ মায়া কে জন্মাইয়া দিল? আদিম মানবপ্রকৃতি। কবি নহে। কবিকে যিনি ভুলাইয়াছেন সেই মহামায়া। কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হোক্ তাহাতে কার্য্য এবং কাব্য উভয়েরই

ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্ত্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এই জন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাকশক্তির বিকারবশতঃ নহে। কৃষক কবি যখন কবিতা রচনা করে তখন সে মাঠের শোভা কুটীরের সুখ বর্ণনা করে না—নগরের বিস্ময়জনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে—তখন সে গাহিয়া ওঠে—

"কি কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি!
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি—গজনি!"

কলের বাঁশি যাহারা শুনিতেছে মাঠের "বাশের বাঁশরী" শুনি তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া গা কলের বাঁশি শুনিলে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। জন্য সহরের কবিও সুখের কথা বলে না, মাঠের কবিও আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য গানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

সুখ চিরকালই দূরবর্ত্তী, এই জন্য কবি যখন গাহিলেন—"গর্ব্ব-দাই হুহু করে মন" তখন বালকের অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল। কবি যখন বলিলেন—

"কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।
গর্ব্বভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায়;

বৃক্ষলতা অগণন
ঘেরে করে আছে ঘন,
উপরে বিষাদবায়ু বয়।
প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণপ্রাণী জলে স্থলে মরে;
তথায় শ্বাপদদল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লি সব ঝিঁঝি রব করে।
তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষজন্তুকে যত ডরি।"

তখন এই চিত্রে ভয়ের উদয় না হইয়া বাসনার উদ্রেক হইল। যে ছেলে ঘরের বাহিরে একটি দিন যাপন করিতে কাতর হয়, ঝিল্লিরবাকুল বিষাদবায়ুবীজিত ঘন অরণ্যবেষ্টিত ভীষণ ভগ্নাবশেষ কেন যে তাহার নিকটে রিপ্সেবরূপে প্রার্থনীয় বোধ হইল বলা কঠিন। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। এক জন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর এক জন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী, আর একজন

খাঁচার পাখী। এই বনের পাখীটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুল এবং অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সিন্ধ্‌বাদ্ নাবিকের অপরূপ ভ্রমণ এবং রবিন্সন্‌ক্রুসোর নির্জ্জন দ্বীপপ্রবাস মনের মধ্যে যে এক তৃষাতুর ভাবের উদ্রেক করিয়া দিত, অবোধবন্ধুর প্রথম কবিতাটি সেই ভাবকেই সংক্ষেপে সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছিল। যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বলে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন-কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসঙ্ঘ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।
সম্মুখেতে অসীম অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার;
উত্তাল তরঙ্গ সব
ফেনপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।
মহাবেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধুসঙ্গে করে রণ;
উভে উভ প্রতিঘাত,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন।

সেই মহা রণ-রঙ্গস্থলে
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে
কান বেস ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে শুনিগে সে সকলে।
যে সময় পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন করে' খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;
নিবেদিব তাঁহাদের কাছে
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, না কি মিত্রবরে
দুখের যে অংশী করে
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।"

এই বর্ণনাগুলি কতবার পাঠ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, এবং এই সকল শ্লোকের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্ব্বত অরণ্যের আহ্বান বালক পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাময়িক অন্য কবির রচনাতেও প্রকৃতিবর্ণনা আছে কিন্তু তাহা প্রথাসঙ্গত বর্ণনা মাত্র; তাহা কেবল কবির কর্ত্তব্যপালন। তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠি নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎ পরিমাণে অবহেলা আছে। বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর ছন্দের

মিলটা তাহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবল মাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে "হয়েছে" "করেছে" "ভুলেছে" প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর আর এক অভাবিতপূর্ব্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের ঐক্যটা আরও যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির ক্ষমতা ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ই করা যাইতে পারে—সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূ বিস্ময় উৎপাদন করে না, এই জন্য তাহা বিরক্তি-জন ও "একঘেয়ে" হইয়া ওঠে। বিহারীলালের ছন্দে মি এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মত স সঙ্গীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থ সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হই-য়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত; অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হই-য়াছে।

কিন্তু উপরে যে ছন্দের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে বঙ্গসুন্দরীতে সেই ছন্দই প্রধান নহে। প্রথম উপহারটি ব্যতীত বঙ্গসুন্দরীর অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্য্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা—

"সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা-কুসুম ভরে;

চাঁচর চিকুর নীবদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।"

এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে—ইহাতে তালে তালে নূপুর ত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, তে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে খকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের গুলিকে কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমাইবার াশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরকে একমাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া বারে এক-নিঃশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টা-দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

"হে সারদে দাও দেখা!
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কাণে,
বেদনা দিওনা প্রাণে, ব্যথার সময়!"

ইহার মধ্যে একটিও যুক্ত অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর।

"পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা
একটাকে যখন যেন দেখিছে তাহারে!"

এই দুটি শ্লোকই কবির রচিত সারদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত এক্ষণে বঙ্গসুন্দরী হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক।

"একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে;
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।"

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে।

"অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণা তান;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।"

"অপ্সরী কিন্নরী" যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দঃভঙ্গ করিয়াছে; কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাঙ্গলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য, যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাঙ্গলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ হ্রস্ব নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্ব এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ়

ভাবটি অবগত ছিলেন সেই জন্য তাঁহার অনিত্রাক্ষরে এমন গতিপূর্ণ ধ্বনি এবং ভরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আদ্যোপান্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গল সঙ্গীত যখন প্রথম ছিল হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্ত্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সঙ্গীতে সৌন্দর্য্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্গসুন্দরীর সুন্দর অলিতা অনুকরণ করা সহজ, এবং সেই সহজ মিষ্টতা সকলের অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য্য অনুকরণসাধ্য নহে। এইজন্য যখন প্রবন্ধলেখক যখন বাল্যাবধি বিহারীলালের কাব্যসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সে তখন বঙ্গসুন্দরীর সহজ ছন্দটুকুই রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, সারদামঙ্গল তাহার আয়ত্তের অতীত ছিল।

সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষার ভাবে এবং সঙ্গীতে নিবিড়তায় মুগ্ধ হইলাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম্ম পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্ত্তন করে। সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপের আভাস দেয় কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

এই জন্য সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা বাহ্যিক লোকের নিকট

ভালরূপে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইত। যে বলিত আমি বুঝিলাম না আমাকে বুঝাইয়া দাও তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

কবি যাহা দিতেছেন তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠকের প্রস্তুত হওয়া উচিত; পাঠক যাহা চান তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়। তাহার ফল হয়, যাহা চাই তাহা পাইনা এবং কবি যাহা দিতেছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সারদামঙ্গল কবি যাহা গাহিতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচনার আইনের মধ্য হইতে তাহাকে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্রকাব্য নহে, তাহাকে কতগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিস্বরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণতঃ পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরাজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form".

যাঁহাকে বলিয়াছেন—

"Thou messenger of sympathies,
That wax and wane in lovers' eyes."—

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।

সারদামঙ্গলের আরম্ভের চারিশ্লোকে কবি সেই সারদাদেবীকে স্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে, বাল্মীকির তপোবনে ই করুণারূপিনী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল, কবি তাহা না করিতেছেন। পাঠকের নেত্রসম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল ল তপোবনে অন্ধকার রাত্রি।

"নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।

এমন সময়ে উষার উদয় হইল।—

হিমাদ্রিশিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য-তপোবনে!
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুখের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারী রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে

হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে
হাসিল মানসসরে কমল কানন।

তপোবনে একদিকে যেমন তিমির রাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ সূর্য্যের অভ্যুদয় হইল তেমনি অপরদিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণারস কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

"অম্বরে অরুণোদয়,
তলে তলে ছুলে বয়
তমসা তটিনীরাণী কুলুকুলু স্বনে;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।
শাখিশাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।
ক্রৌঞ্চী প্রিয়সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণহৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়,

সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবি-ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল পাণ্ডিমায়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি ফলে!
কিরণমণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।
কবে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝলমলে কানন;
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল্ চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।

করুণ ক্রন্দন রোল
উত্ত উত্ত উতোরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে,

হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্নপাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে।
একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী ;
কাতরা করুণাভরে,
গান্ সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।
সে শোক-সংগীত কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি
গদ্‌গদ আদি-কবি
অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া ধায়।"

সারদা দেবীর এই এক করুণামূর্ত্তি। তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে। সে কবিতায় সারদা দেবী ব্রহ্মার মানসসরোবরে সুবর্ণপদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদা দেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি।

"ব্রহ্মার মানসসরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,

পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।
কোটি শশি উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদর অম্বরে।"

এই সারদা দেবীর, এই Spirit of Beautyর নব-অভ্যুদিত কণা-বালিকামূর্ত্তি এবং সর্ব্বত্রব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্ত্তির বর্ণনা প্রাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন—

"তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি;
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে;
গিরিমালা কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।

যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মনপ্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি;
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।"

এই মানসীরূপিনী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তাহার পর সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনও অভিমান, কখনও বিরহ, কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা, কখনও ভর্ৎসনা কখনও স্তব। দেবী কবির প্রাণবিনীরূপে উদয় হইয়া বিচিত্র সুখদুঃখশতধারে সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন—কখনো তাঁহার অভয়রূপ কখনো তাঁহার সংহারমূর্ত্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দময়ী।

কবি বিবাদিনীকে বলিতেছেন—

"অয়ি, একি, কেন কেন,
বিষণ্ণ হইলে হেন!
আনত আননশশি, আনত নয়ন,
অধরে মধুরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থরথর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন।
তেমন অরুণ-রেখা
কেন কুহেলিকা-ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেনগো মলিন!
বল বল চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-বিহীন!
বুঝিলাম অনুমানে,
করুণাকটাক্ষদানে
চাবে না আমার পানে, কবে নাও কথা;

কেন যে কবে না হায়
হৃদয় জানিতে চায়,
মরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা!
যদি মর্ম্মব্যথা নয়,
কেন অশ্রুধারা বয়!
দেববালা ছলাকলা জানেনা কখন;
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন।
অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী!
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি!
স্বরগ-কুসুমমালা,
নরকজ্বলনজ্বালা,
ধরিয়ে প্রফুল্লমুখে মস্তকে সকলি।
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী।"

কবি অভিমানিনী সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—

"আজি এ বিষণ্ণ বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে, দেবি, জন্মের মতন!"

পূর্ণিমা-প্রমোদ-আলো,
নয়নে লেগেছে ভালো ;
মাঝেতে উথলে নদী, দুপারে দুজন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দুপারে দুজন !
নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন ;
হৃদয়বীণার মাঝে
ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন।
সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ ;
কেন মন্দাকিনীতীরে দুপারে দুজন ?"
সহসা মুহূর্ত্তের জন্য সংশয় আসিয়া বলে ;—
"তবে কি সকলি ভুল !
নাই কি প্রেমের মূল !
বিচিত্র গগনফুল কল্পনালতার ?
মন কেন বসে ভাবে,
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার ?

শত শত নরনারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারানিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায় ;
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি !"

কখনো বা প্রেমোপভোগের আদর্শ চিত্র মানসপটে উদিত হয় ;—

"নন্দন-নিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেত শিলাসনে
খোলা প্রাণে রতিকাম বিহরে কেমন !
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি ;
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন।

* * *

কি এক ভাবেতে ভোর,
কি যেন নেশার ঘোর,
ঢলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমাজড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গল গল মন।
করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর ;

তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর-কমলদল কাঁপে থরথর।
প্রণয়-পবিত্র কাম,
সুখস্বর্গ মোক্ষধাম!
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ!
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি;
রতির খুলিয়ে খোঁপা আলুথালু কেশ!
বিহ্বল পাগলপ্রাণে
চেয়ে সতী পতিপানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন;
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দুটি,
আধ ইন্দীবর ফুটি,
ঢুলুঢুলু ঢুলুঢুলু করিছে কেমন!
আলসে উঠিছে হাই,
ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কি যেন স্বপনমত চলিয়াছে মনে;
সুখের সাগরে ভাসি
কিবে প্রাণখোলা হাসি
কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে!
উথুলে উথুলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুইজনে;

সুরে সুরে সম রাখি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী,
তালে তালে চলে চলে চলে সমীরণ।
কুঞ্জের আড়ালে থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর;
বাজিয়ে মুকুলে ফুলে
আহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জলতা নাচে মনোহর।
সে আনন্দে আনন্দিনী,
উথলিয়ে মন্দাকিনী
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে।"

এইরূপ বিষাদ বিরহ সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দমিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। আরম্ভ-অংশ ব্যতীত হিমালয়ের বর্ণনা প্রশংসার যোগ্য নহে—সেই বর্ণনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করি।

"উদার উদারতর
দাড়ায়ে শিখরবর
এই যে হৃদয়রাণী ত্রিদিব-সুষমা!
এ নিসর্গ রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা!
আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কাজ নাই মন নাই আমার কথায়;

মুখখানি হাস-হাস,
আলুথালু-বেশবাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়।
না জানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে!
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশি-যামিনী;
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে!
আহা কি ফুটিল হাসি!
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার;
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার!
দরিদ্র ইন্দ্রত্বলাভে
কতটুকু সুখ পাবে
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার!

* * *

এস বোন, এস ভাই,
হেসে খেলে চলে যাই,
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দকাননে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!

হে প্রশান্ত গিরিভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!
প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মুরতি তোমার!
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি করে হাহাকার।
আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরীসম,
আনন্দ সাগর মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!
দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি
প্রভাত করেছে রাতি;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!
এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর!

আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়কুসুমমালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই কুলডোর।
পুন কেন অশ্রুজল!
বহ তুমি অবিরল!
চরণকমল আহা বুলাও দেবীর।
মানসসরসী কোলে
সোনার নলিনী দোলে
আনিয়ে পরাও গলে সখীর সুধীর!
বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চম তান!
সারদামঙ্গলগান গাও কুতূহলে!"

কবি যে সূত্রে সারদামঙ্গলের এই কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি না জানি না—মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়—কিন্তু এ কথা বলিতে পারি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারা উৎসের মত কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্ম্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর নিকট আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া

হই। বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া "বিদ্বজ্জন সমাগম" নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।

আজ কুড়ি বৎসর হইল সারদামঙ্গল আর্য্যদর্শন পত্রে এবং ষোল বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ভারতী পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদরসম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে সারদামঙ্গল এই ষোড়শ বৎসর অনাদৃত ভাবে আপন বহুরত্নের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে। কবিও ইহার বাহিরে দর্শন দেন নাই। যিনি জীবনরঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দর্শকমণ্ডলীর অতিসন্নিধানে অতীত ছিলেন তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অপসৃত হইয়া সাধারণের স্নিগ্ধ সমভাব প্রাপ্ত হইলেন না; কিন্তু এ কথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান কীর্ত্তিমালা ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

ভৌতিক বিজ্ঞানের দুরাকাঙ্ক্ষা।

"মার্চ মাসের 'বিজ্ঞান-উন্নতি' নামক পত্রে ডব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিসুজেরাল্ড্ সাহেব ভৌতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ বলেন ;—"ইথর ও জড়ের গঠন কিরূপ, এই মহাসমস্যা, আজ-কাল, ভৌতিক তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের সম্মুখে উপস্থিত। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, উহারা গতি-গণিতের নিয়মানুসারে গঠিত। উত্তরোত্তর এই সত্যটি আরও নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহারা ভার-বেগ, চেষ্টা-শক্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি নিয়মের বশবর্ত্তী। উহাদের ক্ষুদ্রতম অংশও ঐ নিয়মের অধীন। যদি তাহাই হয়, তবে উহাদের গঠন কিরূপ? এই তমসাবৃত অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটা পথ আমরা বাহির করিতে চাই—জড়ের গঠন ও উহার আভ্যন্তরিক গতি আমরা অবগত হইতে চাই। এই জন্য, আমরা ভৌতিক তত্ত্বানুসন্ধায়ী ও রাসায়নিক পণ্ডিতের মুখ চাহিয়া আছি। আমরা আশা করিতেছি, একদিন-না-একদিন এই সকল আভ্যন্তরিক গতি ও গঠন সম্বন্ধে এতটা জ্ঞান লাভ করিব যে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ স্মৃতির গঠন পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিব; এবং চিন্তা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির মূলে যে সকল গতি নিহিত আছে, তাহার একটা অস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। তখন, নৈতজগতের গতির মূলে কিম্বা কোন মানব-জাতির ক্রমাভিব্যক্তির মূলে কি কি চিন্তা নিহিত আছে তাহাও হয় তো আমরা বলিয়া দিতে পারিব।"

...ভিনব অস্ত্র।

...টক মন্থলি" পত্রে ব্রেট-সাহেব পরামর্শ-
...ল রক্ষার্থ, বন্দুক ও সঙ্গিনের পরিবর্ত্তে,
...র্ত্তব্য। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ-পদার্থ ও
...। কার্য্যে ব্যবহার করা বন্ধ নয়।
...উপর এতাধিক শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎ-
...ম, স্পর্শমাত্র একটি সমস্ত অনীকিনী
...বং দাহ্য-তৈল কোন স্থান হইতে ২০
...রিয়া, ইচ্ছামত তৎক্ষণাৎ তাহাতে
...ব। তিনি আরও একটা পরামর্শ
...তে কামান সজ্জিত করিয়া এইরূপ
...খলে, ১০০ মাইল পর্য্যন্ত রেল-পথ

...রক হ্যারিসনের মত।

...নতিক অনুশীলনের সম্বন্ধ কি, এই
বিষয়ে, ...ত্রন্যাষ্যানাল জর্নাল অক্ এথিক্স"
পত্রে ...
তি... ...ন;—"যাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে
পারে, ...তিব মধ্যেই একটা সাধারণ উপা-
দান ব...
"ধ... কি? প্রথম উপাদান;—এমন
একটি ... স্থাপন করা, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তি

অপেক্ষা মহত্তর—যাহা সমস্ত সমাজ অপেক্ষা মহত্তর—যে শক্তি, শুভ ও অশুভ ফল বিতরণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের সহিত যাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সমান বিদ্যমান। দ্বিতীয় উপাদান,—এই শক্তির প্রতি ভক্তিভাব, ভয়, প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং এই সমস্ত ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির ব্যবস্থা। তৃতীয় উপাদান;—এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান—জীবনের এমন কতকগুলি নিয়ম পালন করা, যাহা শক্তির অভিপ্রেত ও প্রিয় এবং যাহার আচরণে সেই শক্তির প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়।" হ্যাবিসন সাহেব বলেন;—"ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সখ্য বন্ধন না করিলে, প্রকার নৈতিক অনুশীলনই, চরিত্রের স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারে না। ধর্ম্ম—অর্থাৎ পরাশক্তির উপর বিশ্বাস এবং তাহার প্রতি অন্তরের গভীর ভাব। আর তত্ত্বজ্ঞান, কি না, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও মনুষ্যের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ মত। সমস্ত নৈতিক সমস্যা দুই প্রকারে পুনর্গঠিত হইতে পারে। এক—বুদ্ধ কিম্বা সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যে প্রকার উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই প্রচণ্ড ধর্ম্মোৎসাহের দ্বারা নীতি গঠিত করা; আর এক—বেন্থ্যাম্ প্রচারিত আত্ম-স্বার্থ-মতের উপর নীতিকে স্থাপন করা। নীতিতত্ত্ব যতই বিশুদ্ধ ও উচ্চ হউক না, চিত্ত-আবেগের ঘূর্ণ বায়ুর বহ্নি কিম্বা স্বার্থপরতার গূঢ় প্রবর্ত্তনার সহিত তুলনা করিলে, সকল নীতিতত্ত্বই হীনবল হইয়া পড়ে। ইহা নিশ্চিত, লোভ দ্বেষের উত্তেজনায় মানব-চিত্ত যেরূপ উত্তপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, দয়াবৃত্তির প্রবোচনায় ততটা কখনই হয় না। ইতিহাস কেবল একটি শক্তি—একটিমাত্র শক্তির কথা আমাদের নিকট ব্যক্ত করে, যাহা এই সকল প্রবৃত্তির সহিত—

স্বার্থ ও রোচনার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছে। কোন-না-কোন আকারে ধর্ম্মই সেই শক্তি। .... স্বার্থানল অপেক্ষা ধর্ম্মানল যে প্রবলতর তাহা ইতিহাসে সপ্রমাণ হইয়াছে। সমস্ত মানব-ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা প্রবল শক্তি আর দ্বিতীয় নাই। সভ্যতা যদি কেবল নৈতিক অনুশীলনের মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তাহাতে হত্যাকাণ্ডের দারুণতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইতে পারে বটে, কিন্তু এ অবস্থায় যে সকল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বচিন্তিত বলিয়া আরও ভয়ানক। হত্যাকাণ্ড যদিও বা কমে, জুয়াচুরী প্রবঞ্চনার ভীষণ বিষ-বৃক্ষ সকল জন্মাইবার পক্ষে এই প্রকার সভ্যতা-ভূমি যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ

সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক।

এপ্রিল মাসের "জেণ্টেল্‌ম্যানস্ ম্যাগাজিন্" পত্রে শ্রীমতী লিঙ্ক সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্কের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইটালি ও জর্ম্মনিদেশে এইরূপ অনেকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিতার নিয়মে স্থাপিত, প্রতিযোগিতার নিয়মে স্থাপিত নহে। আমাদের দেশে সুদের যেরূপ উচ্চ হার, তাহাতে আমাদের পল্লিগ্রামেও এইরূপ ব্যাঙ্ক দিবার কুঠি খুলিলে দরিদ্র কৃষকেরা ও মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা মহাজনের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

উল্‌ফ সাহেব বলেন" জর্ম্মনিদেশে, সার্ব্বজনিক মহাজনী কুঠির সাহায্যে প্রতিবৎসরে প্রায় ৩ কোটি পৌণ্ড তোলা হয়—এই সমস্ত টাকা বাণিজ্যে খাটে—একটি শিলিংও পড়িয়া থাকে না।

ইহার প্রত্যেক পেনিতে—রাজ্যের উত্তেজনা হয়, কৃষির উন্নতি হয় ও স্বদেশী শ্রমজাত সামগ্রীর কাটতি হয়।"

শ্রীমতী লিঙ্ক বলেন, "মেণ্টন-প্রদেশে দশ বৎসর পূর্ব্বে তত্রস্থ সকল ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা বারটাকা হারে সুদে কর্জ্জ পাওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক খুলিবার পর হইতে ৮বৎসরের মধ্যে সুদের হার শতকরা ছয়টাকায় নামিয়াছে।"

জর্ম্মানি, ইটালি, সুইট্‌জর্লণ্ড ও ফ্রান্সের সহযোগিতামূলক ব্যাঙ্কের অধিনেতারা বলেন, "সমস্ত শ্রম-শিল্প ব্যবসায়ের মূলে বিশ্বাস নিহিত আছে। ব্যাঙ্কিং কাজও সহযোগিতার নিয়মে চালানো উচিত।"

শ্রীমতী লিঙ্ক বলেন, এইরূপ সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক খুলিতে হইলে প্রথমে স্বল্পপরিমাণে আরম্ভ করা উচিত। "সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন কার্য্যে যথেষ্ট হইয়াছে যে, এক পৌণ্ড অংশের পঞ্চাশটি অংশ মিলিয়া যে মূলধন স্থাপিত হয় তাহা পল্লিগ্রামে একটি ভাণ্ডার খুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। ফ্রান্সদেশে, ১১ সহস্র নিবাসী-বিশিষ্ট একটি নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বিক পল্লি-প্রদেশের জন্য একটি ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এই ব্যাঙ্কটি আট শত পৌণ্ড মূলধনে আরম্ভ করিয়া বিলক্ষণ সফলতা লাভ করে। কি ভাণ্ডার-স্থাপন কি ব্যাঙ্ক স্থাপন—এই উভয় কার্য্যেই প্রত্যেক অংশীর অংশ-ক্রয় ক্ষমতার একটা সীমা থাকা উচিত। কেন না, এমন হইতে পারে, যাহার বেশি টাকা আছে, সে হয়তো সমস্ত অংশ কিনিয়া ফেলিল—তাহা হইলে আর ভ্রাতৃভাবে সহযোগিতার নিয়মে কাজ চলিতে পারে না। বাঙ্ককে এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিবার আর একটি উপায় সাবধানে অংশী নির্ব্বাচন করা। আর একটি উৎকৃষ্ট উপায়—আইনের দ্বারা শতকরা পাঁচ টাকা হার পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্টের সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। প্রারম্ভিক সমিতিতে যদি কোন গোলযোগ না

হয় তবে সমস্ত অংশগুলিরই গ্রাহক জুটিবার সম্ভাবনা, অংশগুলি উঠিয়া গেলে, সর্ব্বপ্রিয় ও বিশ্বস্ত এইরূপ স্থানীয় লোক দেখিয়া কর্ত্তৃ-সভার সভাপতিনির্ব্বাচন। কর্ত্তৃ-মণ্ডলীও অধিকাংশের মতে নির্ব্বাচিত হইবেক—তাহাতে যেন কোন দলাদলির ভাব না থাকে। কিছুকাল পরে, এই কর্ত্তৃ-মণ্ডলীই আপনাদের মধ্য হইতে একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করিবেন। ইনিই ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যক্তি—ইহাঁরই যোগ্যতার উপর ব্যাঙ্কের সফলতা অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণ [illegible] ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক অধিবেশনে ও কর্ত্তৃ-মণ্ডলীর সাপ্তাহিক [illegible]ষা-সমিতিতে অনেক কাজ করিবার থাকে। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও [illegible] সকল কাজের বিলিবন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে [illegible]নাপ্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তৃসভার তাহা [illegible]নুমোদন করা চাই। ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজ-কর্ম্মে নজর রাখিবার [illegible]ন্য একটা দৃষ্টিরক্ষণ-সমিতি থাকিতে পারে। ফ্রান্স ও ইটালিতে [illegible]-পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেক অংশীর অর্থ-দায়িত্বের সীমা নির্দ্ধা[illegible]। কিন্তু জর্ম্মনিতে এইরূপ দায়িত্বের কোন সীমা নাই। যাঁহারা সীম দায়িত্বের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, অসীম দায়িত্ব থাকা প্রযুক্ত এপর্য্যন্ত কোন সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্ক দেউলে হয় নাই; অধিকাংশ বিফলনক্ষ ব্যাঙ্কের প্রতিদিনকার হিসাব [illegible]ন্তিনি মিটানো হয়; ব্যাঙ্ক কিরূপ চলিতেছে, যে কেহ আসিয়া তৎক্ষণাৎ জানিতে পারে। এই বিষয়ে সকল সার্ব্বজনিক ব্যাঙ্কের ঐক্যমত—কোন প্রকার [illegible] ব্যবসায়ে অর্থ-নিয়োগ না করা। নবব্রতী ব্যবসায়ী যদি নিঃস্ব হন, তবে যেন প্রথমে ফার্ণ্ড কিছুকাল জমাইয়া [illegible] একটা ছোট-খাট বাড়িতে কার্য্যালয় স্থাপন করেন। [illegible] একজন কর্ম্মচারী রাখিবেন, তাহারা যেন [illegible]

চিনি-পে

এপ্রিল মাসের "কণ্ঠস্থ[illegible] অ্যালেন সাহেব
মিষ্ট কথা নামে একটা [illegible] যাহাতে এই কথা
বলেন,—জীব-প্রকৃতি [illegible] প-ভূষা অলঙ্কারের
প্রাচুর্য্য ও জাঁকজমক [illegible] নালি গুব্রেপোকা,
গুবরে-পোকা, সরকারী [illegible] গতাপাখী প্রভৃতির
মধ্যে দেখা যায়।—[illegible] বে, ঐ সকল
পোকারাণী জাতে [illegible] । সর্ব্বত্র সৃষ্টির
সময় বর্ণানুরাগ ও [illegible] পাশাপাশি যায়।
পিঙ্গলী পাখী, [illegible] এপোকা ইহাদের
না আছে বর্ণানুরাগ- [illegible] তা-ছাড়া উহাদের
রং, ছয় খোলাটে [illegible] বে উদ্দেশে কোন
নির্দ্দোষ মনে [illegible] নেলে অদ্ভুত মনে
হয় বটে, কিন্তু [illegible] ন্দর্য্যবোধ এক সূত্রে
গাঁথিয়া।

[illegible] ইয়র্ক-সি [illegible], গভীর জলে কিরূপে
থাকা যায়, সেই [illegible] গোজিনে" বর্ণনা করিয়া-
ছেন। তিনি বা [illegible] নীচে কোন মানুষ ডুবিয়া
থাকিতে পারে [illegible] কিন্তু গভীর জলে কাজ
করিবার ইহা বড় [illegible] হার পক্ষে ঘাত হইল। সেই
ঘটনা সে কোন [illegible] । আর একটি কৌতূহল-
জনক ব্যাপারে [illegible] যে, ডুবুরীরা যখন জলের

দুনিয়ার লোক নাই" এই সকল কথা শুনিতে হয় না। এখন স্ত্রীলোকের কাজ করিবারও কোন বাধা নাই—কেন না, স্ত্রীলোকের কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও উদার মতের আবির্ভাব হইয়াছে এবং এক্ষণে কাজ-পথ সকলও নিরাপদ। ..... যুবকদিগকে যেমন শিক্ষা দিয়া থাক, বালকদিগকেও এই বলিয়া শিক্ষা দেও যে, আমরা প্রত্যেকেই একটি বৃহত্তর পরিবারের অঙ্গ—এবং সমগ্র জাতির উত্থানে-অংশ। যেমন উহাদের আত্মরক্ষার জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের শিক্ষা দিতেছ—তেমনি উহাদিগকে জ্ঞানেরও শিক্ষা দেও; মায়েরা যেন এ কথাটি বুঝেন যে, জনকজননীর সহিত গৃহিণীর প্রীতির সহিত পত্নীর যতই কেন সুখকর সখীভাব ও মনের মিল হউক না, মধ্যে মধ্যে এমন ব্যাপার উপস্থিত হইতে পারে যাহা আরও পবিত্রতর—অর্থাৎ যখন সংসার মহাক্ষেত্রে কাজের ডাক পড়ে। যদি উহা কণ্ঠের হারপাতালের কাজ হয় তাহাতেই বা কি?—এ ডাক স্বর্গীয় ডাক—এ আহ্বানধ্বনিকে আমোদপ্রমোদের কোলাহলে ঢাকিয়া ফেলিলে পাপ হয়। ইহাই জীবন-ব্রতের জীবন, ক্লেশের জীবন। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য প্রকৃতভাবে "বাহির হইয়া অগ্রবর্ত্তী হওয়া"—কেন না, উহাই আমাদের খ্রীষ্টের আদেশ। যদি বিবাহের মধুর হাসি তোমার অদৃষ্টে থাকে তবে তাহাকে ছোট বড় সমস্ত দায়িত্বের জন্য পূর্ব্বাহ্ণ হইতে প্রস্তুত হও। যদি তাহা অদৃষ্টে না থাকে, জীবনের অন্য অনেক পথ খোলা রহিয়াছে—তাহাতেও তোমার আত্মোন্নতি সাধনের সুযোগ হইবে। কোন অবস্থাতেই, বিবাহকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বালিকার নিকট বর্ণনা করা উচিত নহে। এবং উভয়পক্ষে ভালবাসার পূর্ণতা না থাকিলে এবং অপরিজ্ঞাত অজাত ভাবী সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ না থাকিলে, অন্তরে পবিত্র বিবাহাগারে প্রবেশ করা উচিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত পত্রে মর্টিমর সাহেব স্ত্রীলোকের দৈহিক বিকাশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন—(১) পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও একই প্রকার স্বাস্থ্য ও সচরাচর শ্রুতিবোধোক্তি লাভ করিতে প্রাকৃতিবিধানানুসারে সমর্থ। (২) এখন যে প্রকার জীবনসংগ্রাম উপস্থিত, তাহার উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিবার জন্য স্ত্রীলোকের যত প্রকার শক্তি আছে তৎসমস্ত পরিবর্দ্ধন করা উচিত। (৩) এইরূপে প্রস্তুত না হইলে ভবিষ্যদ্বংশের স্ত্রীলোকেরা সামাজিক সাম্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। পুরুষদের এখন যেরূপ দেহের সহন-শক্তি, তাহাতেই তাহারা অধিকাংশ পেশা ও ব্যবসার অধিকার করিয়া আছে—স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা পুরুষদের এই জন্য বেশি সুবিধা। (৪) স্ত্রীলোকের "দৈহিক বিকাশ থামিয়া যাওয়া" সম্বন্ধে লোকের যে একটা ধারণা আছে, আসলে তাহা সত্য নহে। স্ত্রীলোকের "স্তম্ভিত বিকাশ" সামাজিক আচার ব্যবহারের ফল, উহা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল নহে। এইরূপে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কৃতকার্য্যতার সমান সম্ভাবনা লইয়া জীবন আরম্ভ করে; কেবল চারিদিককার অবস্থাভেদে, স্ত্রীলোকের সম্ভাবনা-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।"

কৃতজ্ঞতা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তারের রিপোর্টে ম্যানেজারের অবস্থা একটু ভাল জানিয়া ডোনাল্ড সাহেব আর ব জেখানবর্ত্তী হইতে গেলেন। তখন অপ-

বাহু হইয়া আসিয়াছে। স্বেচ্ছায় অকালী সিং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে গেল।

নিভিবার আগে প্রদীপ যেমন অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আহত মুমূর্ষুর তখন সেই অবস্থা। ইহলোক এবং পরলোকের সেই সন্ধিক্ষণে শান্ত মলিন গোধূলি ছায়া আসিয়া জীবনালোকের অবশেষটুকু ধীরে ধীরে আবৃত করিতেছিল। পরিশ্রান্ত দিবামান পূরবী মুখে বৈরাগ্য সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে যেমন মুদিয়া আসে, সিদ্ধেশ্বর রায় তেমনি নিজের পাপপঙ্কিল জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ছোটতরফের অনিষ্ট কামনার কথা, অকালী সিংএর প্রতি অবিচারের কথা-স্বপ্নছায়ার মত মনে পড়িতেছিল। এমন সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে তাহার সে দশা করিয়াছে। অনুতপ্ত হৃদয়ে সিদ্ধেশ্বর রায় বলিল—"কেহ না, বিধাতা আমার পাপের শাস্তি দিয়াছেন।"

অকালী সিং নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া ডোনাল্ড সাহেবের শ্রম লাঘব করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি বড় খুসী হন নাই। কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার হৃদয়ের নিভৃতে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা বলিতেছিল "কোন রকমে এ লোকটা কি বাচিয়া যাইতে পারে না?" অতএব সিদ্ধেশ্বর রায়ের উত্তর শুনিয়া সাহেব আশ্বস্ত দৃষ্টিতে অকালী সিংএর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সে মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ ভয়মাত্রশূন্য বটে কিন্তু বিস্ময় এবং কৌতূহলবর্জ্জিত নহে। মাজিষ্ট্রেট আবার সুধাইলেন,—"ছোটতরফের জমাদার অকালী সিং বলিতেছে যে তুমি তাহাকে অপমানিত করায় রাগের মাথায় সে তোমায় ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। ইহা কি সত্য?"

সিদ্ধেশ্বর ক্ষীণ জড়িত ভাষায় উত্তর দিল—"অকালী সিংএর কাছে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। কখন প্রত্যুপকার করতে পারিনি। তার দ্বারা আমার অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব। আমি পাপী, আপনি বিচারক, দেখবেন আমার জন্য তার কোন বিপদ না ঘটে।"—আর কথা সরিল না। সিদ্ধেশ্বর রায় আবার অজ্ঞান হইল।

স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া অকালী সিং হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিল—"বাবু, তুমি এত মহৎ তা জান্‌তাম না। আমি কবে কি সামান্য উপকার করেছিলাম, তাই ভেবে আজ্ তুমি আমায় বাঁচাবার জন্যে আসল কথা গোপন করলে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল, কিন্তু আমায় নরকে পচ্‌তে হবে।"

... ...

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সাহেব দম্পতি কুণ্ডলার পশ্চাতীরে পাদচারণা করিতেছিলেন, সম্মুখে বালুকা-সমুদ্রের বুকে পশ্চাৎ শান্ত গভীর প্রবাহরাশি অলস ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি-পাত হওয়ায় তীরসংলগ্ন নদীসৈকতে নবীন কোমল তৃণরাজি উদ্‌ভিন্ন হইয়াছে, অদূরের আম্রকানন হইতে বউকথাকও পাখীর মর্ম্মকথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

বিবি বলিতেছিলেন "আচ্ছা, বউকথাকও না ভেবে যদি ভাবা যায় কলুকত্তা যাব তাওত হতে পারে। আমরা যদি মনে করি "Forget me not," তাতেও কোন অমিল হয় না। কিন্তু নেটীভেরা ঐ এক বউকথাকও ছাড়া আর কিছু ভেবে উঠ্‌তে পারে না।"

সাহেব অন্যমনে ভাবিতেছিলেন। কথাটা, ঠিক্ মনের মত হওয়ায় বলিয়া উঠিলেন "sentiment! It is sentiment that governs the world and not reason, তার সাক্ষী দেখ না কেন অকালী সিংকে নিয়ে কি বিপদেই আমি পড়েছি।"

মিসেস্ ডোনাল্ড হাতপাখাখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া বায়ু সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিলেন, "আহত ম্যানেজার বলিতেছে, অকালী সিংএর কাছে সে উপকৃত, উভয়ের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই। অকালী সিং নিজে দোষ স্বীকার করিতেছে বটে, কিন্তু হতে পারে তার মস্তিষ্ক তেমন সহজ অবস্থায় নেই। প্রমাণের অভাবে এমন স্থলে তোমার সঙ্কট কোন্‌খানে আমি ত বুঝ্‌তে পারচিনে।"

ডো। সন্দেহ হয় বটে যে অকালী সিংএর মস্তিষ্ক হয় ত বিকৃত হয়েচে, কিন্তু আমি নিজে তার কোন কারণ দেখ্‌চিনে। প্রমাণ নেই বটে কিন্তু আমার মনের বিশ্বাস এই যে অকালী সিংএর কথাই ঠিক্, সে বীরের যোগ্য সত্য কথা বলেচে। এও বেশ বুঝ্‌তে পারচি যে ম্যানেজার মৃত্যুশয্যায় পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করে আহতকারীকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু এটাও ভাববার বিষয় যে, এতটা মহত্ত্বের দান প্রতিদান কি নেটীভদের মধ্যে সম্ভব?

ডোনাল্ডপত্নী স্বামীর কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "এসব কথা সত্য হলে আমরা যে নেটীভদের কাপুরুষ বলে থাকি, তার কোন ভিত্তি থাকে না।"

ডো। সাধারণতঃ দেশীয় লোকেদের ভিতর কৃতজ্ঞতার ভাবটা এম্‌নি দুর্লভ, যে নেটীভ্ চরিত্রের পঁচিশবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতায় এসব কথা আমি সম্পূর্ণ প্রত্যয় করে উঠ্‌তে পারচিনে। ইংরেজ রাজত্বে সর্ব্বাপেক্ষা উপকৃত এখনকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেখ না কেন! বাবুগুলো এই শ্রেণী থেকে উৎপন্ন, কিন্তু তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে ভারি অহঙ্কৃত হয়ে উঠেচে এবং তাদের সম্পাদিত খবরের কাগজগুলো অবিরাম অসন্তোষ উদ্‌গার করে ভাবী রাজদ্রোহের সূচনা করচে।

ডোনাল্ড সাহেব অনেকক্ষণ আর কিছু বলিলেন না। তাঁর ভারতীয় জীবন দুইটা পরস্পর বিরোধী শক্তি সংঘাতে বরাবর সংবত হইয়া আসিয়াছে। নেটীভ বিদ্বেষের বিশেষ অভাব ছিল না বটে, এবং মাঝে মাঝে নিবীহ আমলাদিগকে অভ্রান্ত ভাষায় I hate you Babus বলিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সহজ উদার চরিত্র কার্য্যকালে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অনেক সময়ে মহত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

তাঁবুতে ফিরিবার সময় উভয়ে এ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। পথে দারোগা এত্তালা করিল ম্যানেজারের মৃত্যু হইয়াছে। দারোগা সাহেবের মনোগত অভিপ্রায় অকালী সিংকে গ্রেপ্তার করেন, কিন্তু সাহস করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে সে কথার "আরজ" করিতে পারিলেন না।

গভীর রাত্রে ডোনাল্ড সাহেব অকালী সিংকে কাছে ডাকিলেন। সে আসিলে সুধাইলেন ম্যানেজারের মৃত্যুসম্বাদ তাহার গোচর হইয়াছে কি না?

অকালীসিংও তা শুনিয়াছিল—অতএব কেবল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

ডোনাল্ড বলিলেন, "অকালী তুমি যে ম্যানেজারকে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিলে, তোমার নিজের কথা ছাড়া তার অন্য প্রমাণ নেই। আহত ব্যক্তি নিজে তোমায় সকল দোষ থেকে মুক্ত করে গেছে। এ অবস্থায় আইন তোমায় স্পর্শ করিবে না।"

অকালীসিং করযোড়ে বাষ্পাকুল লোচনে ভিক্ষা করিল তাহাকে জেলে দেওয়া হোক্! কেননা তাহাকে ক্ষমা করিলে জীবন তাহার দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে।

ডোনাল্ড সাহেব হাসিলেন। বলিলেন "অকালী সিং বীরপুরুষ

তুমি, জেলে যাইতে ভয় করনা, কিন্তু তোমার মত ব্যক্তিকে সাধারণ পাপীদের সঙ্গে বাস করিতে হবে, এ চিন্তায় আজ্ দুদিন আমি আকুল আছি। আমার আদেশ, কাল প্রত্যুষে তুমি স্বদেশে চলে যাবে এবং পাঁচবৎসর কাল অর্থাৎ যতদিন তোমার প্রভুকন্যা সাবালিকা না হন ততদিন তুমি তাঁকে দেখা দিবে না। কোর্টঅব-ওয়ার্ডস মাসে মাসে তোমার মাসহারা পাঠাবেন।"

অকালীসিং জীবনে আর কখন কাহারও কাছে মতজানু হয় নাই—আজ্ ডোনাল্ড সাহেবের কাছে হইল। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমি পাঁচবছর কাল প্রভুকন্যাকে দেখ্‌তে পাব না, আমার পক্ষে এর চেয়ে গুরুতর শাস্তি আর কিছু হতে পারে না। আমার পাপের এই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য। আমার একমাত্র ভিক্ষা আপনি ছোট ভগবতের বিষয়টুকু রক্ষার ব্যবস্থা করতে দেরি মাত্র করবেন না।"

সাহেব অকালীসিংকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার হাতে একখানি কাগজ দিলেন। বলিলেন "যদি কখন বিপদে পড়, রাজপুরুষদের ইহা দেখাইও।"

ডোনাল্ড সাহেবের একটী আদেশ অকালীসিং পালন করিতে পারে নাই—তিনি পাথেয় স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলে বিনীত অথচ দৃপ্ত ভাবে তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউটে দীনেন্দ্রনাথের এক মোসাহেব জুটিয়াছিল। ইনি অনেকগুলি নাবালককে অকালে সাবালকত্বে পরিণত হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সাধারণতঃ ওয়ার্ডদের খুব হিতৈষী ছিলেন। ইহাঁর আশ্চর্য্য শক্তি এই ছিল যে রিক্তহস্ত ওয়ার্ডদের

যত টাকারই কেন দরকার হোক না, তাহাদের এক একটা সহি পাইলেই তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

এ হেন গুণীলোকের নামটী সম্প্রতি এপক্ষ লেখকের ঠিক্ মনে আসিতেছেনা। অতএব কবিবর সেক্ষপীয়রের প্রসিদ্ধ কবিতা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁকে যদি চারু বাবু বলিয়া পরিচিত করি এবং সেই নামেই ডাকি, তাতে এমনই কি বিশেষ ক্ষতি?

চারু বাবুর ইতিহাস যিনি জানিতে চাহেন তাঁহাকে বলিয়া রাখি যে মোসাহিবী ব্যবসায় তাঁহার পুরুষপরম্পরাগত—তবে কিছু কিছু কণ্ট্রাক্টের কাজও তিনি সববরাহ করিয়া থাকেন। যে সকল ওয়ার্ড, ইনষ্টিটিউট উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে চারু-বাবুর ঘনিষ্ট যোগ। কেহ কেহ তাঁহাকে মাসহরা পাঠাইয়া দেন এবং একজন দেওয়ানী দিতে চাহিয়াছিলেন। শুনিয়া ওয়াইল্ড মার্চেণ্টগণ বলিয়াছিল, "বাবু আপনি অমন কর্ম্মও করিবেন না। আমরা আপনার কমিশন বাড়াইয়া দিব।" সেই অবধি চারুবাবুর পৈতৃক ব্যবসাটার উপরই বেশী ভরাভর।

দীনেন্দ্রনাথের খরচপত্র বাড়ী হইতে যথেষ্ট আসিত, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব চারুবাবু অন্য উপায়ে তাহাকে বাধ্য করিতে ব্যস্ত হইলেন। বীডন-পার্কে দীনেন্দ্র মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইত, পদব্রজে ভ্রমণ ব্যায়ামের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া সব দিন গাড়ী সঙ্গে থাকিত না। চারু বাবু এই সময়ে অকস্মাৎ দীনেন্দ্র-নাথের ভারি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন—সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি একদিন উভয়ে বীডনগার্ডনে বেড়া-ইতেছিলেন। সন্ধ্যার একটু আগে ঝড় উঠিল। চারু বাবু এক-খানা গাড়ী ভাড়া করিবার জন্যে ছুটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বৃষ্টিপতন আরম্ভ না হইলে ফিরিলেন না। গাড়ী পাওয়া যায় নাই, অগত্যা

দীনেন্দ্রনাথ চারুবাবুর সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ একটা বাড়ীর বারান্দার নীচে গিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁর মাথায় ও চাদরে কোঁটাকতক বৃষ্টি পড়িয়াছিল।

সহসা একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাঁহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং স্নেহ-কোমল স্বরে বলিল "আহা কার বাছা, তোমরা বাবা বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজচো?" প্রৌঢ়া অভ্যস্ত এগলুতভার সহিত উভয়ের বস্ত্র ও মস্তক স্পর্শ করিয়া আবার বলিল—"কাপড় চোপড় সব ভিজে গেছে যে বাবা! তোমরা দেখ্‌চি বড়লোকের ছেলে, দুঃখিনীর দুয়োরে কত ভাগ্‌গিস্ দাঁড়িয়েচো। বলতে ত পারিনি, যদি দয়া করে ওপরে গিয়ে কাপড় চোপড় ছাড়। নইলে অসুখ হবে।" চারুবাবু দীনেন্দ্রনাথের লজ্জানত মুখের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন—"ক্ষতি কি?" দীনেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, তার পর চারুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গেল।

দীনেন্দ্র উপরে উঠিয়া দেখিল প্রৌঢ়া নিতান্ত দুঃখিনী নহে। বসিবার ঘরটি আসবাবে পূর্ণ এবং বেশ সুসজ্জিত। আর পরিবর্ত্তনের জন্য যে বস্ত্রাদি সে লইয়া আসিল, তাহাও মূল্যবান। চারুকে দশমিনিটের ভিতর সে গৃহে চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিয়াও দীনেন্দ্র বিস্মিত হইতেছিল।

ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেলে দীনেন্দ্র ইনষ্টিটিউটে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ ঝম্ মলের শব্দ হইল। সম্মুখে আপাদমস্তক অলঙ্কারবিভূষিতা সুন্দরী তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে স্ত্রীজাতিসুলভ কোমলতা এবং লজ্জার লেশ ছিল না। সে হাসিয়া দীনেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল—"দয়া করে যখন এসেছেন, এত শীগ্‌গির যেতে দেব না।"

আমরা এই পাপচিত্র বিস্তারিত করিব না। দীনেন্দ্রের অধঃপাত কিরূপে সুরু হইল, তাহাই দেখাইলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে মাতৃদত্ত অর্থে দীনেন্দ্রের আর বড় কুলাইত না। মাকে নানা উছিলায় ভুলাইয়া টাকা আদায় করা সহজ হইলেও একেবারে দশ বিশ গুণ খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় রোজ রোজ সেজন্য চিঠিবাজি করিতে তাহার কেমন লজ্জা লজ্জা করিত। প্রিয় বন্ধু চারু বাবু তাহার উপর বুঝাইয়া দিলেন, তাঁর একটা সই পাইলেই বিস্তর টাকা তিনি আনিয়া দিতে পারিবেন—সাবালক হইলে পর সে দেনা শোধ দিলেই চলিবে। মাকে লুকাইয়া বাবুগিরি করার এমন একটা সহজ উপায় থাকিতে পারে দীনেন্দ্রের সে জ্ঞান কস্মিন কালে ছিল না—অতএব সেটা আবিষ্কার করিয়া দেওয়ায় জন্য চারুকে সে ত্রিসংসারে একমাত্র বন্ধু বলিয়া জানিল। ইহার ফলে নয়খানেকের ভিতর মহাজনের কাছ থেকে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা দীনেন্দ্রের হ্যাণ্ডনোটে বাহির হইয়া আসিল—তার মধ্যে বলা বাহুল্য বিশ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র নাবালকের দর্শন লাভ করিয়াছিল।

এই হ্যাণ্ডনোট কাটার ব্যাপারটা রাজধানীতে যতই সুপরিচিত হোকনা কেন, মফঃস্বলে তাহার তেমন চলন নাই। যখনকার কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তখন রাজধানীতেও তাহা নিতান্ত সংগোপনে সম্পন্ন হইত। অতএব বেনামী চিঠিতে তাহার কথা জ্ঞাত হইয়া সরলহৃদয়া হরিপ্রিয়া দেবী যে ভাবিয়াছিলেন তাঁর কোকনকে কেহ অস্ত্রাঘাত করিবার সংকল্প করিয়াছে, তাতে তাঁকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। "জামগীরের নামের কলীভূষণ তলাপাত্র কথাটার অর্থ ব্যাখ্যান দায়িত্ব স্বয়ে না লইলেও মনিবের কাছে নিতান্ত বেকুব বনিবার পাত্র ছিলেন না—তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে চিঠিখানা লেখা কোন শত্রুর কাজ। কিন্তু ইহাতে ফিতে বিপরীত ঘটিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র শত্রুবেষ্টিত হইয়াছে এবং কোন্‌দিন কার হাতে মারা যাইবে ঠাকুরাণী ইহা মর্ম বুঝিলেন এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। [illegible]

হইতে উকীল আসিয়া কর্ত্রী ও তাঁহার আমলাবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে হ্যাণ্ডনোট কাটিলে মানুষ হঠাৎ মরে না সত্য, কিন্তু মৃত্যুর সে একটা পথ বটে। উকীলের পরামর্শে স্থির হইল, দিন-কতক কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে পীড়ন ভাণ করিয়া থাকিতে হইবে। তার পর দরখাস্ত করিলে বোর্ড কোকন বাবুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিতে পথ পাইবেন না। এবং তিনি একবার বাড়ী আসিলে সহজে আর তাঁকে কলিকাতায় পাঠান হইবে না।

অকালীসিং কুণ্ডলা ত্যাগ করার প্রায় দুই বৎসর পরের এ ঘটনা। ডোনাল্ড সাহেব তখনও জেলার কলেক্টর এবং তাঁহার যত্নে ছোট তরফের বিষয় আশয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হইয়া ঋণমুক্ত হইয়াছে। উভয় এষ্টেট্ একজন ম্যানেজারের "হাফ-য়ারে" হওয়ায় বড় এবং ছোট তরফে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছে।

স্ত্রী শিক্ষায় ডোনাল্ড দম্পতির আন্তরিক অনুরাগ। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, সুরবালা এবং দীনেন্দ্রপত্নীকে সদরে আনিয়া লেখা পড়া শিখাইবেন। ইহাতে সেই স্ত্রীশিক্ষার শৈশবদিনে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কালেক্টর স্বয়ং সস্ত্রীক কুণ্ডলায় গিয়া হরিশিংয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে লেখাপড়া শিখিলে হিন্দুর মেয়ে বিধবা হয়—তার সাক্ষী তিনি নিজে স্বামীর জেদে কখ, শিখিয়া এবং নাম সহি করিতে জানিয়া এক বছরের ভিতর একা দশী করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে সাহেব হাসিয়া উঠিলে কর্ত্রী হাতজোড় করিয়া মেমকে জানাইয়াছিলেন—লেখাপড়া শেখাইতে হয় ত কুণ্ডলাতেই যেন তাঁর ব্যবস্থা করা হয়। নইলে মেয়ে কি বউ যদি লেখাপড়া শিখিতে সদরে যায়, তাতে প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত কুলে কালি পড়িবে। কাজেই মিস্ ভার্জিনিয়া নামে শিক্ষয়িত্রী কুণ্ডলায় আসিলেন।

লেখাপড়ায় সুরবালার দিব্য বুদ্ধি, বিশেষ পিতার যত্নে আগে হইতেই সে পড়াশুনা করিত। কিন্তু দীনেন্দ্রপত্নী কুসুমমালাকে প্রথম শিক্ষয়িত্রীকে কিছু মুস্কিলে পড়িতে হইল। কুসুম পেনার সে মতটা শক্তি পড়াশুনায় ততটা নহে। আর আগুড়ী তাঁকে শেষ তাকে হিংয়ের মত ভয় করিতে শিখাইয়াছিলেন। ক্রমে শিক্ষয়িত্রীর সংসর্গে সহজ হইলেও কিন্তু ছাত্রীর প্রীতি বন্ধন তেমন

দৃঢ় হইল না। সুরবালাকে মেমদের সঙ্গে আত্মীয় আত্মীয়ের মত মিশিতে মিশিতে দেখিয়া বধূ নাসা কুঞ্চিত করিতেন—বলিতেন "ঠাকুরঝি ভাই, তোর কি সাহস! মেমদের ফ্যাকাসে রং দেখ্‌লে আমার গা ছাকার ছাকার করে!"

সুরবালার উপর মিসেস্ ডোনাল্ডের অপত্যবৎ স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহার মধুর অথচ তেজস্বী চরিত্রগুণে সে স্নেহ দিন দিন ঘনীভূত হইল। শেষে এমন হইল যে মাসে মাসে তাহাকে দেখিবার জন্য দুই একবার কুণ্ডলায় না আসিলে ডোনাল্ডপত্নীর চলিত না। প্রতিবার বিদায়কালে সাশ্রুনয়নে মিসেস্ ডোনাল্ড সুরবালার পিঠ থাবড়াইয়া বলিতেন "দেখ, সুরো তোমায় সুশিক্ষিতা করে সৎপাত্রে পরিণীতা হতে দেখ্‌লে আমার জীবনের একটা প্রধান সাধ পূর্ণ হবে।" সুরো লজ্জানতমুখে নিরুত্তর থাকিত, তাহাতে বালিকার সহস্রশ্রী শতগুণে বাড়িয়া উঠিত। দেখিতে দেখিতে তাহার গণ্ডে স্নেহের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া মেমসাহেব বগীতে গিয়া উঠিতেন এবং রুমালে চক্ষু মুছিতেন। ভগী বড় আশা করিত মেম সাহেবের অনুরোধে বড় হইয়া সুরো বিবাহ করিতে রাজি হইবে। কিন্তু জমাদার চলিয়া যাওয়ার পর থেকে সে নিজে আর কখন বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিত না।

শেষ বিদায়ক্ষণে অকালীসিং বুড়া ভগীর কাছে বিদায় হইয়া গিয়াছিল্ বটে, কিন্তু প্রাণ ধরিয়া সুরোকে দেখা দিতে পারে নাই। জমাদার দুই বছরের ভিতরও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া সুরো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত—মাঝে মাঝে ভগীদাসীকে সুধাইত "বড়বাড়ীর জেঠীমা যে বলেন, জমাদার ম্যানেজারকে খুন করে গেছে, আর কখন ফিরে আস্‌বেনা একি সত্যি ভগী বেটী?" ভগী দীর্ঘ নিশ্বাস সংযত করিয়া বলিত—"তানর কুকি, কালেক্টর সাহেবের কাছে ছুটী নিয়ে মনোহর তীর্থ করতে গিয়েছে, আবার এলো বলে। তুমি বাঁদরে কাটবে বলে তোমায় বলে যায় নি।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাবাজী দীননাথের নিকটে ডোনাল্ড সাহেবও এক উড়োচিঠী পাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে চারুচন্দ্র নামে জমাচোর

তাহার সহি লইয়া অতিশয় বেশী সুদে বোজ বোজ বিস্তর টাকা কর্জ্জ করিতেছে কিন্তু ওয়ার্ড ইনষ্টিউটের অধ্যক্ষেরা চাকর চালাকীতে অন্ধ হইয়া আছেন ইত্যাদি। পত্রলেখক ইঙ্গিতে বলিতেছে যে অমুক অমুক মহাজন কম সুদে টাকা দিতে চাহিলেও চারু বাবু নিজের পছন্দসই উত্তমর্ণদের অনুরোধ এড়াইতে পারে না, বিশেষ সে সব স্থলে তার শতকরা ৭৫টাকাই লাভ। বহুদর্শী ডোনাল্ড সাহেব বুঝিলেন এই চিঠির মূলে সত্য আছে কেননা বেনামী লেখক যেই হৌক সে কোন মহাজন সম্পর্কীয় বটে। গোপনে তিনি বোর্ডের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখিলেন যে ইহার অনুসন্ধান হউক।

এই সময়ে টমসন্ সাহেব ওয়ার্ডইনষ্টিউটের উপর আড়ে হাতে লাগিয়াছিলেন। তাহার লিখিত রিপোর্টে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। অতএব বোর্ডের মেম্বরেরা ডোনাল্ড সাহেবের ডেমি-অফিসিএল চিঠি পাইয়া স্থির করিলেন এ একটা পরীক্ষার স্থল টে। একজন সুযোগ্য ডিটেকটিভের হাতে অনুসন্ধানের ভার ড়িল।

আর একবার আমাদিগকে বীডন্ পার্ক সন্নিহিত সেই পাপপুরী-টার একটা চিত্র দিতে হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দীনেন্দ্র নাথের দিলজান আজ্ সাজসজ্জায় একটু বেশী রকম মনঃসংযোগ করিয়াছিল। এবং ফরমাইস দিয়া কতকগুলো বেলফুলের মোটা মোটা মালা তৈয়ার করাইয়াছিল। পুষ্পমালা প্রেমবন্ধনের নিত্য উপায় হইলেও দিলজানের তাহাতে মন উঠে নাই, আজ তার মনে আকাঙ্ক্ষার ঝড় বহিতেছিল কাজেই ফুলের "কাছি"র ব্যবস্থা না করিয়া সে স্থির হইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য যথা সময়ে দীনেন্দ্রনাথের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল—চারু বাবুর কাঁধে ভর দিয়া অস্থির পদে তিনি সে পুষ্পগৃহে উপনীত হইলেন।

দিলজান বলিল—"রাজা, আপনার দেশে তুমি রাজা, কিন্তু এ আমার রাজত্ব। কেমন মানে কি না?"

দীনেন্দ্র আসিয়াই "পানে দিলেন মন।" রুমালে মুখ মুছিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন—"আলবৎ"।

"তবে তাই রাজার হুকুমে আজ্ তোমার বন্ধনদশা। জরিমানা না দিলে খালাস নেই।"

এবং নিমা দিলজান সেই সুদীর্ঘ এবং কাহিল দেহ মোটা মোটা কোপলো গাছে দিয়া দীনেন্দ্রনাথকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া ফেলিল। দীনেন্দ্রের চেতনা লোপ হইবার বড়বেশী দেরি ছিল না, কিন্তু বন্ধনে পায়ে বাধা পড়ায় জরিমানার হুকুমটা যাহাতে একটু শীঘ্র দিতে হয়, সেজন্য মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দিলজান চারু বাবুর মুখে দৃষ্টি বিনিময় করিল—চারু ইশারায় বলিল 'বিশ হাজার।'

দিলজান বলিল, "দেখ্ রাজা, তোর অনেক অপরাধ মাপ করেছি, আজ জরিমানা হাজার মোহর!"

পরম হিতাকাঙ্ক্ষী চারুচন্দ্র কল্পিত রোষে বলিলেন "এ বড় অন্যায় তোমার দিলজান। আগে রাজা সার্বভৌম হোক্ তখন এসব করো। সেদিন জড়োয়া গহনায় দশ হাজার টাকা নিয়েছ—আজ আবার প্রায় বিশ হাজারের দাবি! এত হ্যাণ্ডনোট কাটতে আমি ভয় হয়।"

দিলজান ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—তোর কিরে গোলাম! দীনেন্দ্র বন্ধন যন্ত্রণা অনুভব করিয়া যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন—"আচ্ছা, দে দেও!"

চারু কক্ষান্তরে গিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিতে বসিল—দিলজান সঙ্গে সঙ্গে রহিল।

এমন সময়ে নীচে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। ডিটেক্‌টিভ সঙ্গে স্বয়ং ডোনাল্ড সাহেব আসিয়া উপস্থিত। দীনেন্দ্রনাথকে বন্দীদশায় দেখিয়া তিনি হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "দীনেন্দ্র ঢের বিরক্ত করিয়াছ। তোমার মা মৃত্যু শয্যায়, সংবাদটা আসিয়া যে খবর পাইবা নিজে আমি ইনষ্টিটিউটে গিয়াছিলাম। একেবারে অঘটনপাতে গেছ। এখন চল।"

দীনেন্দ্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"দিলজান্ সঙ্গে যাবে তো?"

তৎক্ষণে চারুচন্দ্র খিড়কীর পথে পটান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল।

সাধনা।

ডেপুটী-তত্ত্ব।

সে দিন দুস্তর পরীক্ষা-সাগর লঙ্ঘন করিয়া ডেপুটীত্ব প্রাপ্ত হই, সে দিন বড় আনন্দের দিন! সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজিও সে দিনের সে মধুর স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া আছে।

এ সংবাদ যখন শুনিলাম তখন আমি কলিকাতায়। পরোয়ানা পাইয়াই, একবার বাড়ী আসিলাম। ইচ্ছা, এখান হইতে কর্ম্ম-স্থানে যাইব। ইতিপূর্ব্বে আমাদের এ অঞ্চলে আর কেহ ডেপুটী হন নাই, কাজেই আমি হাকিম হইয়াছি সংবাদে আমাদের সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল! নিধু মণ্ডল, গিধু সেখ বলাবলি করিতে লাগিল, সেই সেদিনকার 'দা ঠাকুর' আসি, আমি কি না আজ 'ডিগ্‌নি-টিগ্‌নিসের কর্‌তা'! আর কি রক্ষা আছে! তখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাকে পাকে আশেপাশের লোকে আমার নিকট আসিয়া, কেহ বা দুটা কথা কহিয়া, কৃতার্থ হইতে লাগিল! 'পড়ো' পড়া রাখিয়া, চাষা লাঙ্গল ছাড়িয়া, রাখাল গরু ফেলিয়া আমার দিকে ছুটিল! বালিকা খেলা ভুলিয়া, জননী শিশু কাঁদাইয়া, গৃহিণী গৃহকাজ ছাড়িয়া, বধূ ঘোমটা আড়াল দিয়া আমায় দেখিতে লাগিল। আমি যেন সেই ব্রজবিহারী বংশীধারী বনমালী, আর এই গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা ডেপুটী-রবে-মুগ্ধা ব্রজাঙ্গনা! অন্তঃপুরেও দেখি সে রবে

গৃহিণীও আমার বিহ্বলা! তাঁর সেই গর্ব্ববিস্ফারিত নয়নযুগল যেন সদাই বলিতেছে,

"এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে।"

এইরূপে আমার ব্রজের লীলা-খেলা ফুরাইল, তখন মথুরায় চলিলাম! গিয়াই আমার অদৃষ্টে ডেপুটীর সিংহাসন জুটে নাই। গবর্ণমেণ্ট কয় মাস ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 'গোড়গড়ায়' ব্রেক করিয়া লইয়া তবে আমাকে অন্য জেলার ডেপুটীগিরিতে ছুড়িয়া দিলেন। এ সময়ের লাঞ্ছনায় প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হইত, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলাম এ কয়টা মাস ডেপুটীত্ব-রূপ স্বর্গে উঠিবার সোপান! কষ্ট করিয়া এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে কেমন করিয়া সে স্বর্গসুখ লাভ করিব?

তার পর ডেপুটীগিরির পালা!

ম্যাজিষ্ট্রেট যে কি 'চিজ' তা এই কয় মাসে আমি অনেকটা সনজাইনাছিলাম, সুতরাং নূতন কর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়াই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম! কিন্তু সাহেব বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া সে-দিন আর তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল না! আদেশ হইল কাল প্রাতে দেখা মিলিবে! আমার বাসা হইতে সাহেবের কুঠি প্রায় চার মাইল, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, আমি পরদিন ঠিক সময়ে হ্যাট কোটে চাক অঙ্গ শোভিত করিয়া অশ্বারোহণে, "নদী যথা ধায় সিন্ধুপানে" সাহেবের কুঠি অভিমুখে ছুটলাম। আমি একজন ডেপুটী, কিন্তু সাহেবের চাপরাশী, আমার বসিতে বলা দূরে যাক, একটা সেলামও করিল না! দু একটা কথায় বুঝিলাম, চাপরাশী সাহেবের মেজাজটাও গরম! ঠিক যেন মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত বালুকা-রেণু! ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশীরাও যে এক

একটী ক্ষুদ্র লাট সে অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু আমি যখন মহাদেবের সন্দর্শন-কামনায় আসিয়াছি, তখন নন্দীর মন তুষ্টি না করিলে চলিবে কেন? সাহেবের নিকট কার্ড পাঠাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরেই গম্ভীর মূর্ত্তিকে গম্ভীরতর করিয়া চাপরাশী আসিয়া জানাইল, মেম সাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন এখন আর সাহেবের দেখা মিলিবে না; আফিসের বেলা হইতেছিল, কাজেই শীঘ্র ফিরিতে হইল। ফিরিতে ফিরিতে বিষণ্ণ মনকে বুঝাইতে লাগিলাম,

"ডেপুটী হইতে গেলে সুখ দুখ সইতে হয়
একাজের এই রীতি, তোমা বলে শুধু নয়।"

ফিরিবার সময় কিছু ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলাম। তখন আর সে তেজ নাই! অশ্বরাজও যেন সেটী বুঝিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পোষাকটা আমার পুরা সাহেবি ঢংয়ের ছিল, হ্যাট কোট কলার বুট কিছুরই অভাব ছিল না, সাহেবির মধ্যে একটু খুঁৎ তা কেবল বর্ণে। রংটা আমার কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ ঘোর। আমি একটা মাঠের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, জনৈক রাখাল "ওরে সাহেব দেখ্‌বি আয়রে" বলিয়া সঙ্গীদের ডাকিতে ডাকিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু একটু তফাৎ হইতেই আমার সেই কৃষ্ণমূর্ত্তিখানি দেখিয়া, "না-রে-না, সাহেব নয়, এ সাহেবের সুমুন্ধি" বলিতে বলিতে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল! রাগের কথা বটে, কিন্তু আমার তখনকার মনের অবস্থায় রাগ হয় নাই, বরং হাসা হইয়াছিল! তোমরা শুনিয়া হয়ত হাসিবে, আমি কিন্তু সেই দিন হইতেই সাহেবি পোষাক সাহেবি ঢং ত্যাগ করিয়াছি!

তার পর ডেপুটীর আসনে বসিয়া রাজকার্য্য আরম্ভ করিলাম;

ম্যাজিষ্ট্রেট জয়েণ্ট সবাই ছিলেন, কিন্তু আমার খাটুনির ইয়ত্তা ছিল না! বেলা এগারটা হইতে রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত সমান ভাবে খাটিয়াও কাজের কূল পাইতাম না। আবগারি, ট্রেজারি, বিচার, সকল দিকই আমায় দেখিতে হইত, তাহাতেও সাহেবের মন পাইতাম না। কালেজ ছাড়িয়াই কাজে প্রবৃত্ত হই, কাজেই দয়া এবং বিবেকশক্তি তখনও সতেজ অবস্থায় ছিল, সাধ্যপক্ষে কাহাকেও অধিক সাজা দিতাম না। এ জন্য উপর হইতে বেশ একটু তিরস্কৃত হইলাম! বিচারপ্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ পাইলাম। ক্রমে আমার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল—অন্য আসামী দূরে থাক, পাঁচ আইনের আসামীও অল্পে রক্ষা পাইত না। একবার আসামী হইয়া অভিযুক্ত হইলে, আমার হাতে তার আর নিষ্কৃতি ছিল না। শীঘ্রই খুব কড়া হাকিম বলিয়া আমার নাম ছুটিল! উপরওয়ালারও যেন একটু সুদৃষ্টি পড়িল! কিন্তু হরিবোল হরি! আপীলে যে রায় বড় একটা কাহাল থাকে না! কেবল যে রায় উল্টাইয়া যায় তাই নয়, সেই রায়ের উপর জজ সাহেবের মন্তব্য দেখিয়াই চক্ষু স্থির! তখন আমি 'উভয় সঙ্কটে' পড়িলাম—

"এদিকে জাতি কুল আর দিকে কালা,
আমি দেখি কি কুল রাখি বিষম জ্বালা!"

ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ কুলই ছাড়িলাম; গঞ্জনার ভয় করিলাম না! এদিকে আবার কুল পাওয়া চাই ত!

আর একটা মহাসুখ এই 'ভূতোনলী' খাটুনির উপর বুড়া বয়সে পরীক্ষার জ্বালা——এত অধিকদিন কেহ দেয় নাই—আমার মতন করিয়া পরীক্ষা! মাইমুতার পরীক্ষাগ্নি জগদ্ধাত্রী সীতারও মাথা অসহ্য হইয়াছিল, পেটেরাদাদের ত্রাস তাও সইতে হয়।

এই স্থলে বলিয়া রাখি, কেবল আমিই যে প্রত্যহ কাছারিতে বিচার করিতাম তা নয়; আমার গৃহেও প্রত্যহ মেয়েদের একটা এজলাস বসিত। উকীল-মোক্তারেরও অভাব ছিল না. সেখানে উপস্থিত অনুপস্থিত অনেক আসামীর বিচারকার্য্য অবাধে চলিত। বিচারকর্ত্রী ওয়ারিশ ও অর্দ্ধাঙ্গিনীসূত্রে স্বয়ং আমার গৃহিণী। তিনি অটল ও নির্ব্বিকার চিত্তে রায় প্রকাশ করিতেন, যেমন না জানে

"উপরে আসীল নাই, নাইক জজের ভয়।"

বুঝি ডেপুটী হওয়ার চেয়ে ডেপুটী-গৃহিণী হওয়া অনেক সুখের!

বছর কয়েকের মধ্যেই আমাকে অনেকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটে ও জয়েন্টের অধীনে কাজ করিতে হইল। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের মেজাজ বুঝিতে না বুঝিতে আর একজন উপস্থিত! এ যে কি যন্ত্রণা, তাহা বুঝান বড় শক্ত! 'হিন্দু-রমণী' স্বামীর একান্ত নারী বলিয়া তাঁহার দোষ-গুণে অনেকে দুঃখিত! কিন্তু আমি ত দেখি, ডেপুটীর চেয়ে তাঁরা কোন অংশে স্বাধীনা! পরাধীনা হইলেও তাঁরা একটা মাত্র স্বামী অধীন! ইহা ভিন্ন সে স্বামীর মেজাজ বুঝিয়া চলা ত কঠিন নহে! দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল বটে, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে যৌবনে পঞ্চপতি লাভ করিয়াছিলেন, কাজেই পাঁচজনের মন যোগান তাঁহার তত কঠিন হয় নাই। কিন্তু আমাদের যে

"মন রে নব নিতুই নব"।

চিরকাল নূতনের মন কি নিত্য যোগাই বল! এ যে তাহা যোগান জোগান মেয়ের ভার।

দেশহিতৈষীগণ হিন্দু-রমণীর দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করুন! কবি তাঁহাদের দুঃখে, কবিতা লিখিতে অনুরোধ। কিন্তু কই এক নবম ডেপুটীর জন্যে ত কেহ কাঁদে না! এই আমাদের দেশের

কেশব কি বিদ্যাসাগর, "এ দুখ নাশিতে" এ পর্য্যন্ত কেহই ত অগ্রসর হলেন না! কি করি এখন মনের কষ্টে নিজেই বলি,

"দারুণ বিধাতা কেনরে আমারে
ভারতে পাঠাল ডেপুটী করেরে।
.. ..
কোথায় কংগ্রেস, সুরেন কি কর,
হয়ে অগ্রসর এ দুঃখ নাশরে।"

এত দুঃখ সত্ত্বেও ডেপুটীত্বে একটু সুখ ছিল, মনে মনে ভাবিতাম, হাকিম ত বটি! দশজনের নিকট একটু "পেগের বড়াই"ও ছিল! কিন্তু ছোটলাট ইলিয়াট বাহাদুর আমাদের সে ভুর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন! তিনি বলেন, ডেপুটী আবার হাকিম, তেলা পোকা আবার পাখী! এতদিন যে সুখের স্বপ্ন দেখিতাম, এখন তাও ভাঙ্গিয়াছে! এখন শুধু ভাবি,

"ডেপুটী বলিয়া এ তিন আঁখর
ভাবতে আনিল কে?
মধুর বলিয়া ছিনিয়া খাইনু
হিতায় তিতিল দে।

হায়।

ডেপুটী-সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়।।
কেবা নিরমিল ডেপুটীসাগর
নিরমল তার জল!
দুখের মকর যিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল।।
ম্যাজিষ্ট্রেট জ্বালা, কলের পিয়ালা
[illegible]

বাঁটা যে সকল,
ছে।।
দা লাগে গায়,
ঝি,
ই কুটু কবে,
।।
নহে ডেপুটী
যাই—
ব হয় ডেপুটী,
যাই।"

ত্তিবাস।

চয়িতা কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে
কৃত্তিবাসের কালনির্ণয় সম্বন্ধে
া হওয়ায়, আমরা তৎসম্বন্ধে
নে করি।
ই বলিতেছেন, "সাড়ে পাঁচ
া আদি কবি ও আদি লেখক
র নিকট ফুলিয়া গ্রামে প্রাদু-
ভাষা উভয়কেই পবিত্র করিয়া
ই বাঙ্গালার আদি কবি;
তিন শত কি আড়াই শত
ভাষেরই উহা অতি শুকতর ও

চণ্ডিদাসকে বাঙ্গালাভাষার
র পরমাত্মিক বলিয়া জানি-

তেন। কিন্তু লেখকের মতে তা ...জ্ঞাবর
ভ্রম"। এই গুরুতর ভ্রম অপনোদ... ত রামা-
য়ণকে ৫৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব... লেখক
যে সকল যুক্তি ও প্রমাণপরম্পরা ... আমরা
যথাযথ তাহার আলোচনায় প্রবৃ...
লেখক কৃত্তিবাসের বংশপরি... —ভরদ্বাজ
পৌত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে দশম পু... ৩৬৫
হওয়ায় বল্লালসেনের নিকট
উৎসাহ হইতে নবম এবং শ্রীহ...
ওঝা।" লেখকের মতে এই ...
কেন না, কৃত্তিবাস নিজেই ...
ওঝার নাতি।"

মুলজী গ্রন্থ পাঠে জানা যা...
পাধ্যায় কান্যকুব্জাগত শ্রীহর্ষের...
বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মুবারি বি...
এই মুবারিকে লেখক কৃত্তিবা...
রামায়ণবর্ণিত "মুবারি ওঝা"...
ইহার অর্থ যে কৃত্তিবাস মুরা...
যোগক্ষ কোন প্রমাণ প্রয়োগ...
মুরারিকে কৃত্তিবাসের পিতা...
উৎসাহকে শ্রীহর্ষ হইতে ১...

লেখক পুনশ্চ বলিতেছে...
কুলীনদের মেল বন্ধন হয়...
হইয়াছিল।" ইহার প্রমাণ...

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যা...

জন্ম হে ৪০৮ বৎসর পূর্ব্বে। চৈতন্যদেবের সমবয়স্ক ও সমপাঠী ছিলেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। এই রঘুনন্দনের পিতামহের জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ মিশ্র দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধনকালীন উপস্থিত থাকিয়া মহাবংশ নামে কুলীনদিগের বংশাবলী রচনা করেন, ৬। অতএব চৈতন্য ও রঘুনন্দন হইতে তৃতীয় পুরুষ দেবীবর কর্ত্তৃক কুলীনদিগের মেলবন্ধন হয়। ঐ মেলবন্ধনের সময় আর উপস্থিত ছিলেন ফুলিয়া মেলের আদি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য। এই গঙ্গানন্দ হইতেছেন, কৃত্তিবাসের কনিষ্ঠ অনিরুদ্ধের প্রপৌত্র। সুতরাং কৃত্তিবাস হইতেছেন, গঙ্গানন্দ হইতে ঊর্দ্ধে তৃতীয় পুরুষ। তাহা হইলে, চৈতন্য ও রঘুনন্দন হইতে ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত হইতেছে তিন পুরুষ এবং গঙ্গানন্দের ঊর্দ্ধে কৃত্তিবাস ও অনিরুদ্ধ পর্য্যন্ত হইতেছে তিন পুরুষ। সুতরাং একত্র চৈতন্য ও রঘুনন্দন হইতে কৃত্তিবাস ও অনিরুদ্ধ পর্য্যন্ত হইল ছয় পুরুষ। ছয় পুরুষে হইতেছে ১৭৪ বৎসর। এখন চৈতন্যের জন্ম হইয়াছে ৪০৮ বৎসর পূর্ব্বে। অতএব ঐ ৪০৮ বৎসরে ১৭৪ যোগ করিলে, ৫৮২ বৎসর হয়। সুতরাং উহাই হইতেছে কৃত্তিবাসের উদয়কাল। রামায়ণেই কথিত আছে যে, কৃত্তিবাস অতি বৃদ্ধ ও পরাগ্রহ অবস্থায় রামায়ণ রচনা করেন। তাহা হইলে সম্ভবতঃ ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বা তাহারও কিঞ্চিৎ আগে বাঙ্গলা রামায়ণ রচিত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হয়।"

লেখকের ঐ সকল সিদ্ধান্ত নিতান্তই ইতিহাসবিরুদ্ধ। তিনি বলিতেছেন, "চৈতন্য ও রঘুনন্দন হইতে তৃতীয় পুরুষে দেবীবর কর্ত্তৃক কুলীনদিগের মেলবন্ধ হয়।" দেবীবরের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে এই একটীমাত্র প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি শ্রীচৈতন্যের সহচর নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর

সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণকে বীরভদ্রী থাকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বীরভদ্র গোস্বামী চৈতন্যের পরবর্ত্তী, এবং সম্ভবতঃ তিনি ১৫১০ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। † দেবীবর বীরভদ্রের সমকালীন, সুতরাং তিনি বর্ত্তমান সময়ের অন্ততঃ ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৬৫ শকে কুলীনদিগের মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যাইতে পারে।

দেবীবরের এই কালনির্ণয়, আমরা অন্যরূপ প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতেছি।

খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিত, দেবীবরের মাসতুত ভ্রাতা ও সমবয়স্ক ছিলেন। যোগেশ্বর কৌলীন্য অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া দেবীবরের গৃহে ভোজন করেন নাই, এই সূত্রে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের ফল, কুলীনগণের মেলবন্ধন বা হুগলীবন্ধন। যোগেশ্বরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া দেবীবর কুলীনদের দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং সমদোষাশ্রিত ব্যক্তিগণকে এক এক মেল বা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করেন। এইরূপে সমগ্র কুলীনসমাজকে তিনি ৩৬ মেলে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে অধ-

† "নরোত্তমবিলাস" গ্রন্থে লিখিত আছে। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরোধানের পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। রূপ ও সনাতন ১৪৯০ শকাব্দে কি তাহার দুই চারি বৎসর অগ্রপশ্চাৎ সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীনিবাস ইহার সমকাল পরেই, অন্ততঃ, ১৪৯৫ শকাব্দে বৃন্দাবনে আগমন করিয়া থাকিবেন। তিনি বৃন্দাবনে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বঙ্গদেশে আইসেন ও মহা উৎসাহের সহিত ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করেন। তৎপরে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের পুত্রগণ যখন অল্পবয়স্ক, সেই সময় বীরভদ্র গোস্বামী শ্রীনিবাসের মাতামহালয় জাতিগ্রামে আগমন করিয়া এই পুত্রগণকে দেখিয়াছিলেন। এই প্রমাণ অনুসারে বীরভদ্র অন্ততঃ ১৫১০ শকাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে।

গুন ২: পুরুষ এবং মুরারির সমান পর্য্যায়ের লোক। ১৪শ পর্য্যায়-ভুক্ত প্রথম কুলীন উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র আহিত, আহিতে। অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র মুরারি। আর আহিতসহোদর মহাদেবের অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র যোগেশ্বর পণ্ডিত, সুতরাং মুরারি ও যোগেশ্বর সমান পর্য্যায়ভুক্ত। লেখক মহাশয়ের মতানুসারে এই মুরারিই যদি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পিতামহ মুরারি ওঝা হন, তাহা হইলেও "কৃত্তিবাসের সময়েও দেবীবর কর্ত্তৃক কুলীনদের মেলবন্ধন হয় নাই। তাঁহার ৯৫ পুরুষ পরে তাহা হইয়াছিল" একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? লেখক প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রধান যে কুলিয়া মেল, কৃত্তিবাসের কনিষ্ঠ অনিরুদ্ধের প্রপৌত্র গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য হইতেই তাহার প্রথম।" [গঙ্গাধর নয়, গঙ্গানন্দ; বোধ হয় স্বপ্নশতঃ গঙ্গাধর লিখিত হইয়াছে।] অন্যত্র আবার বলিয়াছেন, মুরারির পুত্র বনমালী, বনমালীর তিন পুত্র—কৃত্তিবাস, অনিরুদ্ধ ও মদন।" লেখক অনিরুদ্ধকে মুরারির পৌত্র বলিতেছেন, কিন্তু মিশ্রগ্রন্থে অনিরুদ্ধ মুরারির পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে। গঙ্গানন্দ মেলবন্ধনের প্রথম কুলীন নহেন। মুরারির প্রপৌত্র, অনিরুদ্ধের পৌত্র এবং গঙ্গানন্দের পিতা ত্রয়োবিংশ পুরুষ মনোহর মুখোপাধ্যায় মেলবন্ধনের সময় বর্ত্তমান। ইহার পুত্রগণও এ সময় উপস্থিত ছিলেন বোধ হয়, তাহাদের নামও মিশ্রগ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—"হরেনো জগদানন্দো গঙ্গানন্দোকুলে কৃতী।" এতদ্বারা মিশ্রগ্রন্থ-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ মিশ্রের আরও আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, মুরারি, দেবীবরের সমবয়স্ক যোগেশ্বর পণ্ডিতের সমান পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন, অথচ তাঁহার প্রপৌত্র মনোহরের সময় মেলবন্ধন হয়, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, মুরারি যোগেশ্বরের সমান পর্য্যায়ের হইলেও সমান-

বৎসর ছিলেন না। তাঁহার প্রপৌত্র মনোহর ও বৃদ্ধ প্রপৌত্র গঙ্গানন্দ প্রভৃতি মেলবন্ধনের সময় উপস্থিত ছিলেন। মনোহরের পিতা লক্ষ্মীধরের সময় হইতেই সর্ব্বদারী বিবাহ রহিত হইয়াছিল।

মেলবন্ধনের সময়ে, যোগেশ্বর পণ্ডিত, দিনকর চট্টোপাধ্যায়, হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। * ইহাঁদিগের অধস্তন পুরুষ গণনা করিলে আজ পর্য্যন্ত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সন্ততির অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফুলিয়া মেলভুক্ত অবনথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ-লেখকের পূর্ব্বপুরুষ। প্রবন্ধলেখক হইতে গঙ্গানন্দ ঊর্দ্ধে ৯ম পুরুষ ও পঞ্চানন ১০ম পুরুষ। তবে মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কোন কোন শাখার অধস্তন বংশধরগণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ২৭ সাতাশ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম অবধারণ করিলে ১৩ পুরুষে ৩৫১ বৎসর হয়। সুতরাং আমরা ইতিপূর্ব্বে ৩৫০ পূর্ব্বে দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধনের যে সময় নিরূপণ করিয়াছি, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

কৃত্তিবাস কবির সময় নিরূপণ করিতে গিয়া মেঘনাদ বধ নাটককে টানাটানি কেন, পাঠকগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিলেই তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন।

দেবীবর ৩৬টী মেল বা শ্রেণীতে তদানীন্তন কুলীনগণকে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে ফুলিয়া মেলের প্রাধান্য ও সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই কারণে ভদ্রসমাজে ফুলিয়া গ্রামও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ফুলিয়া মেলের কৌলীন্যমর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া ফুলিয়া গ্রামও

* "যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরিবন্দ্যধরস্তথা।
পঞ্চাননো মুখোপশ্চ বড়েতে টেকমেলকাঃ॥"
প্রত্যানন্দ মিশ্র।

স্বর্গতুল্য পবিত্র স্থান, অনেকে এইরূপ বিবেচনা করিতেন। এই নিমিত্ত কবি কৃত্তিবাসও স্বীয় জন্মভূমির গৌরব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন,—

"স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ার নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥"

আরণ্যকাণ্ড।

দেবীবরের মেলবন্ধনের পরে ফুলিয়া গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং দেবীবরের উত্তরকালে যে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই নবদ্বীপ বঙ্গদেশ মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ও তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সময়কে বাঙ্গালার প্রকৃত গৌরবের সময় বলা যাইতে পারে। এই সময়েই চৈতন্যদেব প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, এই সময়েই স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্মৃতিশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া হিন্দুসমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন; এই সময়েই বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি তর্ককেশরী পণ্ডিতগণের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আন্দোলন এবং আলোচনা দ্বারা নবদ্বীপ দ্বিতীয় কাশীধামতুল্য জ্ঞানচর্চ্চায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এই সমুদায় কারণে কবি কৃত্তিবাস নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সারস্বরূপে বর্ণনা করিয়া তাহার গৌরব প্রকাশ পাইয়াছেন। যথা —

"লইয়া যান আনন্দিত হইয়া।
মিলিল গঙ্গা তীর্থ সে-নদীয়া॥
ধন্য সাব নবদ্বীপ গ্রাম।
রাত্রি পহা তথা করেন বিশ্রাম॥

বসে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগসমান।
সেবান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ॥"
আদিকাণ্ড।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"গঙ্গাবতরণ স্থলে তিনি [কৃত্তিবাস] মেড়তলা, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আকনামাহেশ প্রভৃতি মূল রামায়ণে অনুল্লিখিত কয়েকটী গ্রামের নামোল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে সপ্তদ্বীপের সারবান বলিয়া নবদ্বীপের প্রশংসা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের উৎপত্তিস্থান এবং স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িকদিগের সমাজ-স্থান বলিয়া উহার ঐরূপ প্রশংসা করা অসম্ভব বোধ হয় না। কল কথা কৃত্তিবাস চৈতন্যদেবের পরসাময়িক বলিয়াই বিবেচিত।"

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন, এবং কোন্ সময়ে রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার কিছুই জানা যায় না। আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে সম্ভবতঃ ১৪৬৫ শকে দেবীবর কৌলীন্য সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ইহার কিছু দিন পরে, অন্ততঃ ১৪৮০ শকে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

লেখক মহাশয় কৃত্তিবাসের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, এবং এ জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদিগের নিকট ভ্রমপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায়, আমরা তাহাদিগের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

লেখকের সহিত আমাদের মতভেদও বড় সামান্য নহে। ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কবিকে তিনি ৫৫০ বৎসরের বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া এতদিন সকলের নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছেন, লেখক তাঁহাদের গৌরবান্বিত সিংহাসনে কৃত্তিবাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া অন্ন সাহসের পরিচয় দেন নাই।

ইতিহাসাভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস বাঙ্গালার আদি কবি ও আদি লেখক হইলেও তাহারা কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহাদিগকে গীতরচয়িতা বলা যাইতে পারে। ইহাঁদিগের সমসাময়িক গুণরাজ খাঁন উপাধিযুক্ত মালাধর বসুই বাঙ্গালার আদিকবি এবং তৎপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থই বঙ্গভাষার আদিকাব্য। ১৩৯৫ শকে আরম্ভ হইয়া ১৪০২ শকে কাব্য রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। মালাধর বসু আদিশূরানীত কায়স্থ পঞ্চকের অন্যতম দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। লেখকের মতানুসারে কৃত্তিবাস যদি মুরারির পৌত্র হন, তাহা হইলে তিনি শ্রীহর্ষ হইতে নিম্নতন দ্বাবিংশ পুরুষ। সুতরাং কৃত্তিবাস, মালাধর অপেক্ষা অনেক আধুনিক, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মালাধর বসু চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিঃসংশয় রূপে বাঙ্গালার আদিকবি।

১২৯৯ সালের কার্ত্তিক মাসের "সাধনা" এবং বিগত ২১শে বৈশাখের "সাপ্তাহিক অনুসন্ধান" পত্রিকায় 'বাঙ্গালার আদি কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে মালাধর বসু ও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন।

বুদ্ধ চরিত।

কারাগার হইতে পলায়নকালে বন্দী যে শৃঙ্খলভার বহন করিয়া থাকে দৈব পথিমধ্যে তাহা যেমন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যায়, সিদ্ধার্থ সেই রূপ সংসাররূপ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া সংসারের শৃঙ্খলরাশি একটি একটি ভগ্ন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেখানে সুযোগ পাইলেন সেই স্থানে একটি শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া শরীরকে লঘু করিলেন। কিন্তু উরুবিল্ব গ্রামে আসিয়া দেখেন যে, এখনও সেই শৃঙ্খলের অবশেষ আছে। সে সমুদয় সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিতে না পারিলে তাঁহার আর শান্তি নাই। ঋষিদিগের নিকট তিনি যে সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন এখন সেই সাধন আবার আরম্ভ করিতে হইল। তবে সে সাধন আর এ সাধনে প্রভেদ ছিল। তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে, নিষ্কাম হইয়া শরীরকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। দুঃখ চাহি না, সুখও চাই না, নরক চাই না, স্বর্গও চাই না, বিপদ চাই না, সম্পদও চাই না, কিছুই চাই না। কেবল সেই অবস্থাটি চাই যে অবস্থাতে মন এই সকলের একেবারে অতীত হয়। সে অবস্থা পাওয়া যায় ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাহা কি, কিসে কি করিলে তাহা পাওয়া যায় এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিলেন। এখনও ছয় বৎসর ধরিয়া ঘোর সাধন করিতে হইবে। সিদ্ধার্থ, ধন্য তোমার বল, ধন্য তোমার ধৈর্য্য, ধন্য তোমার সাহস। এই ছয় বৎসর কাল নরনারী ও সমুদয় দেবলোক তোমার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে। তোমার পরীক্ষার মীমাংসার উপর জগতের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।

নৈরঞ্জনার তীরে একটি বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব তপস্যা বা সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল পাঁচ জন শিষ্য ছিল। কিন্তু তিনি নিতান্ত অসহায়ও ছিলেন না। যে দিন হইতে তিনি কপিলবস্তু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে শুদ্ধোদনের দূত সকল তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিল। তাহারা নিরন্তর সন্তানের কুশল সংবাদ দিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত রাখিত। সিদ্ধার্থের সাধন ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি অন্ন পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে এক-মুষ্টি তণ্ডুল, তাহার পর একমুষ্টি তিল এই তাঁহার একমাত্র আহার হইল। ইহাও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট কঠোর বোধ হইল না। অবশেষে তিনি সকল প্রকার আহার পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তী দূতেরা এই সংবাদ সত্বর শুদ্ধোদনের নিকট প্রেরণ করিল। কপিল-বস্তুর রাজপ্রাসাদে এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র রোদনধ্বনি উত্থিত হইল। যশোধরা তাহা শুনিয়া বেশভূষাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে সিদ্ধার্থ এককালে শ্রীহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিল, তাঁহার অঙ্গ-সমূহ কেবলমাত্র অস্থিতে পরিণত হইল, এবং পদদ্বয়ে এমন বল রহিল না যে তিনি এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের যে সকল লক্ষণ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে সকলই লোপ পাইল। এক দিন এরূপ দুর্গতি হইল যে, তিনি আর দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পিতার ভৃত্যেরা সত্বর সেই সংবাদ কপিলবস্তু নগরে প্রেরণ করিল এবং যে পাঁচ জন শিষ্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল তাহাদের মনে স্পষ্ট সংস্কার হইল যে, সিদ্ধার্থ প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন। ক্ষণকাল পরেই তিনি চেতনা লাভ করিলেন। এইবার তাঁহার অঙ্গের শেষ শৃঙ্খলটি যেন আপনাআপনি পড়িয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শরীরকে অনর্থক কষ্ট দিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। শরীরের সঙ্গে মনের যোগ আছে বটে; কিন্তু মোক্ষার্থী হইলে মানসিক বল আবশ্যক। তাহা শরীরকে পীড়ন করিলে পাওয়া যায় না। এই ভাবিয়া তিনি আহার করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কোন নিকটস্থ গ্রামে খাদ্য ভিক্ষা করিয়া ক্ষুধার উপশম হইলে আবার তাঁহার পূর্ব্বকার বল ফিরিয়া আসিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে তাঁহার গাত্রে কোন বস্ত্র নাই। শ্মশানে একটি মৃতা বালিকা পড়িয়া ছিল। তিনি তাহার অঙ্গ হইতে কাপড়খানি লইয়া নিজে পরিধান করিলেন। অনেক দিনের শ্রান্তি অনাহারের পর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর কিঞ্চিন্মাত্র আহার উদরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার আকার যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হইয়াছিল, যেহেতু যখন গ্রামের বালক বালিকারা সেইখানে খেলা করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল, তখন তাঁহাকে ভূত ভাবিয়া তাঁহার গাত্রে কর্দ্দম ইষ্টক খড় প্রভৃতি ফেলিতে লাগিল।

এদিকে পাঁচজন শিষ্য সিদ্ধার্থের আহার গ্রহণ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে বলিতে লাগিল—"যাহা মনে করিয়াছিলাম ইনি ত তাহা নহেন। যখন খাদ্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তখন দেখিতেছি ইহাঁর দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, ইহাঁকে গুরু বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা যায়! অতএব, চল, ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা স্থানান্তরে যাই।" এই ভাবিয়া তাহারা সেই স্থান ছাড়িয়া বারাণসীধামে মৃগদাব কাননে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি শরীরের রক্ত দিয়া একটি একটি মহামূল্য সত্য লাভ করিতেছিলেন। এবং তিনি যত শিক্ষা করিতেছিলেন, ততই তাঁহার বিশ্বাস, উচ্চ আশা, উদ্যম ও একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এখন শেষ শৃঙ্খলটি কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এতদিন ধারণা ছিল যে, শরীরের ভিতর দিয়া মনে উপস্থিত হওয়া যায়, অতএব তাঁহার সাধন শরীরের ভিতর দিয়াই হইতেছিল। এখন সেই ভ্রমটি দূর হইয়া গেল। তাঁহার মন আর শরীরশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চাহিল না। প্রকৃতির পক্ষী আর পিঞ্জরে থাকিতে পারিল না। প্রকৃতির ভিতরে প্রকৃতির আকাশে সে বিরাজ করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থ সেই পক্ষীকে এখন উড়াইয়া দিলেন—আকাশে উড়িতে উড়িতে সে এইবার নিত্য মোক্ষধামে উপস্থিত হইবে।

পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধার্থ সেনানি বলিয়া এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামে সেনা নামক কোন ধনী সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। সেনার সুজাতা নাম্নী এক কন্যা ছিল। সুজাতা যৌবনাবস্থায় উপনীতা হইলে একদিন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া সেই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন—"হে দেব, আমি যদি একজন ভাল স্বামী পাই এবং আমার যদি একটি পুত্র সন্তান হয়, তাহা হইলে আমার এই প্রতিজ্ঞা রহিল যে, আমি লক্ষ মুদ্রা দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দান করিব এবং এই বৃক্ষতলে তোমার পূজা দিব।" বৃক্ষদেবতা সুজাতার প্রার্থনামত বরদান করিলেন। কালক্রমে তাহার উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ হইল এবং কালক্রমে একটি পুত্রসন্তানও হইল। সুজাতা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া এখন পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গৃহে অনেকগুলি গাভী ছিল।

সুজাতা তাহার মধ্যে এক সহস্র গাভীকে পৃথক রাখিয়া তাহাদিগকে নানা মতে পুষ্ট করাইতে লাগিলেন। সেই এক সহস্র গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া আর পাঁচ শত গাভীকে তাহা পান করাইলেন। আবার সেই পাঁচ শত গাভীর দুগ্ধে অপর আড়াই শত গাভী পুষ্ট হইল। এইরূপে অবশেষে আটটি গাভী রহিল। ইহার যে দুগ্ধ দিল তাহা লইয়া সুজাতা অতি উপাদেয়, সুমিষ্ট পরমান্ন প্রস্তুত করিলেন। পূজার সময় উপস্থিত হইলে সুজাতা তাঁহার সুনামা নাম্নী দাসীকে সেই অশ্বত্থতল পরিষ্কার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এখন ঠিক সেই সময়ে সিদ্ধার্থ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বরাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি সহাস্য বদনে বলিয়া উঠিলেন—"অদ্য আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইব।" এই বলিয়া কমণ্ডলু হস্তে লইয়া ভিক্ষা করিতে নির্গত হইলে কিয়ৎক্ষণ সেই অশ্বত্থতলে বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সুনামা সেইস্থলে উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থের সৌন্দর্য্য কান্তি ও তপ্ত কাঞ্চন শরীর দেখিয়া সুনামার মনে হইল যে, তবে বুঝি বৃক্ষদেবতা এইরূপ ধারণ করিয়া সুজাতার পূজা গ্রহণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া সুজাতাকে সকল কথা বলিল। সুজাতার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। সেই মুহূর্ত্তে তিনি সুনামাকে বিবিধ অলঙ্কার দান করিয়া এবং আপনিও বিশেষরূপে বেশভূষায় সুশোভিতা হইয়া একটি স্বর্ণপাত্রে পরমান্ন এবং আর একটিতে সুগন্ধ জল মস্তকে স্থাপন করিয়া অশ্বত্থতলে উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণপাত্র ভূমিতলে রাখিয়া সুজাতা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সিদ্ধার্থকে বলিলেন—"হে দেব, আমি এই সুমিষ্ট পরমান্ন এবং সুবর্ণপাত্রটি আপনাকে দান করিতে ইচ্ছা করি।

আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।" সিদ্ধার্থ তথাস্তু বলিয়া সুজাতা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সিদ্ধার্থ সুবর্ণপাত্র হস্তে লইয়া নৈরঞ্জনার তীরে উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় স্নানাদি সম্পাদনান্তে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নদীকূলে সেই স্বর্ণপাত্রস্থ উৎকৃষ্ট পরমান্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভোজনান্তে তাঁহার মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইল;—'আমি এই স্বর্ণপাত্রটি নদীর বক্ষে নিক্ষেপ করিতেছি। যদি আমি অদ্যই বুদ্ধত্ব লাভ করি, তাহা হইলে যেন পাত্রটি জলে নিমগ্ন না হইয়া ভাসিতে থাকে। কথিত আছে যে সেই স্বর্ণপাত্র না ডুবিয়া ভাসিতেই লাগিল।

নৈরঞ্জনার তীরে একটি শালবন ছিল। সন্ধ্যাকালে সিদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। সেইখানে একটি উচ্চভূমি নির্ব্বাচন করিয়া তাহা লতা পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া একটি আসন করিলেন। তাহার পরে তিনি বলিলেন—আমি এই স্থানে এখন সাধনে নিযুক্ত হইলাম। যদি আমি প্রকৃত জ্ঞান না পাই, তাহা হইলে আমার অস্থি চর্ম্ম যেন এই স্থানেই সংলগ্ন হইয়া যায় এবং আমার রক্তস্রোত যেন এককালে শুষ্ক হইয়া পড়ে।' তাহার পর একটি অশ্বত্থবৃক্ষকে পশ্চাতে রাখিয়া, পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া তিনি যোগাসনে সেই আলোচনায় উপবিষ্ট হইলেন।

এই একটি উপকথা বলিয়াও বলা যাইতে পারে। তবে মহাপুরুষদিগের ঐ সকল কথা মিথ্যা বা না। তাঁহারা অনেক সময়ে সাধারণ ঘটনার দ্বারা সঙ্কেতিত হন। বর্ত্তমান লেখক কখনো এইরূপে পথকাল পাকে নি না সাধারণ করিয়াছিলেন। এ দিন তিনি একটি ছিন্ন হাত অবিকা বলিলেন আমি এই খড়্গ দ্বারা ঐ সমস্ত কর্ম্মের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছি। যদি ইহা ফিরে নিয়া আসে তাহা হইলে পরকাল আছে, নচেৎ নাই। বাস্তবিক ছিনটি ফিরিয়া।

রাজা ও প্রজা।

সিভিলিয়ান রাউটি সাহেব আইন লঙ্ঘন পূর্ব্বক উড়িষ্যার কোন এক জমিদারকে অপমান ও পীড়ন করাতে তৎকালীন লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব অন্যায়কারীকে এক বৎসরের জন্য নিগৃহীত করিয়াছিলেন।

ভাবিয়া দেখিলে ব্রিটিশ শাসনাধীনে এরূপ ঘটনা আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হওয়া উচিত ছিল না—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সাধারণের নিকট এই ন্যায় বিচারটি আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই কারণে মূঢ়মতি সাধারণ কিছু সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনতিকাল পরেই ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব যখন যথা সময়ে এলিয়ট্ সাহেবকে তাঁহার গদি ছাড়িয়া দিলেন তখন এলিয়ট্ আসিয়া ম্যাক্‌ডোনেলের বিচার লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাউটিকে নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন আবার মূঢ়মতি সাধারণ সবিশেষ শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। কর্ত্তাই জানেন এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন, আমরা কেবল অন্ধকারে অনুমান করিয়া মরিতেছি মাত্র। এমন হইতে পারে যে, সিভিলিয়ানের প্রেষ্টীজ্ সিভিলিয়ান্ রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেটা ঠিক হইল না। কারণ, এই ঘটনায় সাধারণের নিকট ম্যাক্‌ডোনেলের, এমন কি, গবর্মেণ্টের প্রেস্‌টীজ্ নষ্ট হইল।

অনুমান করিতে গিয়া নানা লোক নানা কথা বলিতেছে,—তাহার সব কথাই মিথ্যা হইতে পারে! মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, গবর্মেণ্টের পলিসি গবর্মেণ্টই জানেন, আমরা সেই পলিসির দ্বারা পরিচালিত অন্ধ পুত্তলিকা মাত্র।

সেই কারণে, আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের কর্তৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির ন্যায়ান্যায় বিচারে আমরা যে অকস্মাৎ অতিমাত্র হর্ষশোক প্রকাশ করিয়া থাকি সে আমাদের মোহবশতঃ। যেখানে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব এবং মর্জ্জির উপরে আমাদের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করিতেছে সেখানে ভাল এবং মন্দ, ন্যায় এবং অন্যায় উভয়ই আকস্মিক ক্ষণিক ঘটনা মাত্র। ম্যাক্‌ডোনেল্‌ সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, এলিয়েট্‌ সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, আমরা নিতান্তই উপলক্ষ্য।

তথাপি, আঘাতে ব্যথিত এবং আদরে সুখী না হইয়া আমরা থাকিতে পারি না। কিন্তু কিরূপ হইলে আমাদের যথার্থ সুখের এবং জাতীয় গৌরবের কারণ হয় তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সে আর কিছুই নহে,– যখন আমাদের সাধারণের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ এমন সুতীব্র এবং সচেতন হইয়া উঠিবে যে, অপমানে অন্যায়ে আমরা সকলে মিলিয়া যথার্থ বেদনা বোধ করিতে থাকিব এবং সেই ন্যায়ান্যায়বোধের খাতির রক্ষা করা গবর্মেণ্টের একটা পলিসির মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইবে তখন আমরা যথার্থ আত্মরক্ষা করিতে পারিব।

সাধারণতঃ, ধর্ম্মবুদ্ধি কর্ম্মবুদ্ধি লোকনিন্দা সব কটায় মিলিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে চালনা করে। আমাদের গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্যনীতি অনেকটা পরিমাণে কেবলমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ম্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতেছে, প্রজাদিগের ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত তাহার যোগ অতিশয় অল্প।

সকলেই জানেন ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত কর্ম্মবুদ্ধির বিরোধ বাধিলে

অনেক সময় শেষোক্ত শক্তিটিরই জয় হইয়া থাকে, সেই দ্বন্দ্বের সময় বাহিরের লোকের জ্ঞানোজ্জ্বল বিবেক ধর্ম্মের সহায় হইয়া তাহাকে সবল করিয়া তোলে। তখন দেখিব, প্রজার নিন্দা নামক শক্তি গবর্মেণ্টের রাজকার্য্যের মধ্যে আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে তখন আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব।

এই লোকনিন্দা না থাকাতে ভারতবর্ষীয় ইংরাজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ক্রমে অলক্ষিতভাবে এত শিথিল ও বিকৃত হইয়া আসে যে, ইংলণ্ড-বাসী ইংরাজের নৈতিক আদর্শ হইতে তাঁহাদের আদর্শের বিজাতীয় প্রভেদ হইতে থাকে। সেই কারণে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় ইংরাজ একদিকে আমাদিগকে ঘৃণা করে অপরদিকে স্বদেশীয় ইংরাজের সভ্যতার প্রতিও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, যেন উভয়েই তাহার অনাত্মীয়।

ইহার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে একটি কারণ এই যে, ইংলণ্ডে যে সমাজনিন্দা ইংরাজকে সর্ব্বদাই বিশেষ কর্ত্তব্যপথে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে ভারতবর্ষে তাহা অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ তাহার প্রভাব বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহার উপরে আবার আমাদের সহিত ইংরাজের অল্পবস্তু স্বার্থের সম্পর্ক, এবং আমাদের প্রতি তাহাদের স্বজাতীয়ত্বের নমতা বন্ধন নাই, সুতরাং এখানে কর্ত্তব্যবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ইংরাজের পক্ষে নানা কারণে কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য স্বার্থের সহিত, প্রভুতাগর্ব্বের সহিত, পরাধীন দুর্ব্বল জাতির নৈতিক আদর্শের সহিত, পরজাতি-পীড়নতন্ত্রের বিবিধ কুটিলতার সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র নূতন কর্ত্তব্য-নীতি গঠিত হইতে থাকে, তাহাকে অনেক সময় ইংলণ্ডের ইংরাজ ভাল করিয়া চেনে না।

কোন কোন প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবর্ষীয় ইংরাজ এই নূতন পদার্থটিকে ইংলণ্ডে ভাল রূপে পরিচিত করাইবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিভাবলে দেখাইতেছেন এই নূতন পদার্থের নূতনত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বাড্‌ইয়ার্ড্ কিপ্লিঙ্গের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাবলে তিনি ইংরাজের কল্পনাচক্ষে প্রাচ্যদেশকে একটি বৃহৎ পশুশালার মত দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের ইংরাজকে বুঝাইতেছেন ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট একটি সার্কাস্ কম্পানি। তাঁহারা নানা জাতীয় বিচিত্র অপরূপ জন্তুকে সভ্য জগৎসমক্ষে সুনিপুণভাবে নৃত্য করাইতেছেন; একবার সতর্ক অনিমেষ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেই সব কটা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে। সুতীক্ষ্ণ কৌতূহলের সহিত এই জন্তুদিগের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথাপরিমাণে চাবুকের ভয় এবং অস্থিখণ্ডের প্রলোভন রাখিতে হইবে, এবং কিয়ৎপরিমাণে পশুবাৎসল্যেরও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নীতি প্রীতি সভ্যতা আনিতে গেলে সার্কাস্ রক্ষা করা দুষ্কর হইবে এবং অধিকারী মহাশয়ের পক্ষেও বিপদের সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বলে প্রবল মনুষ্যজন্তুদিগকে শাসনে সংযত রাখিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলির নির্দ্দেশে তাহাদিগকে নিরীহনৃত্যে প্রবৃত্ত করার ছবিটি ইংরাজের কাছে কৌতুকজনক মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইবার কথা। ইহাতে ইংরাজের মনে নূতনত্বের কৌতূহল এবং স্বজাতিগর্ব্বের সঞ্চার করে এবং আসন্ন বিপদকে শাসনে রাখিবার যে একটি সুতীব্র আনন্দ আছে তাহাও ইংরাজপ্রকৃতির নিকট পরম উপাদেয়রূপে প্রতীয়মান হয়।

এদিকে ইংলণ্ডে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের দলও দিনে দিনে বাড়িয়া

উঠিতেছে। অ্যাংলোইণ্ডিয়ানের সাহিত্যও বিস্তার লাভ করিতেছে। ইংলণ্ডের ভূমিতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মত ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া পাপোপরিত হইতেছে। এই স্থলে ভাষানুরোধে একথাও বলিয়া রাখা উচিত অনেক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান্ ভারতকার্য্য হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া নিঃসহায় ভারতবাসীদের প্রতি পরম হিতৈষিতা প্রচার করিতেছেন।

এই সকল কারণে স্বদেশস্থ ইংরাজের মধ্যেও একদল সন্দেহ করিতেছেন যে, তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলেন তাহার অধিকাংশই প্রাচ্যদেশীয় ভিন্নজাতীয় জীবসকলের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে কুইক্সটোচিত বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয় কি না, তাহাতে দ্বীপবাসী সভ্যজাতির বোধশক্তির দুর্বলতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় কি না, এবং তাহাতে ভিন্ন জাতীয় জীবের অনিষ্ট হয় কি না। হর্বর্ট স্পেন্সর প্রভৃতি ইংরাজ দার্শনিকের মত এই যে, সভ্যতার তারতম্য অনুসারে নৈতিক আদর্শের তারতম্য কেবল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা নহে, অভিব্যক্তির নিয়মে তাহা আবশ্যক।

এই সকল মতের সত্যাসত্য অন্য সময় বিচার হইবে আপাততঃ এইটুকু বলিতে পারি ইহার ফল আমাদের পক্ষে বড় পীড়াজনক। বেহার প্রদেশে গাছে ছাপ হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরাজ কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনরূপেই যথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে উহাদিগকে কেবলমাত্র ন্যায়ের জোরে ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে। এ সকল কথা পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল যেন অধিকতর মুক্তকণ্ঠে বলা হইতেছে।

আমাদের বক্তব্য এই, যদি না স্বীকার করা যায় যে, স্বাধী-

সভ্যতাপ্রিয় য়ুরোপের কর্ত্তব্যনীতি চিরস্বাধীন প্রাচ্যদেশে সর্ব্বথা উপযোগী নহে তথাপি যখন আমাদের রাজা য়ুরোপীয় তখন প্রাচ্যদেশের স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে দুরাশামাত্র। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হইত তবে এই প্রাচ্যদেশে স্বাভাবিক নিয়মে যে রাজ্যতন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া উঠিত তাহা বর্ত্তমান ইংরাজ রাজ্যতন্ত্র হইতে নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকারের হইত। হয়ত একদিক হইতে দেখিতে গেলে রাজার হস্তে প্রতাপ এখনকার অপেক্ষা অধিক মনে হইত, তেমনি আবার অন্যদিকে রাজার প্রতাপ খর্ব্ব করিয়া প্রজাদের ইচ্ছাচালনার পথ ভিন্ন আকারে নানা উপায়ে প্রকাশ পাইত। স্বাভাবিক সামঞ্জস্য কেবল স্বাভাবিক নিয়মেই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের হাজার ইচ্ছা করিলেও কেবল পলিসির দ্বারা তাহা খাটাইতে পারে না।

অতএব ইংরাজ আমাদের সহিত কেবল ইংরাজের মতই ব্যবহার করিতে পারেন, যদি ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাহা বিকৃত করেন তবে সে কেবল দুর্ব্যবহার হইবে কোন্ কালেই ভারতবর্ষীয় ব্যবহার পরিণত হইতে পারিবে না। তাঁহাদের নিজের আদর্শ তাঁহারা ভাঙ্গিতে পারেন কিন্তু তাহার স্থলে গড়িবেন কি এবং গড়িবেন কি করিয়া? মাঝ হইতে চিরাভ্যস্ত স্বদেশীয় আদর্শচ্যুত ইংরাজ আমাদের পক্ষে বড় একটি ভয়ঙ্কর প্রাণী হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। মাহিয়ার্ড কিপ্লিং প্রভৃতি লেখকের লেখায় যে একটি অন্ধসঞ্চিত নিষ্ঠুরতার আভাস অনুভব করা যায় তাহা হইতে মনে হয় মানব মধ্যে মধ্যে সভ্যতার পত্তনস্থাপিত কৃত্রিম দৃঢ় জমা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আদিম আরণ্য প্রকৃতির বর্ব্বরভাব মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। অ্যাংলোইণ্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক

সুতীব্র ক্ষমতামদিরার আস্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড মত্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতামত্ত প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লেখনীতে অকৃত্রিম অসঙ্কোচ পৌরুষ আকারে একপ্রকার ভীষণ রমণীয়তা ধারণ করে তাহা ইংরাজের পক্ষে সাহিত্য কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।

দ্বিতীয় কথা এই, আজকালকার উপন্যাসলেখকেরা প্রাচ্য প্রকৃতিকে পাশ্চাত্যদের নিকট যতটা রহস্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন তাহার অনেকটা কাল্পনিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহস্র যোগ আছে। অন্তরের সাদৃশ্য অনেক সময় বাহ্য বৈসদৃশ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র। আধুনিক লেখকগণ সেই বাহ্য বৈসদৃশ্য গুলির নূতনত্বকে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থে রঞ্জিত অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে থাকেন এবং সুগভীর সাদৃশ্যগুলি উদ্ধার করিবার চেষ্টাও পান না ক্ষমতাও রাখেন না।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।

এরূপ অবস্থায় আমাদের ন্যায়ান্যায়বোধ প্রবল হইয়া উঠিলে ইংরাজের রাজনীতি বিপথগামী হইতে পারিবে না। ইংরাজ যখন জানিবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার কাজের বিচার করিতেছে তখন ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

সম্প্রতি তাহার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ইংরাজের কোন অন্যায় দেখিলে ভারতবর্ষ আপন দুর্ব্বলকণ্ঠে ন্যায়তা ও নীতির দোহাই পাড়িতে থাকে। সে জন্য ইংরাজ রাগ করে বটে কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকিতেও হয়।

তথাপি এখনও সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই। আমাদের সম্বন্ধে সকল সময়ে সকল অবস্থায় নীতি মানিয়া চলাকে ইংরাজ দুর্ব্বলতা বলিয়া দেখে। আমাদের প্রতি অপরাধ করিয়া তাহাদের কেহ ন্যায় বিচারে দণ্ডনীয় হয় ইহা তাহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষীয়ের নিকট ইহাতে ইংরাজের জোর কমিয়া যায়।

রাজপুরুষদিগের মনের ভাব ঠিক করিয়া নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য কিন্তু বোধ করি রাটীচি সাহেবের অসময়ে পদোন্নতি উপরিউক্ত পলিসিবশতঃ। বিশেষতঃ যখন দেখা যায় এমন ঘটনা বারম্বার ঘটিয়াছে তখন সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। গবর্ণমেণ্ট যেন নীরবে বলিতেছেন যে, তোমাদিগের কাহাকেও অন্যায় উৎপীড়ন ও অপমান করিয়া কোন কর্ত্তৃপুরুষের মাথা হইতে পারে ইহা মনে করাই তোমাদের পক্ষে স্পর্দ্ধা, সেই স্পর্দ্ধায় পদাঘাত করিবার জন্য যদি বা প্রথা উল্লঙ্ঘন, যদি বা ন্যায়াসনের অনাদর করিতে হয় তবে তাহাও শ্রেয়। ইংরাজ ন্যায়পরতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মবিচারেরও অতীত।

সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে সম্প্রতি দুই একটি ঘটনায় দেখা গিয়াছে, গবর্মেণ্ট কেবল ইংরাজ নহে নিজের কর্ম্মচারীমাত্রকেই ন্যায়বিচারের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিতে চাহেন। রাখাখন হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমায় ইংরাজ জজ হইতে বাঙ্গালী পুলিস্ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত যে কেহ লিপ্ত ছিল, হাইকোর্টের বিচারে যাহারা প্রত্যেকে প্রকাশ্যে নিন্দিত হইয়াছে তাহারা সকলেই বাঙ্গলা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছে।

আমরা বাহিরের লোক, রাজনীতির ভিতরকার কথা কিছুই জানি না। হয়ত ইহার মধ্যে কোন গোপন কারণ থাকিতে পারে।

হয়ত কর্ত্তার এমন ধারণা হইতে পারে যে, বাঙালিদের মকর্দ্দমায় স্থানীয় জজের বিচার অন্যায় হয় নাই; যেমন করিয়া হোক, গোটা পাঁচ সাত লোকের ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল। তাহাদের এমন সংস্কার হইতে পারে যে, আদালতে টিঁকিবার যোগ্য প্রমাণ না থাকিলেও নালিশটা প্রকৃতপক্ষে সত্য, এবং সে সত্য স্থানীয় বিচারকই কেবল নির্ণয় করিতে পারে, হাইকোর্টের জজের পক্ষে অসাধ্য।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রকাশ্যে যাহাদের ব্যবহার নিন্দিত হইয়াছে, সাধারণের নিকটে যাহারা অন্যায়কারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক্ তাহাদিগকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করিলে জনসাধারণের ন্যায়ান্যায় জ্ঞানের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। সকলকে বলা হয়, তোমাদের কাছে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিবার কোন আবশ্যক দেখি না—তোমরা ভালই বল মন্দই বল তাহাতে গবর্মেণ্টের কোন মাথাব্যথা নাই। আমাদের ভাগ্যে ইংরেজ গবর্মেণ্ট।

যে গবর্ণর প্রজার মর্ম্মবেদনার উপর, প্রজার ন্যায়ান্যায়বোধের উপর জুতার গোড়ালি ফেলিয়া ফেলিয়া চলেন এবং সেই মচমচ্ শব্দে দুর্ব্বল কণ্ঠের আর্ত্তস্বর নিমগ্ন করিয়া দেন তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার ইংরেজ গবর্ণর।

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বল প্রকাশ পায় না, আমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বলতার সূচনা করে তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। গবর্মেণ্টের এরূপ উদ্ধত অবজ্ঞায় ইহাই প্রকাশ পায় যে, তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়বোধ এমন প্রবল নহে যে, তাহার নিকট সঙ্কোচ অনুভব করা যায়।

বরঞ্চ এই চিরালিঙ্গিত জাতির নিকট নিঃসঙ্কোচ স্বেচ্ছাচারই স্বাভাবিক বলের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

আমরা যদি রাজপুরুষগণকে এমন কথা বুঝাইতে পারি যে, ন্যায়পথ অবলম্বন করিলে সেটাকে আমরা বাহাদুরী জ্ঞান করি না, অন্যায় যতই বলিষ্ঠ দেখিতে হৌক আমাদের প্রাচ্যস্বভাবেও তাহা ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সুদৃঢ় নিরপেক্ষতাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকের প্রতি যথোচিত ন্যায়দণ্ড বিধান করিবার সাহস না থাকা আমাদের নিকট দুর্ব্বলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে, তবে আমাদের সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে ইংরাজ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না; কারণ, সে আদর্শের সহিত তাহাদের নিজের আদর্শের ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ফলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ বলিয়া স্থির করিব না, যখন অন্যায়ের প্রতিবিধানচেষ্টা নিষ্ফল হইলেও তাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া জানিব এবং সেজন্য ত্যাগস্বীকার ও কষ্টসহ করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে। তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ন্যায়পরতা কদাচ স্বার্থ পলিসি এবং ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হইবে না, অটল পর্ব্বতের ন্যায় প্রজা-হৃদয়ের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন ইংরাজের সদ্ব্যবহার ঔষধরূপে ক্ষণিক অনুগ্রহের ন্যায় আমাদের নত মস্তকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে না, সম্মানের ন্যায় আমাদের নিকট আহৃত হইবে,—আজ যাহা ভিক্ষা স্বরূপে প্রাপ্ত হইতেছি তখন তাহা অধিকারের ন্যায় গ্রহণ করিব।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, উপদেশ সহজ, কিন্তু উপায়টা কি? তাহার

উত্তরে বলিতে হয়, কোন যথার্থ মঙ্গল কলকৌশলের দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহার যা মূল্য তাহা সমস্তটাই দিতে হইবে। প্রত্যেককে আত্মপণ করিতে হইবে, ঘরে ঘরে ভ্রাতা এবং সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়াচরণের অটল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, নিজের ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত ভাল কথার ন্যায় এ কথাটিও শুনিতে সহজ, করিতে কঠিন এবং অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতন সুদীর্ঘ প্রকাশ্য পথ ছাড়া স্থায়ী কল্যাণের আর কোন নূতন সংক্ষিপ্ত গূঢ় পথ আবিষ্কৃত হয় নাই।

কৃতজ্ঞতা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিটেক্‌টিভের রিপোর্টে বোর্ড জানিতে পারিলেন যে দীনেন্দ্রনাথের দেনা অনেক গুলি, নানারূপে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই অনুসন্ধানের ফলে আরও দুই চারিজন ওয়ার্ডের হিতৈষি বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল। টমসন সাহেবের আরোপিত দোষগুলি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হওয়ায় ইনষ্টিটিউট পরে ফিকে উঠিয়া গিয়াছিল, আমরা সে কাহিনী সবিস্তারে লিখিতে বসি নাই। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি এই টমসন সাহেবই সে দিন বাঙ্গলার ছোট লাট হইয়াছিলেন।

ডোনাল্ড সাহেব দীনেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া কুণ্ডলায় আসিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল দিনকতক সহরের প্রলোভন হইতে দূরে

থাকিলে নাবালক সুধরাইয়া উঠিতে পারিবে। কর্ত্রীঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সে সম্বন্ধে অনেক সলা পরামর্শও দিয়া গেলেন। মিসনরি কন্যা মিস্ ভর্জ্জিনিয়ার প্রতি ভার হইল, যথাসাধ্য তিনি সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অধঃপতন নিবারণ করিবেন।

রাজধানীর সে চারুচন্দ্র সম্প্রতি দীনেন্দ্রনাথের স্কন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু খাস কুণ্ডলাতেও মোসাহেবের তেমন অভাব ছিল না। লক্ষ্মীর বাহন যেমন কালপেচক, বড় মানুষীর বাহন তেমনি মোসাহেব। অতএব কুণ্ডলায় ধুনিবাদী মোসাহেব দু পাঁচ ঘর ছিল না এমত নহে। এই সব বংশের কুলধরদের ভিতর কেহ কেহ বাল্যে দীনেন্দ্রের সহচর ছিল এবং বুলবুলির লড়াই ও কবুতরের খেলা হইতে মাষ্টার পণ্ডিতের কাপড়ে ছাপ দেওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বকর্ম্মে বাল্যসখার সহায়তা করিয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া দীনেন্দ্রনাথ ছেলেবেলার প্রিয় খেলাগুলি এবং তাদের সঙ্গীদের ভুলিয়া গেলেও, তাহারা কিন্তু কিছুই ভোলে নাই। বরং তাহারা স্পষ্টরূপে ভরসা করিতেছিল, কোকন বাবু সাবালক হইলে তাহাদের মাসহরা মিলিবে। অতএব তাহারাসব এখন আসিয়া জুটিল। দীনেন্দ্র তাহাদের মধ্যে কয়জনকে দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন, কেননা তাহাদের পশ্চাদ্দেশে ছোট বড় শিখা ঝুলিতেছিল এবং কণ্ঠে তুলসী মালার ও অপ্রতুল ছিল না। সেই সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকসা বাহির হইয়াছিল। ইংরেজী আলোকপ্রাপ্ত যুবকেরা তাহার তীব্র বিদ্রূপস্রোতে দেশীয় অধিকাংশ রীতি নীতি ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তখন মদ খাওয়া এবং নিষিদ্ধ পানি ভোজন কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের চক্ষে সভ্যতার একটা প্রধান আসবাবের মধ্যে—পল্লী গ্রামেও সংস্কারের ঢেউ উঠিতেছিল। দীনেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, সভ্যতালোক-প্রাপ্ত তিনি সেই ভণ্ডগুলোর টীকি কাটিয়া

এবং মালা ফেলাইয়া কুণ্ডলাকে যদি সভ্যভব্য না করিতে পারেন, তবে বুথায় ওয়ার্ডইনষ্টিটিউট তার শিক্ষা দীক্ষার ভার লইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে হুতোম প্যাঁচার বোলচালে এবং দীনেন্দ্রের হাসির চোটে শতকরা নব্বই জনের ধারণা হইল যে স্বর্গে উঠিবার একমাত্র সিঁড়ি, বড় মানুষের অনুগ্রহ—শিখা, মালা বা তিলক ধারণ নহে। ইহাতে দুই চারি দিনের ভিতর বিস্তর লম্বা লম্বা টীকি স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া বিজয় নিশান স্বরূপ দীনেন্দ্র সে গুলিকে একটা কামরার দেওয়ালে সাজাইয়া রাখিলেন। যে দুই চারি জন তর্ক বিতর্ক করিল এবং বলিল "টীকি মালা নইলে যে আমাদের ফলার বন্দ গো কোকো বাবু! তোমার মা কি আর তা হলে আমাদের রাধা-গোবিন্দজীর দরওয়াজায় ঢুক্‌তে দেবেন?" দীনেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে সে আশঙ্কা নাই, কেননা সাবালক হইলে, তিনি স্বয়ং রাধাগোবিন্দ জীউকেও "পেগ" ধরাইবেন।

শেষে এমন হইল যে হরিপ্রিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য ফলাহার গত-প্রাণ কুণ্ডলাসমাজে দ্বাদশটী সটীক এবং শুদ্ধ দ্বিজও খুঁজিয়া পান না। মাঝে মাঝে খবর পান, আহারের জন্য নিহত পক্ষীদের পাখা উড়িয়া উড়িয়া ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গন ছাইয়া ফেলে। এইরূপে দুই তিন দিন রাধাগোবিন্দজীর ভোগ নষ্ট হইল। শুনিয়া শুনিয়া হরিপ্রিয়া খুব কাঁদেন কাটেন এবং মাথা খোঁড়েন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া ছেলেকে কিছু বলিতে সাহস হয় না, পাছে সে আবার কলিকাতায় পলাইয়া যায়, কি আর একটা কিছু করিয়া বসে।

মিস্ ভর্জ্জিনিয়ার কাছে কিন্তু দীনেন্দ্রনাথের ভারি পসার—কেননা তিনি এক দিন তাঁহার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া বিজয় নিশান স্বরূপ সেই কর্ত্তিত শিখাগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তার উপর দেখা হইলেই মেম্‌কে বলিতেন, "আমার গৃহিণীকে আজও

Civilized হ... পারেন না? সেই দেড় ফোঁটা দোষটা যে কিছুতে ঘোচেনা! ... সাহেব "ডেভিড" মত নাজা—তেমন আমার গর্ব জন্মে! আমার যদি মনে থাকে, আপনাদের দেশে জন্ম হও!" মহাখুশী হইয়া তিনি চক্রবর্ত্তিগণ ডেভিড দম্পতিকে চিঠি লিখিলেন যে তাঁর যত্নে বালক খুব দ্রুত উন্নতি করিতেছেন। এমনি কি ইহার ভিতর ব্রাহ্মণ এবং পৌত্তলিকতার তাঁহার এতটা ঘৃণা জন্মিয়াছে যে সহসা সেই সুদূর পদ্মাতীরে একদিন খৃষ্টের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই রিপোর্ট পাইয়া কালেক্টর সাহেব দীনেন্দ্রকে অভিনন্দন পত্র লিখিলেন এবং বোর্ডে লিখিয়া তাহার পড়াশুনার জন্য একজন ফিরিঙ্গী মাষ্টার আনাইয়া দিলেন। এই শিক্ষক ও ক্রমে বেশ দলে মিশিয়া গেল। তাহার ফলে পাশ্চাত্য বিদ্যায় ছাত্রের যে টুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, অল্পদিনেই তাহা দূর হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাস্তবিক ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতার সেই প্রভাতে বঙ্গসমাজের মানবরাজ্যে যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে তাহার আলোচনায় লাভ আছে। জাতিগত স্বাধীনতা যতই উপাদেয় হউক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্ত না হইলে, স্বাধীনতায় এবং অধীনতায় বড় একটা ইতর বিশেষ থাকে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনেকদিন আমাদের নাই, কিন্তু স্বানুবর্ত্তিতা কখন ছিল কি না সন্দেহ। সেই মানসিক অরাজকতা স্বানুবর্ত্তিতার নবীন উন্মেষ মাত্র।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গসমাজের একটা চিত্র দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি। তখন রাজা রামমোহন রায়ের যুগ

নিশীথের ঘোরান্ধকার কাটিয়াছে বটে কিন্তু প্রভাতের বিলম্ব আছে। সতীদাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরে একদিন হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা তর্ক করিতেছিল সে সম্পর্কীয় একটা সুলিখিত রিপোর্টের লেখক কে—রামমোহন কি আর কেহ? অধ্যাপক ডেরোজিও সকল শুনিয়া দুঃখে বলিয়া উঠিলেন "তোমরা সব মানুষ না পাথর? দেশে অতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল,কোথায় তার ফলাফল বিচার করিবে, না ব্যক্তি বিশেষের লিপিকুশলতার কথায় মাতিয়া আছ?" সেই নিশাশেষের শুকতারা কবি মধুসূদনের প্রতিভা। তাঁহার জীবন এবং কাব্য উন্মেষোন্মুখ নবীন বাঙ্গালী জীবনের প্রথম চাঞ্চল্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। দেশীয় চিরন্তন প্রথামাত্র তাঁহার চক্ষে অসহনীয়। তাই রামায়ণের রামচন্দ্র মেঘনাদবধকাব্যে রক্ষঃবলীদলের পার্শ্বে সামান্য মনুষ্যমাত্র এবং লজ্জানম্রমুখী বঙ্গরমণীর স্থলে বিদ্যুৎ জ্বালাময়ী প্রগলভা দানবী প্রমীলার চিত্র, যার

"অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা নাহি কি বল এভুজ মৃণালে"

শুনিয়া তখনকার যুবকদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

* * *

জননী জন্মভূমি কুণ্ডলার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া দীনেন্দ্র অতঃপর গৃহিণীকে সভ্যা ভব্যা করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। মিস্ ভর্জ্জিনিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও কুসুমমালার লজ্জা ভাঙ্গাইতে পারিলেন না—তিনি বলিতেন "বউ, তোমার স্বামী পাশ্চাত্যজ্ঞানে শিক্ষিত, তোমাদের দেশী নির্ব্বুদ্ধি লজ্জাশীলতা তাঁর ভাল লাগিবে কেন? স্বামীর সামনে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকা আর তাঁকে অপমান করা একই কথা। ছি, এসব ছাড়!" শুনিয়া কুসুম লজ্জানম্র মুখে ঈষৎ হাসিত—কখন নত নয়নে বস্ত্রাঞ্চলে অঙ্গুলি জড়াইয়া

ক্রীড়ার ভান করিত - মেমকে কিছু বলিত না। গোপনে সুবোকে বলিত, "আমি কি এমনই বেহায়া মেয়ে যে মাথা খুলে শাশুড়ী ননদ কি চাকরাণীদের সামনে সোয়ামীর সঙ্গে কথা কইব! মরণ কুবুদ্ধি আর কি! সে আমি পারব না। না হয় আর একটা বিয়ে করুক!"

দীনেন্দ্রের ইচ্ছা তাঁর পত্নী মেমের মত লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া বেড়াইবে, তাঁর সঙ্গে চেয়ারে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া সকলের সমক্ষে হাস্য কৌতুক করিবে—সংক্ষেপে লজ্জা সরমের ধার ধারিবে না। কিন্তু স্বামীর সে সব আদেশ শুনিলে কুসুম ভয়ে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মান হইত, অনেক সময় একগা ঘামিয়া উঠিত এবং সাধারণতঃ "ঐ কে আস্‌চে" বলিয়া দেড়হাত ঘোমটাকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিত। দীনেন্দ্র প্রথম প্রথম ইহাতে আনন্দানুভব করিতেন, কিন্তু ক্রমে গরম হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দেশ শুদ্ধ লোক তাঁর কথা শোনে, কত ব্রাহ্মণতনয় তাঁহার আজ্ঞায় সদ রহিয়াছে, আর তাঁর নিজের ঘরের স্ত্রী কি না তাঁকে অবহেলা করে! প্রথম প্রথম দীনেন্দ্র-মায়ের ভয়েও বটে, কতক স্ত্রীর প্রতি সম্ভ্রম বশতঃও বটে মদ খাইয়া অন্দরে আসিত না। কিন্তু কুসুমের উপর চটিয়া গেলে সে সঙ্কোচ আর বড় রহিল না।

মত্তাবস্থায় দীনেন্দ্র কুসুমমালাকে গান গাইতে বলিত—কুসুম কেবল কাঁদিত। দণ্ডস্বরূপ দীনেন্দ্র কোন কোন দিন তাঁহার বস্ত্রে মদ ঢালিয়া দিত, কখন বলিত সমস্ত রাত্রি বসিয়া আমায় পাখা কর। স্বামী সেবায় কুসুম সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইত। তাহার পশ্চাচার বিস্মৃত হইয়া সাধ্বী যে স্বামীর কল্যাণ কামনায় মা দুর্গা জগদ্ধাত্রীকে ডাকিত, নীরবে চোখেরজলে তার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত, অজ্ঞান দীনেন্দ্র তাহার কিছুই বুঝিতে পারিত না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর অত্যাচারের সকল কথা কুসুম সুরবালাকে বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু কিছু কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। এ সংসারে যার সুখ দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার লোক নাই, জীবনের ভার সে বহিতে পারে না। শুনিয়া শুনিয়া সুরো কুসুমমালার অদৃষ্টে দুঃখ মিশাইত এবং ভাবিত প্রতীকারের কোন উপায় হইতে পারে কি না। কুসুম ভাবিত, চির জীবন তাহার এমনি দুঃখে কষ্টে কাটিবে, সুরবালা ভাবিত এ দুঃখ দূর করা চাই। কুসুম যেখানে দেখিত কেবল আঁধার এবং বিষাদ, সুরো সেখানে দেখিত আলোক এবং আনন্দ। দুই চরিত্রের পার্থক্য এইখানে। উভয়ের সখীত্ব কতকটা সুখ দুঃখের মিলনের মত।

মিস্ ভর্জ্জিনিয়া সুরো এবং কুসুমকে যেখানে পড়াইতেন, হীরানাথ দীনেন্দ্র মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া দর্শন দিতেন। কুসুম মেমের সামনে বোমটা টানিতে পারিত না বটে কিন্তু জড়সড় হইয়া নত নয়নে বই মুখে করিয়া বসিয়া থাকিত। সুরোর বেশ সপ্রতিভ ভাব—যে লজ্জা স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ, তাহার অভাব নাই অথচ তেজোগর্ব্বে এবং দৃঢ়তায় মিশিয়া তাহা সুসংযত হইয়াছে। সুরবালার চলনে ফেরনে, প্রতিকোমল কটাক্ষপাতে এবং কথাবার্ত্তায় মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিত, দীনেন্দ্র দেখিয়া প্রশংসমান চক্ষে তাহার সঙ্গে "বোনটী" বলিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। সুরো দু একটী মাত্র কথা কহিত, কেন না ছেলেবেলা হইতে সে কখন "বোঠাইমাকে" দুটীকে দেখে নাই।

দীনেন্দ্র কুসুমকে অনুযোগ করিতেন—'বোনটীর মত

পার না?" কুসুম স্থির কোমল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া থাকিত, দীনেন্দ্র আবার বলিতেন, "বোনটী কেমন সপ্রতিভ, আমার সাম্নে তোমার মত ঘোমটা হয়ে বসে থাকে না।" দু একদিন শুনিয়া কুসুম বলিল- নেটি ত আর তোমার বউ নয়, সে আমার মত জড়সড় হবে!" ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন "বোনটীর মত তোমায় হতেই

হাসিয়া কুসুম সে কথা সুরবালাকে এবং "ওলো, তোকে তোর দাদার মনে ধরেচে" বলিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। সুরো বিষাদের হাসি হাসিল, ভাবিল তবে সে দুঃখ দূর করিতে পারিবে।

ইহার পর থেকে সুরো দাদার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভাল করিয়া কথা কহিত এবং মেমের দ্বারা গল্প উঠাইয়া কুসুমকে স্বামীর সমক্ষে হাস্যকৌতুকে যোগদিতে অভ্যস্ত করাইত। কুসুম হাসিত বটে কিন্তু তাহা অধরে ফুটিয়া গণ্ডে মিশাইত—ঐ পর্য্যন্ত। মেম সাহেবের সম্মুখে, ননদের সম্মুখেও বটে সে নিঃসঙ্কোচে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবে?—ধিক! তার কি দড়ি কলসী জোটে না!

সুরবালা বলিত "বউ অত লজ্জাকরে সব খোয়াবি—আর কাকেই বা লজ্জা করিস্? মেম তোর লজ্জা দেখে হাসে আর বলে ও একটা জন্তু। সত্যিইত, বোকাপড়া শিখ্‌চিস্, তুই একটু তার মন জুগিয়ে চল্‌লে দাদা যদিই ভাল হন, সে চেষ্টা না করিস্ কেন?" কুসুমবালা সম্মত হইল, সুরোর সুমুখে সে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবে, কিন্তু মেমেদের সুমুখে নহে। আর ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া সে কথা কহিবে, জনপ্রাণী তাহা শুনিতে না পায়!

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া সুরো বলিল "জেঠাইমা, কলিকাতায় গিয়ে দাদার মরজি হয়েচে সাহেবের মত, তাঁর ইচ্ছে

...ট মেয়েদের মত তাঁর সঙ্গে একত্রে গাড়ীতে বেড়ান—বুঝেচো ? ...ই লক্ষ্মীছাড়ী মরে আর কাঁদে,—তুমি বাপু এর একটা ব্যবস্থা কর।" ...বিপ্রিয়া সুরোকে কোলের ... বসাইয়া আদরে তাহার হাস্য-প্রফুল্ল সরল মুখখানি দেখিতে ... নিতিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন—"দেখ ... খানি হয়েচে ঠিক্ যেন ছোট বউয়ের মতন। আহা, দুই ... তখন অত বিবাদ, তবু ছোট বউয়ের ভালবাসা আমার ... দিনের তরে কমে নি। লুকিয়ে লুকিয়ে কত মিষ্টি কথা ... বেতোর শাক পাঠাত। কপালে নেই ... মেয়ে ... কর্‌তে পেলে না।" সুরবালার কথা শুনিয়া ... হাসিয়া বলিলেন—"কুকি, ঐটেই সুধু বাকী, নইলে ... সব অনাচার দিয়ে থাকে, ভয় হয় পাছে বাবাগোবিন্দ ... করেন। আমার একটী ছেলে, কত পূজো আচ্চা করলাম কুকি, কিছুতেই কিছু হয় না। কোকনের ভবে দৈবজ্ঞিরও আর আসতে বাকি না—কাকে নাকি টীকি কেটে মদ খাইয়ে দিয়েছিল। দেবতা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবারই কাছে অপরাধ—কপালে কি আছে জানিনে।" হরিপ্রিয়া সুরবালার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া বিহ্বল বিবশ হইয়া রোদন করিলেন।

...লা লেখিল জেঠাইমার বাবা কিছু হইবে না—নাকখান থেকে ... উঠিবে মেম সাজিতে হবে বউদেরই সাধ হইয়াছে। সুরবালা প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে লাগিলে কর্ত্রী বলিলেন—"কুকি, একটা কথা শোন মা! কালেক্টর সাহেবের মেমের ইচ্ছা তোমায় যেন বিয়ে দেব—আমায় সে দিন দেখা করে তাই বল্‌তে এসেছিলেন। আমি জিভকেটে বল্‌লাম, 'মেমসাহেব আমার কোকন কে নিয়েছে বলেচে, কুকীর বিয়ে দিতে মেয়ে খুঁজে কালি দিও না। কুকি, তুই যার নেকা পড়া করিস্ নে মা—ওরা

নব মায়াবিনী।" সুরো একমুখ হাসিয়া বলিল—"সে ভয় করো না জেঠাই মা!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর মেয়ের "ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।" অতএব তাঁহাদের দয়া মায়া সচরাচর যে গৃহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে না ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। বঙ্গকুললক্ষ্মীদের লজ্জা নম্র মুখে, অবগুণ্ঠনের পবিত্রতার ভিতর যেমন শোভায়, বড় কথায় এবং বৃহৎ ভাবে তেমন নহে। সেই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিতে গিয়া দীনবন্ধু বাবু বলিয়াছিলেন "পুরুষ জ্যাঠা হলেও মান, মেয়ে জ্যাটা সওয়া যায় না।"

সুরবালাকে আমরা কতকটা সেই মেয়ে জ্যাঠার দলেই ফেলিতে বসিয়াছি। চিত্রটা যাঁদের কটু লাগিবে, ভরসা করি তাঁহারা মনে রাখিবেন আবাল্য সুরোর শিক্ষা দীক্ষা বঙ্গরমণীর চিরক্ষুণ্ণ পথে চালিত হয় নাই। বারবছর বয়সে যে জানিল এ জীবন বৈধব্যের কঠোরতায় অভ্যস্ত করাই ধর্ম্ম, খানিকটা অসাধারণত্ব তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। বয়ো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরো বুঝিল, আপনার সুখে দুঃখে যে তন্ময়, ব্রহ্মচর্য্য তাহার জন্য নহে। মেমেদের সহবাস এবং শিক্ষায় তাহার মনের সেই ভাব ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, মিস্ ডোনাল্ডের মত সম্ভ্রান্ত বিদেশিনী রমণী জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া, তাহাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। দেখিল, মিস্ ভর্ত্তিনিয়া বিবাহ না করিয়াও পরম সুখী এবং আপনার ধর্ম্মে মতি রাখিয়া পরহিত কামনায় তিনি যে দীর্ঘ জীবনপথ অতিবাহিত করিতে চান, ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। অতএব অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবার অনেক পূর্ব্বে সুরবালা আজীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

মিসেস ডোনাল্ড আগে যখন তখন অনুরোধ করিতেন—"সুরো অবশ্যই তুমি মনোমত পতিকে বিবাহ করে আমায় সুখী করিবে।" প্রথম কয়বছর সুরবালা সে কথায় কেবল অপ্রতিভের হাসি হাসিত, কোন উত্তর দিত না। শেষে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে বলিত—"বিবাহই কি এত সুখের? তা হলে আপনাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক চিরকুমারী থাকেন কেন?" মিস্ ভর্জ্জিনিয়া হাসিয়া বলিতেন—"সুরো তোমার মত যারধন সম্পত্তি আছে, চির কৌমার্য্য তার জন্য নহে।" ইহাতে গম্ভীর হইয়া সুরবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত বলিত, "আমি অন্যপূর্ব্বা, বিধবাতে আমাতে তফাৎ নেই। বিবাহের কথা শুন্‌লেও আমার পাপ আছে।"

বিবাহের কথায় সুরবালা এইরূপ জেঠামা সাজিয়া বসিত বটে, কিন্তু আর সব ব্যাপারেই তাহার ছেলেবেলার সেই আনন্দ উৎসাহ এবং অভিমানের চঞ্চলতা অক্ষুণ্ণ ছিল। মিসেস্ ডোনাল্ড ভগীকে ডাকিয়া বলিলেন "আমা কই তোমার সুরোকে ত কিছুতেই বিবাহে রাজি করতে পারিনে, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো।" ভগী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে একদিন বলিল "সুরো, আমার চিরদিনের সাধ যে বুড়ো বয়সে তোমার ছেলেপুলে মানুষ করে হাসিতে হাসিতে ঢোক বুজি। তুমি এত জ্ঞানবান হয়েচো, বিদ্যের যখন টনটন আছে, তখন দোষ কি?" সুরো সে দিন ভগীর কথায় কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া, ছেলেবেলার মত রাগিয়া উঠিয়াছিল এবং অভিমান ভরে দুই দিন আহার করে নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল "তুই কোথায় আমার ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি দিবি, তা নয় চিরকাল এক কথা। আজ্ জমাদার থাক্‌লে এমন কথা কি তুই বল্‌তে পারিতিস্?" রাগের কথা শুনিয়া কুসুমমালা বলিল—"ছি ঠাকুর ঝি, বুড়ো মানুষ, তোমায়

মানুষ করেচে, ওর কি সাধ হয় না যে তুমি সংসারী হও!" সুরো অপ্রতিভ্ হইয়া উত্তর করিল—"বউ, ভগীবেটীর কাছে আমার মনে হয় সেই আমি ছেলে মানুষ। কি ভাগ্যিস্ ছেলেবেলার মত কিল্‌টে চাপড়টা বসিয়ে দিইনি। কিন্তু তাহলেও ও কিছু মনে কর্‌তো না।"

এই সময়ে একদিন একখানা ময়লা ব্যারিং চিঠি সুরবালার নামে আসিয়া উপস্থিত। লেখাটা হিন্দী বটে, কিন্তু এবারত হিন্দী বাঙ্গলা মিশ্রিত। লেখক অকালী সিং স্বয়ং—আজ্‌ও সে সুরো দিদিকে দেখিবার জন্য বাঁচিয়া আছে! সুরোর সাবালিকা হইতে এখনও প্রায় বেড় বৎসর বাকী—তত দিন সে কি বাঁচিবে! কিন্তু সে প্রতিশ্রুত আছে, তার আগে কুণ্ডলায় আসিবে না। পত্র শুনিয়া সুরো বিবশ, বিহ্বল বালিকার মত কাঁদিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

জেঠাইমা হাসিয়া কাঁদিয়া সুরবালাকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তারপর সে ভার আর রহিল না। মিতিনকে বলিলেন "দেখ্‌লে, আমি যে বলি মেকা পড়া শিখে বউটো একেবারে নিঃসঙ্কোচ হবে সেটা ফল্‌চে কি না? আমার কোকনদ পোড়ারমুখো সাহেব গুলো মদ মাংস খাইয়ে মন্দ করেচে, নইলে বাছা আমার ছেলে-মানুষ বইত নয়, ভলে মন্দ কিছুই জানে না। মেমেদের দেখাদেখি বউমার ইচ্ছে হয়েচে মেম হতে, তাই সুরোকে মাঝখানে রেখে কথা চালাচালি করা হচ্চে। সাধে কি ছেলে বউটোকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না!" মিতিন ঠাকুরাণী কর্ত্রীর কাছে সরফরজ হইবার ভয়-সাধ প্রায় তদণ্ডে বধূমাতার প্রকোষ্ঠে হাজির হইলেন। কুসুম বরেন্দ্র-ভূমি সম্মত প্রথামত শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সঙ্গে বোমটার ভিতর

থেকে তুড়ি দিয়া কথা কয়, মুখ খুলিয়া বাক্যে তার কাছে আত্ম-নিবেদন করা সনাতন প্রথা বিরুদ্ধ। শাশুড়ীর মিতিন চৌদ্দ আনা শাশুড়ী, বধূর কাছ থেকে সে মূক সম্মানটুকু তার ও প্রাপ্য বটে কিন্তু এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রমস্থল ছিল—মিতিন মানদাসুন্দরী কুসুমের পিত্রালয়ের অদূরে বাস করেন।

মানদা একমুখ হাসিয়া একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"কিগো বড় মানুষের বেটী—তুমি না কি মেমসাহেবকে মা বলে তার প্রসাদ খেয়েচো। শুনে তোমার শাশুড়ী মাথামুড় খুঁড়চেন যে।" কুসুম জানিত, মিতিন ঠাকুরুণ বড় রঙ্গপ্রিয় এবং হাস্যরসের অনুরোধে সকল কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলা তাঁর রীতি। হাসিয়া বলিল "মেমসাহেবের সঙ্গে বড়শাশুড়ীর সম্বন্ধ ধরি গো মিতিন মা। ঠাকরুণকে বলো তাহলে আর রাগ করবেন না।" কিন্তু কুসুম যখন মানদাসুন্দরীর কাছে শুনিল, সুরবালার কথায় কর্ত্রীঠাকুরাণী বুঝিয়াছেন সবদোষ তাহারই, তখন সে কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিল।

মানদা দেবী বলিলেন "কুসুম, তোমার শাশুড়ীর মিতিন হয়েচি বোই যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক, তা নয়। আজ তোমার বাপ ছেলেবেলায় সম্বন্ধ ধরে দিদি দিদি করে বাঁচেন না। একটী কথা বলি মা, সেইজন্যেই তোর কাছে এসেছি।" মানদা দেবী এদিক ও দিক চাহিয়া দ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া আসিলেন, কুসুম ভয়ে হুরুহুরু করিয়া উঠিল।

মিতিন ঠাকুরাণী চুপি চুপি বলিয়া চলিলেন—"বাসীদের ভিতর কাণা ঘুষো উঠেচে মেমেরকাছে যাতে গিয়ে তোমা দুজনে বিলেতী খানাখান, আজকাল আবার কোথা গিয়ে তোদের সঙ্গে মদ খেয়ে চলাচলি করে। বিনোদা বলে যে ছোট বাড়ীর কুকুরী যে রকম

চাল্‌চলন হয়ে উঠ্‌লে শীগ্‌গির একটা সাহেব বিয়ে করলে বলে! তোমার শাশুড়ীর কানে এ সব কথা আজও ওঠেনি—একেই চটে আগুন, এসব শুন্‌লে সে পগার ঝাঁপদেবে। তুই বাছা মেকা পড়া ছাড়্। আর ছোট বাড়ীর কুকীর সঙ্গে অতভাব ও রাখিস্‌নে।"

স্তম্ভিত হইয়া কুসুম এবথা গুলি শুনিল। নিন্দার ভয়ে একেই সে বাঁচেনা,তার উপর কি বিষম কলঙ্ক! বিলেতীখানা খায়! সোয়ামীর সঙ্গে মদ খায়! কুসুম জানিত সুরবালা এসব শুনিলে হাসিয়া উড়াইবে, কিন্তু তার পক্ষে মেমের কাছে বসিয়া স্বামীর সমক্ষে লেখা পড়া করা আর অসম্ভব। না হয় ইহজীবনে স্বামী-প্রেম তাহার কপালে ঘটিবে না—লোকলজ্জা বেশী কি একটু পুতুলের আদর বেশী! দীনেন্দ্র ভাল নাই বাসুক—কুসুম তাহার পদসেবা করিবারই সুখী হইবে!

কুসুম প্রতিশ্রুত হইল, আর সে মেমের কাছে পড়িতে যাইবেনা এবং যথাসাধ্য সুরবালার সংসর্গ ত্যাগ করিবে। শেষ কথাটা মনে করিতেও তার মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ আঘাত লাগিল—কেননা সুরোর ভালবাসা ছাড়া জীবনে তার অন্য সুখ ছিল না। কুসুম ভাবিল—আগেকার মত দেখা শুনা না হলেই কি তাদের ভালবাসা কমিবে!

সুরবালা ঠিক্ এই সময়ে ভাবিতেছিল, যেমন করিয়াই হোক সে কুসুমকে স্বামীর মনের মত করিবে। একবার মনে হইতেছিল, দীনেন্দ্রের মত মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করা তাহার পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু কুসুমের দীন সজল চক্ষু মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে কথা সুরো মনে ঠাঁই দিল না।

সাহিত্যের গৌরব।

মৌরস্ য়োকাই হঙ্গেরি দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার প্রবৃত্ত হইবার পর পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেশের আপামরসাধারণ কিরূপ মহোৎসাহের সহিত এই উৎসবে যোগ দান করিয়াছিল তাহা সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন।

সেই উৎসব বিবরণ পাঠ করিলে তাহার সহিত আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগজনিত শোকপ্রকাশের তুলনা স্বতঃই মনে উদয় হয়।

ভিক্টর হুগোর মৃত্যুর পর সমস্ত ফ্রান্স্ কিরূপ শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছিল বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে কথা উত্থাপন করিতে লজ্জা বোধ হয়, কারণ, ফ্রান্স্ য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয়। বীরপ্রসবিনী হঙ্গেরির সহিতও নির্জ্জীব বঙ্গদেশের তুলনা হইতে পারে না, তথাপি অপেক্ষাকৃত অসঙ্কোচে তাহার নামোল্লেখ করিতে পারি।

আমরা যে বহু চেষ্টাতেও আমাদের দেশের মহাত্মাগণকে সম্মান এবং প্রীতি উপহার দিতে পারি না, আর য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল রাজ্যে রাজায় প্রজায় মিলিয়া সামান্যবংশজাত একজন সাহিত্যব্যবসায়ীকে এমন অপর্য্যাপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে অভিসিক্ত করিয়া তুলিল ইহার কারণ কি?

ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে লেখক এবং পাঠক এক প্রাণের দ্বারা সঞ্জীবিত, পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। সেখানে সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া একজাতি। তাহারা এক উদ্দেশ্যে এক জাতীয় উন্নতির অভিমুখে বাহিত হইতেছে, তাহাদের

মধ্যে যে ব্যক্তি সরল পথ নির্দ্দেশ করিতেছে, সে সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছে।

আমাদের দেশে পথিক নাই সুতরাং পথ খনন করিয়া কেহ যশস্বী হইতে পারে না। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের রাজপথ খনন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়, বঙ্গসাহিত্য কোথায়, বাঙ্গালী জাতি কোথায়! যাহারা বাঙ্গলা লেখে তাহারাই বা কয়জন, যাহারা বাঙ্গলা পড়ে তাহাদেরই বা সংখ্যা কত!

বঙ্গসাহিত্য যে জাতীয়-হৃদয় অধিকার করিবার আশা করিতে পারে সে হৃদয় কোন্‌খানে! পূর্ব্বকালে যখন আমাদের দেশে সাধারণজাতি নামক কোন পদার্থ ছিল না তখন অন্ততঃ রাজসভা। সেই সভা তখন সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি ছিল। সেই সভার মধ্যে স্থান পাইতে পারিলে, সেই সভার মধ্যে গৌরবের স্থান পাইলে সাহিত্য আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিত। এখন সে সভাও নাই!

বঙ্গসাহিত্যের কোন গৌরব নাই। কিন্তু সে যে কেবল বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যবশতঃ তাহা নহে। গৌরব করিবার লোক নাই। ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অনেকজনের নিকট তাহার সমাদর থাকিতে পারে কিন্তু একত্রসংহত সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহার কোন প্রতিপত্তি নাই। কারণ, একত্রসংহত সর্ব্বসাধারণ এদেশে নাই।

যে দেশে আছে সেখানে সকলে সাধারণ মঙ্গল অমঙ্গল একত্রে অনুভব করে। সেখানে দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অনাদর হইতে পারে না, কারণ, যেখানে অনুভবশক্তি আছে সেইখানেই প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা আছে। যেখানে সর্ব্বসাধারণের ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয় সেখানে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাষার ঐক্য আবশ্যক হইয়া উঠে এবং এই সাধারণের ভাষা কখনই বিদেশীয় ভাষা হইতে পারে না।

য়ুরোপে জাতিসাধারণকে যে প্রকার আমরা বাঙ্গালীরা তাহা নহি। অর্থাৎ, আমাদের এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে সর্ব্ব অঙ্গে বেদনা বোধ হয় না। আমাদের সকলের মধ্যে বেদনাবহ বার্ত্তাবহ স্নায়ুতন্তু কোন সাধারণ যন্ত্র নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে সাধারণ সুখ দুঃখ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এবং সাধারণ সুখ দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যক নাই।

এই জন্য দেশীয় ভাষার প্রতি সাধারণের আদর নাই এবং দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগের স্বল্পতা দেখা যায়। লোকে যে অভাব অন্যের সহিত অনুভব করে না সে অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত অন্যের নিকট হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে না। অনেকে কর্ত্তব্যবোধে কৃতজ্ঞ হইবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকে কিন্তু সে চেষ্টা কোন বিশেষ কাজে আসে না।

আমাদের দেশে সাধারণের কোন আবশ্যকবোধ না থাকাতে এবং সাধারণের আবশ্যকপূরণজনিত গৌরববোধ লেখকের না থাকাতে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে এবং লেখকে পাঠকে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে না। সাহিত্য কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক সৌখীন লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। অথচ সেই সাহিত্যসৌখীন্ লোকগুলি প্রাচীনকালের বাঙ্গালিদের ন্যায় সর্ব্বত্রপরিচিত প্রভাবশালী মহিমান্বিত নহেন সুতরাং তাহাদের আদরে সাহিত্য সাধারণের আদর লাভ করে না। কথাটা বিপরীত শুনাইতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিয়ৎপরিমাণে আদর না পাইলে আদর পাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় না।

হক্সোরিডে যে উৎসবের উল্লেখ করা যাইতেছে সে উৎসবের ক্ষেত্র সমস্ত জাতির হৃদয়রাজ্যে। হক্সেরীয় জাতি একহৃদয় হইয়া অনেক সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছে, সকলে মিলিয়া রক্ত

করিয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছে, স্বদেশের কল্যাণতরণী যখন বিপ্লবের ক্ষুব্ধ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্নপ্রায় তখন সমস্ত দেশের লোক এক প্রবতারার দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সেই দোদুল্যমান তরীকে উপকূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে; সেখানকার দেশীয় লেখক দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া শোকের সময় সান্ত্বনা করিয়াছে, বিপদের সময় আশা দিয়াছে, লজ্জার দিনে ধিক্কার এবং গৌরবের দিনে জয়ধ্বনি করিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং সে দেশে রাজরাণী হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই লেখকের নিকট পরমোৎসাহে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ কিছুই নাই।

এককালে হঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া লাটিন ও জর্ম্মানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হঙ্গেরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন এবং জর্ম্মান্ ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময় গুটিকতক দেশানুরাগী পুরুষ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অবমানে ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ তাঁহাদের কল্যাণে হঙ্গেরিদেশে এমন ভূরি পরিমাণে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে যে, প্রজা সংখ্যা তুলনা করিলে য়ুরোপে জর্ম্মনি ব্যতীত আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান শিক্ষাশালা নাই এবং সেই সকল পাঠাগারে কেবলমাত্র হঙ্গেরী-ভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন-সাধনের জন্য হঙ্গেরি গৌরব্ য়োকাইয়ের নিকট ঋণেবদ্ধ।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই কেবল যে লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে

পরে তরবারীহস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিস্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ নির্ব্বাপনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন হঙ্গেরি দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা জীবনস্রোত একটা কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে। সমস্ত জাতির আত্মা সচেতনভাবে কাজ করিতেছে। সেখানে সৃজন করিবার শক্তিও সবল, গ্রহণ করিবার শক্তিও সজাগ। আমাদের দেশে কোন উদ্বেগ নাই, কোন কার্য্য নাই, কোন জীবনের গতি নাই, তবে সাহিত্য কোথা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইবে? কেবল গুটিকতক লোকের ক্ষীণমাত্রায় একটুখানি সখ্ আছে মাত্র, আপাততঃ সেইটুকুর উপরেই সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়।

"মুক্তদস্যুর চক্ষু" নামক মোকাইয়ের একটি উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের সহিত লেখকের আত্মবৃত্তান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত দেখা যায়। এই আশ্চর্য্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন লেখকের সহিত তাঁহার স্বদেশের কি যোগ। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, যেখানে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশিয়া [illegible] সেখানে সাহিত্য স্ফীত ও হেলিল হইয়া উঠিতেছে, সেখানে [illegible] বিস্তার পূর্ব্বক সজীব চরিত্র সকল আহরণ করিয়া আনিতে [illegible] আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই জীবনস্রোতের প্রাবল্য, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবলতা, কোথায় সে [illegible] কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ।

আমরা নিক্তি হাতে লইয়া বসিয়া বসিয়া তৌল করিতেছি সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীর রূপেরেখা এক মাসা এক রতি পরিমাণ অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে কি না, আশেষার ভালবাসা ভ্রমরের

ভালবাসার অপেক্ষা এক চুল পরিমাণ উদারতর কি না, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ উভয়ের মধ্যে কাহার চরিত্রে ভক্তি পরিমাণে মহত্ত্ব বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি না, কোন্‌টা যথার্থ, কে মানুষের মত, কে সজীব, কোন্ চরিত্রের মধ্যে হৃদয়-স্পন্দন আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি।

তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে সুদূরব্যাপী কর্ম্মস্রোত না থাকাতে সজীব মানব চরিত্রের প্রবল সংস্পর্শ কাহাকে বলে তাহা আমরা ভাল করিয়া জানি না। মানুষ যে কেবল মানুষ-রূপেই কত বিচিত্র, কত বলিষ্ঠ, কত কৌতুকাবহ, কত হৃদয়াকর্ষক, যেখানে কোন একটা কাজ চলিতেছে সেখানে সে যে কত কাণ্ড বাধাইয়া বসিতেছে তাহা আমরা সম্যক্ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি না, সেই জন্য মনুষ্য কেবলমাত্র মনুষ্য বলিয়াই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আমাদের এই মন্দগতি ক্ষীণপ্রাণ কৃশ-হৃদয় দেশে মানুষ জিনিষটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাকে অনায়াসে বাদ দিতে পারি এবং তাহা স্থলে কতকগুলি নীতিশাস্ত্রোদ্ধৃত গুণকে বসাইয়া নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ পদার্থ প্রাণহীন [illegible] যাহারা দ্বারা তাহাদের গুরুলঘুর পরিমাপ করাকে সাহিত্যসমালোচনা বলিয়া থাকি। কিন্তু এক বঙ্কিমের উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখ, মানুষ কত রকমের, কত ভাল, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবসুদ্ধ কেমন সম্ভব কেমন সত্য। উহাদের মধ্যে কোনটিই নৈতিক গুণ নহে, বরঞ্চ গুলিই রক্তমাংসের প্রাণী। "বেসি" নামক এই গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, শাস্ত্রমতে সে যে বড় পবিত্র উন্নত স্বভাবের তাহা নহে, সে পরে পরে পাঁচ স্বামীকে বিবাহ করিয়াছে এবং শেষ স্বামীকে হত্যা করিয়া কারাগারে জীবন অন্ত করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে রমণী, সে বীরাঙ্গনা, অনেক সতীসাধ্বীর

স্থান সে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী. কিছু না হউক্ তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গৃহ-নির্ম্মিত নৈতিক চালুনীতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল এবং সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাঙ্গালাদেশের শিশুশিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রাণের পরিবর্ত্তে তূলে পরিপূর্ণ মিউজিয়ামের মিসেই যদি সহসা জীবনপ্রাপ্ত হয় তবে রক্ষকমহলে যেরূপ একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়, "বেসির" ন্যায় নায়িকা সহসা বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলে সমালোচকমহলে সেইরূপ একটা বিভ্রাট বাধিয়া যায়, তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার এবং নীতিতত্ত্ব বিপর্য্যস্ত হইয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হয়।

য়ুরোপে হুজ্যেবির সহিত পোলাণ্ডের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সেখানে আধুনিক পোলসাহিত্যের নেতা ছিলেন ক্রাস্-জিউস্কি।—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচনারম্ভের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব পরম সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বিদ্বজ্জনমণ্ডল তাঁহাকে উপাধি দান করে, কার্পেথীয় গিরিমালার একটি শিখরকে তাঁহার নামে অভিহিত করা হয়, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করেন এবং দেশের লোকে মিলিয়া তাঁহাকে ছয় হাজার পাউণ্ড মুদ্রা উপহার প্রদান করে।

এ সম্মান শূন্য সম্মান নহে। সমস্ত জীবন দিয়া ইহা তাঁহাকে লাভ করিতে হইয়াছে। তিনিই প্রথম পোলীয় উপন্যাস রচয়িতা। যখন তাঁহার বয়স আঠারো তখন পঠদ্দশাতেই তিনি পোলাণ্ডের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সহপাঠীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে দুই বৎসর কারাবাস যাপন

করিয়া পুনর্ব্বার তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কারাগারে অবস্থান কালে তিনি পোলীয়ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

পুনর্ব্বার বিদ্রোহ অপরাধে জড়িত হইয়া তাঁহাকে পল্লিগ্রামে পলায়ন পূর্ব্বক বহুকাল সমাজ হইতে দূরে বাস করিতে হইয়াছিল। এবং অবশেষে পোলাণ্ড ত্যাগ করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জর্ম্মনীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যুকালে আর স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। সেখানেও বিস্মার্কের রাজনীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন পর্ব্বততুল্য কঠিন প্রতিভাব দ্বারা আলোড়ন পূর্ব্বক কিরূপ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রমন্থন করিয়া এই পোলীয় যশস্বী অমরতাসুধা লাভ করিয়াছিলেন। পোলাণ্ডে একটি বৃহৎ জাতীয়-হৃদয় ছিল বলিয়া সেখানে জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্যবীর এত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে সাহিত্য এমন প্রভূত বলে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই লেখক রচিত "হুহুদি" নামক একটি উপন্যাসগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে, পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা যে এই দুই হৃদেরীয় ও পোলীয় লেখকের উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ, ইহারা উভয়েই স্বস্ব দেশে এক নব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ইহারা যেমন স্বদেশের সাহিত্যকে গতিশক্তি দিয়াছেন তেমনি তাহার চলিবার পথও স্বহস্তে খনন করিয়াছেন। এমন এমন কোন বিঘ্ন নাই

যাহা তাঁহারা নিজে স্বভাষায় প্রচলিত করেন নাই। শিশুদের সুখ-পাঠ্য মনোরম রূপকথার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহারা নিজে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাকে বিদ্যালয়ে বদ্ধমূল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে সুস্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের ক্ষমতা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু জাতির সজীবতাও সূচনা করে।

আমাদের দেশে লেখকগণ বিচ্ছিন্ন বিষণ্ণ সঙ্গবিহীন। তাঁহারা বৃহৎ মানবহৃদয়ের মাতৃসংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে বসিয়া আপন উপবাসী শীর্ণ প্রতিভাকে নীরস কর্ত্তব্যের কঠিন শাসনদণ্ড কেন মতে পালন করিয়া তুলিতে থাকেন। সামান্য বাধা সে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সামান্য আঘাতে সে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, দেশব্যাপী নিত্যপ্রবাহিত গতি প্রীতি আনন্দ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া সে আপনাকে সতত সতেজ রাখিতে পারে না। অল্পকালের মধ্যেই আপনার ভিতরকার সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া রিক্তবল রিক্তপ্রাণ হইয়া পড়ে। বাহিরের প্রাণ তাহাতে যথেষ্ট প্রাণ দেয় না।

কিন্তু যথার্থ সাহিত্য যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। যাহা অনুভব করিতেছি তাহা ব্যক্ত করিতে পারিব, যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব, যাহা লাভ করিতেছি তাহা বিতরণ করিতে পারিব এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত [illegible] বারণ হয়। আমাদের বঙ্গদেশে সেই বিরাট ক্ষমতা [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এখনও সেই জাতি নাই যে [illegible] করিবে। তাহারই অপেক্ষা করিয়া আমরা পথ চাহিয়া [illegible]

যাঁহারা বাঙ্গলার সদ্যোজাত সাহিত্যের শিয়রে জাগরণপূর্ব্বক নিস্তব্ধ রজনীর প্রহর গণিতেছেন তাঁহারা কোন উৎসাহ কোন পুরস্কার না পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এক সুমহৎ আশা জাগ্রত দেবতার ন্যায় সর্ব্বদা বরাভয় দান করিতেছে, তাঁহারা একান্ত বিশ্বাস করিতেছেন যে এই শিশু অমর হইবে, এবং জন্মভূমিকে যদি কেহ অমরতা দান করিতে পারে ত সে এই সাহিত্য পারিবে।

বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ।

১৮৭৯।৮০ সালের বর্ষাকালে চুঁচুঁড়ায় প্রথম বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মনে পড়িতেছে, সে দিন রথ যাত্রা এবং আমার সহযাত্রী অতুল বাবুতে আর আমাতে ট্রেণ ফেইল্ করিয়া অনেকক্ষণ হাবড়ার ষ্টেসনে বসিয়া ছিলাম।

মিষ্টার অতুলকৃষ্ণ রায় তার পর য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন —নানাদেশ দর্শন এবং বিস্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাহচর্য্য করিয়া সম্ভবতঃ তিনি সেদিনকার বর্ষাধৌত প্রভাতটীকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনে সে একটা নব যুগ। সাহিত্য চর্চ্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিম বাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন: সৌভাগ্যগর্ব্বের একটা আনন্দ-হিল্লোল আমার সমীর মন অভিসিক্ত করিতেছিল।

চুঁচুঁড়ার ঘোড়াঘাটে আমাদের গাড়ী যখন পৌঁছিল, বঙ্কিম বাবু তখন আফিসের পোষাক ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন—এগারটা বাজিতে বেশী দেরী নাই। বলিলেন, চিঠি পাইয়া প্রাতঃকালে

আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। আহারান্তে আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে কথাবার্ত্তা হইবে। সেই প্রথম দর্শনে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিতে প্রতিভার যে জ্যোতি দেখিয়াছিলাম, আর কখন সেরূপ দেখিয়াছি, মনে হয় না।

প্রায় তিনটার সময় আবার দেখা হইল। ইজিচেয়ারে বসিয়া বঙ্কিম বাবু ধূমপান করিতেছিলেন—আলবোলায় সাজ সজ্জা এবং মুখনলীতে দীর্ঘ নল দেখিয়া আমার "বিষবৃক্ষের" হুঁকার স্তব মনে পড়িতেছিল। তখন ডায়েরি লিখিতাম না—কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, তাহার সারাংশ মাত্র মনে আছে। কথায় কথায় বঙ্কিম বাবু বলিলেন 'এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখিনা – ইংরেজী ভাষাটা ভারি Insincere বলিয়া আমার মনে হয়।" আমার বিশেষ করিয়া বলিলেন, "মাসিক সমালোচকে" আপনার প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই। প্রবন্ধটীতে আমি লিখিয়াছিলাম, ইদানীন্তন কালে বঙ্কিম বাবু দেশের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে এবং সংস্কৃত সমালোচনায় বঙ্গ সাহিত্যের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে তাহা নহে। কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'কাঁঠালপাড়ার ছেলেরা দেখিতে পাই সকলদিগকে আগেকার মত প্রণাম করে না, নিজের বাড়ীর রথ দেখিবার জন্য তাঁহার অপবাহ্নে কাঁঠালপাড়ায় যাইবার কথা, অতএব আমরা বিদায় হইলাম। প্রথমে আসিয়া আমি বঙ্কিম বাবুকে নমস্কার করিয়াছিলাম বলিয়া হরকদেব প্রভৃতি তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া উঠিবার সময় সলজ্জভাবে প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিলেন। জামাতা রাখাল বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শ্রীশ বাবুকে আর বেহাইকে জল

খাওয়াও।" এই সময়ে বাবু চন্দ্রশেখর কর আসিয়া পৌঁছিলেন—বঙ্কিম বাবুর কাঁঠালপাড়া যাওয়া হইল না।

ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি তাঁর সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম। "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম" প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক দিন গিয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবু কথায় কথায় বলিলেন "কই চন্দ্র তুমি বাঙ্গলা লেখা ছাড়িলে, বাঙ্গলা যে আর পড়িতে ইচ্ছা করে না।" "রাজসিংহ" তাহার কিছু দিন আগে বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিম বাবু তাঁর জান বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, "এঁরা বলেন আমার সৃষ্ট চরিত্র গুলিতে এখনকার ছেলে গুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।" বলিলেন, "কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।" চন্দ্রশেখর বাবুকে এবং আমাকে একযোগে বলিলেন, মাণিকলালের হাতে ২।১ টা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বঙ্কিম বাবু কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্প দিন পরে রাজসিংহ প্রথম সংস্করণ বাহির হইল। আর একদিন চন্দ্রশেখর বাবুর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেদিন বাবু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবুর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। বঙ্কিম বাবু চন্দ্রনাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওকে চেন না?—উদ্ভ্রান্তপ্রেম!" মনে হইতেছে এই দিন সন্ধ্যার পর বহরমপুর হইতে বঙ্কিম বাবুর একটি প্রাচীন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সে দিনের আনন্দ

এক কথা একবার আমার মনে জাগিতেছে। বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুত্রকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পড়?" উ—Fourth year, Presidency college. বঙ্কিম বাবু—ব্রাণ্ডলের সঙ্গে আলাপ নেই? উ—না। বঙ্কিম বাবু—সে কি হে—এক ক্লাসে পড়, আলাপ নেই? সঞ্জীববাবু বলিলেন "তা জাননা বুঝি? এখনকার ছেলেদের ভেতর নাম জিজ্ঞাসা যে একটা ঘোর বেয়াদবি। ওর একটা গল্প আছে। এক নব্য শিক্ষিতের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের এক কুস্থানে দেখা হয়। বৃদ্ধ ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে তার নামটি কি? নব্য বাবু কষ্টে নাম বলিলেন। বৃদ্ধের কুবুদ্ধি আবার প্রশ্ন "মশায়ের পিতার নাম?" বাবুটী চটে আগুন, ঠাট্টা করেন আর কি! ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া অধিকারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নব্য বাবুটীকে সুধাইল "বাবা আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ছেলেরাই চটিবে, আপনাদের রাগ হেন?" তারি হাসি পড়িয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় গিয়া দেখি, অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি। নবীন বাবু কথায় কথায় "আনন্দমঠের" সুপরিচিত "বন্দেমাতরম্" গীতিটীর একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিম বাবুকে শুনিলেন, এমন ভাল জিনিসটীকে আধসংস্কৃত আধবাঙ্গলায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। কাহারও ভাল লাগে না। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিলেন—"কাহার ভাই, ভাল না লাগে পড়োনা। আমার ভাল লেগেছে, তাই ওরকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগবে কি না ভেবে আমি লিখি না।"

কিন্তু যে আমি বাঙ্গালার ভালোবাসিতাম। ১৮৮২ সালের

জুলাই মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর সে ব্রত পালন করিয়াছিলাম। এই কাল মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেকবার আমার দেখা শুনা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহার প্রতি আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারিনা। গুরুশিষ্যের যে সম্বন্ধ, এদিকে গাঢ়স্নেহ এবং প্রীতি, অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা—এই সেই সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। আমার নিজের কথা আমি আদৌ স্মৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বলিতে পারিব না।

রাজসাহী কলেজের শিক্ষক বাবু লোকনাথ চক্রবর্ত্তী "আর্য্যদর্শন" পত্রে "শৈবলিনী" চরিত্র সমালোচনা করেন। সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্র চলিয়াছিল। লোকনাথ বাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন যে দুর্গেশ-নন্দিনীর অভিনব সংস্করণে বিমলাকে নূতনরূপ দেওয়া হইল কেন? বঙ্কিম বাবু উত্তর দেন যে একশ্রেণীর অনুকরণ প্রিয় লেখক বিদ্যাদিগ্গজ চরিত্রের নামে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখবন্ধ করিবার জন্য তাহাকে সে চরিত্রের কোন কোন স্থল নূতন করিতে হইয়াছে। প্রতাপ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে "তোমার বিদ্বেষ ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম" সেইস্থল উল্লেখ করিয়া লোকনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে প্রতাপের অসাধারণ বলবান চরিত্রে সেরূপ ভাব কেন? বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছিলেন যে প্রতাপ বস্তুতঃ অসাধারণ হইলেও নিজের প্রতি তাহার বিশ্বাস তেমন দৃঢ় ছিল না। সেই তাঁহার মহত্ত্ব এবং তাহাই প্রকৃতি সঙ্গত।

গঙ্গীর বাবুর সঙ্গে একদিন আমার গ্রীক্ লাওকোয়েনের কথা হইতেছিল। তিনি বুঝাইতেছিলেন, গ্রীক্ শিল্পী সেই প্রস্তর মূর্ত্তিতে কি সুন্দর কাব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিষদগ্ধ লাওকোয়ন সর্পবেষ্টিত এবং আসন্ন মৃত্যু হইয়াও মনে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র দুটিকে যত্নে

রক্ষা করিতেছেন, সেই অবস্থায় দৃঢ় ওষ্ঠে অধর চাপিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য বিধাতা দেবতাদের জানাইতেছেন, অদৃষ্ট লিপি অখণ্ডনীয় জানিয়াও তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সঞ্জীব বাবু বলিলেন এইখানে শারীরিক বলে ধর্ম্মবল মিশিয়াছে এবং মাঝে একদিন বঙ্কিম বাবু কুমারসম্ভব হইতে হিমালয় বর্ণনা পড়িতে পড়িতে পোষ্টশাকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, কোন কবিতাতেই কেবল প্রকৃতি বর্ণিত হয় নাই—সর্ব্বত্র অন্তঃসৌন্দর্য্য নিহিত আছে। শুনিলাম সেদিন প্রায় রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে কাব্যালোচনা করিয়াছিলেন। আমার সমক্ষে সেই রাত্রির কথা তুলিয়া বঙ্কিম বাবুর একজন বন্ধু বলিলেন "তোমার সেদিনকার কথা মত বোধ হয়—কিছু লিখিবে, কিন্তু তাহার ভাষা তত ভাল নহে।" আমি বঙ্কিম বাবুকে বলিলাম 'আপনিই কেন লিখুন না?' বঙ্কিম বাবু উত্তর দিলেন "আমি বুড়া হলাম, আর পারিনে, এখন তোমরা দেখ।"

১৮৮৩—৮৪ সালের বসন্তকালে কিছু বিপদগ্রস্থ হইয়া আমি কলিকাতায় আসি। আমার গৃহিণী এক অদ্ভুত রকমের হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন উহা Clairvoyance. এই রোগ ডাক্তার সরকার অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করেন। আমার ডায়েরিগুলি যদি কখন ছাপা হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ হইবে। এখানে উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এইটুকু বঙ্কিম বাবু তদুপলক্ষে নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথা আমায় বলিয়াছিলেন।

২১শে ফাল্গুন বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। আমার সহধর্ম্মিণীর অসুখের কথা এবং তাঁহাতে কতকগুলি শক্তি বিকশিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন "রোগ মানসিক

নয়। একটা কথা যেন মনে রাখা হয়। রোগিনীকে বেশ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে, হিষ্টিরিয়া দৌর্ব্বল্যেই হয়।" কথার কথায় আমি তাঁহার নবেল সমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। হাসিয়া বলিলেন "সব নবেলেই আছে বটে কিন্তু কেন থাকে জানিনা।" আমি বলিলাম "আপনার পিতার সম্বন্ধীয় সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীব বাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে শৈশবাবধি তার দরুণ মনে এক্‌টা impression আছে।" বঙ্কিম বাবু—"সে গল্প শুনিয়াছি বটে কিন্তু সে জন্য কিছু হইয়াছে আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি।" আমি বলিলাম, "বইয়ের অনুরূপ কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কলাপ কখন দেখেছেন কি না?" একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন "না।" তারপর সিনেট সাহেবের পুস্তকের কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন "সিনেট দেখাইয়াছেন বটে যে মানুষের শক্তি কত বিকশিত হইতে পারে। কিন্তু Theosophy এদেশে আসিবার পূর্ব্বে আমি তা লিখেছি।" পৌষসংখ্যা বঙ্গদর্শনে "দেবী-চৌধুরাণী" কার্ লেখা জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, উহার "Mysterious author-ship." আমি বলিলাম তাঁর লেখা বলিয়াই আমার বোধ হয়েচে। উত্তর "অনেকে তা বলেন না।" একদিন বঙ্কিম বাবুর বাড়ী গিয়া দেখি তাঁহার নিকট হেমবাবু, চন্দ্রনাথ বাবু এবং সঞ্জীব বাবু বসিয়া আছেন। আমি আসিবার আগে ইহাদের ভাবি একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয় universityতে মেয়েদের বি, এ, উপাধি লাভ উপলক্ষে হেম বাবুর স্বরচিত কবিতাটী। হেমবাবু ইংরেজীতে বলিতেছিলেন "তোমাদের কোন উৎসাহ নাই, জীবন নাই।" সঞ্জীব বাবু বলিলেন "ইহাতে বুঝা যাইতেছে তুমি সকলের ছোট।" তখন হেম বাবু সঞ্জীব বাবুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন, দুজনে একটু রহস্য চলিল। পরে হেম বাবু

বঙ্কিম বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "Sentiment governs the world, not logic." বঙ্কিম বাবু বলিলেন "তা ত বটেই।" পরে অন্য কথা আসিয়া পড়িল।

সেদিন চৈত্র সংক্রান্তির পর সাক্ষাৎ কালে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'অবিনাশ কাল এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমার পরিবারের সম্বাদ পাই। নূতন বাসায় বাতাসের সুবিধা কেমন? আমি নিজে গিয়া দেখিয়া আসিব। ছাদে রোগিনীকে শয়ন করানর ব্যবস্থা করা যায় কি না? আমার মধ্যমা কন্যাটী সেবার হিষ্টিরিয়াতে দুইমাস কষ্ট পায়। যে ঘরে তাকে রাখা হয়, দিন রাত্রি তা খোলা থাকত, এত বাতাস যে সহজ লোকের সেখানে থাকা অসম্ভব। মাঠের ভিতর ঘর। যা তা খাওয়াইতাম, দুমাসেই সারিয়া গেল।" সঞ্জীব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, অলকট্ সাহেব আসিয়া কি করিল? আমি উঁহার ও মিসেস্ গর্ডনের কার্য্য বর্ণনা করিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় mesmerize করিতে জানেন। একদিন তিনি (বঙ্কিম বাবু) ডাক্তারি কোন পুস্তকে পড়িতেছিলেন, কোনোর উপর mesmerize করার মত অঙ্গুলি চালনা করিলে সোরাপি বোধ হয়, তবে ন্যাতুলে কর্পূর মাখাইতে হয়।" সঞ্জীব বাবু বলিলেন তাঁর নিজের ও কিছু কিছু mesmeric power আছে, তিনি উহার দ্বারা নিজের স্ত্রীর সেরা আরোগ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সেরা স্পর্শ করিতে হয় নাই। বঙ্কিম বাবু বলিলেন 'শ্রীশবাবু, সকাইত বেরিয়ে। আমার একটা কথা শুনে কাজ করে দেখ দেখি। কাল প্রাতে স্নান করে বেলপুর খাইও, আর কিছু খেওনা। সমস্ত দিন এক মনে চিন্তা করো কিসে তোমার পরিবারের পীড়া ভাল হবে। মনকে পবিত্র রেখো—মনে পাপচিন্তা যাতে না হয়। সন্ধ্যার সময় একবার তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে তাকে

স্পর্শ করিও। ইহাতে বেশ বিশ্বাস করে কাজ করো, নহিলে করো না।" আমি সম্মত হইয়া আসিলাম।

পরে বৈশাখ সন্ধ্যায় প্রাক্‌কালে বঙ্কিম বাবুর কাছে গেলাম। তখন তিনি বৈঠকখানার বাহিরে অনাবৃত শরীরে লাভস্ এ বিপিন বাবু এবং একটী দৌহিত্রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বঙ্কিম বাবুর রং যে কত ফরসা, মুখ দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। আমার পনি বাবুর পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতেছে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, সোমবারে মেজদাদা (সঞ্জীব বাবু) ফিরিলে একত্রে দেখিয়া আসিবেন। সঞ্জীব বাবু সিদ্ধমাইজ্ করিতে জানেন। বঙ্কিম বাবু নিজের তৃতীয়া কন্যার পীড়ার গল্প করিলেন। এক দিন তার দাঁত খোলে নাই। ডাক্তার কেলি নাসিকা দ্বারা আহার করাইতেন। তাহার শ্বশুরালয় কলিকাতা হইতে হাবড়ার বাসায় লইয়া যাওয়া অতি কষ্টকর হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু ভৌতিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা হিষ্টিরিয়া বলিয়াছিল। বলিলেন, তাহাদের ঝাড়া ঝোড়া ও mesmerism, জলপড়া mesmerized water, এই সকল উপায়ে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা হয়। আমার কন্যাকেও mesmerize করার উদ্যোগ হইয়াছিল। যদি কাহাকেও না বল, একটী পরামর্শ দিই। তারকেশ্বরের মানত করিও, তাহাতেও উপকার হয়। আর কাব কথা বলিব? জজ্ ব্রহ্মেশ্বরলাল শীল ঐ রকমে সারিয়া গিয়াছেন। অনেকেই Sceptic তাই এসব কথা সকলকে বলি না। কিন্তু অনেক সত্য এতে আছে। তোমার বিশ্বাসের জন্য আরও দুএকটা গল্প বলি। আমার জ্যেষ্ঠ ভাই তারা চরণ বাবুর কন্যাটীর বয়স যখন ৬ বছর, তখন তার শ্বাস কাসও জ্বর হয়। কিছুতে ভাল হয় না দেখিয়া নারাচরণ বাবুর স্ত্রী মেয়েটীকে লইয়া কলিকাতায় আসেন। আমি তখন এখানে সাঁওতালে থাকি।

মহেন্দ্র বাবু তখন এলোপেথি হোমিওপেথি দুই মতেই চিকিৎসা করেন, এত নাম হয় নাই। তিনি ও আর আর ডাক্তারেরা বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন, তবে বাতাস মাত্র আসিতে দিতেন না একটু সাগু মাত্র খাইতে দিতেন, তাও হজম হইত না। প্রাতে আসিয়া নল পরীক্ষা করিয়া প্রত্যহ মহেন্দ্র বাবু সন্দেহ করিতেন যে সাগুর চেয়ে আরও কিছু বেশী খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিছুতে কিছু হলো না—মেয়েটী বাঁচে না। নিজে গিয়া আমি তাকে বাড়ী রাখিয়া আসি—রেলের কষ্ট তার সহে কি না মহেন্দ্র বাবু সন্দেহ করিয়াছিলেন। তার পর বাড়ী গেলে একনাগী কর্ত্তা-ভক্তা আসিয়া মেয়েটীকে দেখে বলিয়াছিল যে সেটী কেন তাকে দেওয়া হোক্ না। তাঁরাত তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, সে যদি কোন উপায়ে মেয়েটিকে বাঁচতে পারে তবে মেয়ে তাহারই হবে। শেষে মেয়েটীর চিকিৎসা করিতে সম্মত হয়ে বলে যে সে যা বলিবে, তাহাই করিতে হবে। প্রথমে মেয়েটীর গলায় একটা কিনের পুঁটুলি বাঁধিয়া দিয়া তাকে পুকুরে স্নান করাইতে বলে: তাতেও সন্তুষ্ট নয়। বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, আবার সেই গলে মেয়েটীকে ছাড়িয়া দিল। পরদিন থেকে উপকার বোধ হতে লাগল। মেয়েটী ক্রমে বেঁচে উঠল। এখন সে বেঁচে আছে, বয়স বিশ বৎসর।" আমি বলিলাম এসকল ব্যাপারে আমার বড় বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাঁর "রজনীর" সন্ন্যাসী চরিত্র এবং লর্ড লিটনের একখানি নবেল পড়িয়া বোধ হইয়াছে যে তাহা অসম্ভব নহে। বঙ্কিম বাবু হাসিলেন, বলিলেন অনেক দেখিয়া তবে তিনি লিখিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের কথা একটু হইল। "আনন্দমঠ" সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের মত ও প্রশংসার কথা বলিলাম। উহার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন বলিলেন "গিয়া-

হিলাম কিন্তু অভিনয় ভাল হয় নি। তাই ডাক্তার সরকারকে লইয়া যাইনি, নহিলে সরকার যাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।" বঙ্কিম বাবু শেক্সপীয়র থিয়েটরের উপর বড় চটিয়াছেন, বলিলেন এখন উহা ভদ্রলোকের যাইবার যোগ্য স্থান নহে। কলকাতাগুলা অসভ্য ছোঁড়া আর বেশ্যা হা হা করিয়া হাসে—বড় অভদ্র হইয়া আসিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, থিয়েটরের উন্নতির জন্য তিনি ম্যানেজারদিগকে উপদেশ পরামর্শ দেন কি না? বলিলেন, "বেশী নহে, তা বুঝিবে কে?"

এই সময়ে বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে এক দিন দেখা করিতে আসেন। তিনি উঠিয়া গেলে রাধালকে বলেন, "ইনি নিশিকান্ত, বড় বিদ্বান।" একটু পরে হাসিয়া বলেন, "আমি ত সংস্কৃত বল্‌তে পারবই না, তিনি য়ুরোপে বসিয়া আমার বই পড়িয়াছেন।"

মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একটু মনান্তর হওয়ায় এই সময়ে বঙ্কিম বাবুকে হাবড়ার পৃথক বাসা করিতে হইয়াছিল—মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে গিয়া আসেন। আমি আসিয়া দেখি ইজিচেয়ারে বসিয়া তিনি অন্য চিত্তে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মত এই যে মস্তিষ্কের পোষণ জন্য প্রচুর পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। বলিলেন, তাঁর শরীরে এমন বল নাই যে দশ সের জিনিস তুলিতে পারে অথচ অভিশয় অধিক আহার করিয়া থাকেন। হুগলী অবস্থান কালে বাবু জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির সঙ্গে দিন কিরূপ ভয়ানক আহার করিয়াছিলেন সে গল্প করি আপাততঃ তত বেশী খাইতে পারিতেছেন না বটে কিন্তু না খাইলে তিনি দুই বেলায় চারটে মুরগী, আটটা ডিম ও আ

মিলিস প্রভৃতি পাইতেন। চারটে যুবকীর কথা শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলে বলিলেন "তাহা এখনও পারি।" বলিলেন "মানসিক একটা খাদ্য করিতে হয়, এত না খেলে চলে না।" জিজ্ঞাসা করিলাম "যৌবনাবস্থায় কি এমন আহার করিতে পারিতেন?" উত্তর—"না, এখন পারি।" কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর কোন্ পুস্তক তাঁর মতে বেশী দিন টেঁকিবে? উত্তর—"বলা বড় শক্ত, বোধ হয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'।" প্রশ্ন—"বিষবৃক্ষ" কত দিনের লেখা? উত্তর—১৮৭২ সালের। আর পুরে "দেবীচৌধুরাণী" লিখিয়াছি। প্রশ্ন—"তা কি শেষ হয়েছে?" উত্তর—"না এখনও হয় নাই।" প্রশ্ন—আচ্ছা আপনি ত অনেক চরিত্র লিখেছেন, বঙ্কিম বাবু নিজের চিত্রিত চরিত্রগুলির অধিকাংশ জীবিত বা মূর্ত্তি অবলম্বনে লিখেছিলেন, আপনার চরিত্রগুলি কি তেমন? উত্তর—"সেই রকম বটে, কিন্তু তার উপর অবশ্য রং ফলান।"

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি একদিন বারের কথা। শনিবার, প্রায় পাঁচটার সময় বঙ্কিম বাবুর ফটোগ্রাফে বাসায় গেলাম। রাখালের কাছে শুনিলাম "মৃণালিনী" নাটক পরিবর্ত্তনে অনেকটা বদল হইয়াছে। দুইজনে পুরাণ ও নূতন পুস্তক লইয়া মিলাইতে লাগিলাম, দেখিলাম পুরাণ পুস্তকের দুই অধ্যায় একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অনেকটা মাত্র কথায় দুই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ পরিহারের চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি বাবাকে বলিলাম, এ নাটক ও ভাষাংশে আগেকার চেয়ে ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু বোধ সাধারণের বোধগম্য কিছু ক্ষতি হইয়াছে। সেক্সপীয়র তাঁর নাটক লেখার সাধারণ পর্য্যায় ঠিক করিয়া আধুনিক সমালোচকগণ তাঁহাদের মানসিক ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতেছেন। বাবুর গ্রন্থসম্বন্ধে পরবর্ত্তী সমালোচকদের সে সুবিধা ঘটিবে না।

বুন

ছিলেন। আমাদের দুজনকে
এবং আমার প্রেমমত বলিলেন,
য়াছেন। তখন আমরা উভয়ে
রেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা উপলক্ষে
রের বৃত্তান্ত পড়িতেছিলাম।
বারাকপুরের লড়াই পড়চ না

রণে তাঁহাকে অতিশয় রাগিতে
ল না। মালদহে থাকিতে মাথাব
ছে, ইহা আর সুধরাইল না।
এইরূপ :—যে বাড়ীতে ছিলেন,
পরিবার সঙ্গে ছিল না।
কে আসিয়া
করে? কি
ঢাকবেরা
হইতে মরি
মূর্চ্ছিত
আ
বা
দরকা
াছে অসাম
হই
লেন।
জপুরে
র আর

শক্তি এখন বাড়িতেছে।
কথা সে দিন তুমি কুন্দ চা
ভাই বলেন, আমার নিজে
নূতন সংস্করণ আগাগোড়া প
রের যে দুর্দ্দশা করা হইয়াছে,
ইচ্ছা করেছিল।" আমি বলি
লিখিতে চেষ্টা করুন না?
শ্রোতা নাই, অভিনেতা নাই,
হয় নাই।" বলিলাম, "আ
পরে লোকে বুঝিবে। সুখ
বের। আমি জিজ্ঞাসা করি
হইল?" উত্তর—"এখন ও
ছাপিয়া কোন লাইব্রেরিতে
কোন কিছু হয় না। তোমর
দেশ, তারপর কথা উঠিল,
আমি বলিতে, যে সম্বন্ধে
পড়িলাম, সেখানে আ
কথা [illegible] হইল, তাহাতে
দিয়া দিলাম, তা আমি
[illegible] কাজ করিতে
[illegible] বলিলাম

বঙ্কিম বাবু
ভাই
ভাই
ভাই

না।" আমি বলিলাম, বঙ্গদর্শন আপনার নামের সঙ্গে অভিন্ন, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে? নবেল বরাবর ত চলিবেই, তাহাও মাঝে মাঝে দিতে হইবে। উত্তর [illegible] থাকে, চলিবে। কিন্তু প্রতি দিন মাসে ছমাস [illegible] নীরব উদ্যম বড় একটা লিখি নাই, কেবল [illegible] হইয়াছি। সৌভাগ্য যুগা পুরুষ অনেক লি[illegible] আমার কাছে বঙ্গদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে [illegible] ও পান। সেবারে দুই মাস [illegible] হয়েছিল। বিরক্ত হবে ৬। ৭ মা[illegible] না। আমি বলিলাম "আপনি কেন [illegible] আর আমার মত উৎসাহ নে[illegible] চন্দ্রনাথ বাবু "বঙ্গদর্শনের" ভার [illegible]লেন। বঙ্কিম [illegible]লেন "শ্রীশের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও" বাবু অস্বীকার হইয়া বলিলেন "তা হলে বঙ্গদর্শন ছাড়িব [illegible] হলে আর কাহারও সহায়তা লইতাম না। শ্রীশবাবুকে [illegible] এসে যদি [illegible] হইতে হইত।" একটু পরে [illegible] ইতে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও উকীল উমাকালী বাবু [illegible] খাজানার আইন বিলের আন্দোলন জন্য ইংলণ্ডে লর্ড [illegible] মুখনি খোঁড়া করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিম বাবু যোগেন্দ্র [illegible] টা দিতে লাগিলেন। চন্দ্র বাবুকে পান লইয়া থাকি [illegible] বঙ্কিম বাবু হাসিয়া বলিলেন—"এমন পাকে [illegible] ছিল। রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদের মত [illegible] ছিলেন না।

আমি দিয়ালা করিলাম, আমি "সুনর অর্থে ভাল নয়" ইহা [illegible]

না। উত্তর—"কোথায় লিখিয়াছি"? আমি—"বৃত্রসংহারের সমালোচনায়।" উত্তর—"ভুল লিখিয়াছ।" আমি কার্লাইলের কথা বলিলাম। [illegible] বাবু বলিলেন, তাঁরও সেই মত Beautiful includes good.

আমি বলিলা[illegible] জীবনী সম্বন্ধে কতক কতক নোট এখন [illegible] আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি? [illegible] লিলেন আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া [illegible] র কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় [illegible] বলা [illegible] নহে! জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ [illegible] কঠিন, কা[illegible] জীবনী হইল না। সে সব বলিলে [illegible] নেক কাজ হ[illegible] আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের [illegible] এক জনের প্রভ[illegible] আমার জীবনে বড় বেশী রকমের [illegible] বারের। আমার [illegible] বনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখি[illegible] তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না। [illegible] বড় ভ্রম প্রমাদ তিনি [illegible] নেন আর আমি জানি। আমা[illegible] র কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে বি[illegible] এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছি[illegible] তাহা হইতে হিন্দু ধর্ম্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য্য [illegible] কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে [illegible] আশ্চর্য্য [illegible] আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। [illegible] কের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী [illegible] ছিলাম ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখন [illegible] শুনা কখন ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য [illegible] ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ [illegible] কেলের উপর আ[illegible] একটু বেশী, কাজেই

তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি। নীতি শিক্ষা কখন হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না"। বঙ্কিম বাবু হাসিলেন। আমি বলিলাম "শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?" উত্তর—"কতক সত্য বটে কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েছে"। একটু পরে বলিলেন, "চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণস্বরূপা। আমি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। বলিলাম, স্ত্রীচরিত্রগুলির উৎকর্ষ আপনার বেশী, পুরুষও কয়টী অতি সুন্দর আছে। অন্যান্য নামের সঙ্গে বঙ্কিম বাবু অমরনাথের নামও করিলেন। আমি বলিলাম, "জীবনাথ আর প্রতাপ একই চরিত্রের দুইদল বিকাশ"। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন। বলিলেন, পূর্ণচন্দ্র বসু এইরূপ বুঝাইয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। আমি বলিলাম, অনেকে মৃণালিনীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে। উত্তর—"হাঁ, কাব্যাংশে খুব উচ্চ বটে"। তার পর নিজেই বলিলেন, "প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে স্কটের একখানি বইও পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় কোঁতের কিছু কিছু পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি"। চন্দ্রশেখরের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, উহার নীলা, দলনীর এমন উৎকর্ষ আপনার আর কোন কাব্যে দেখা যায় না। সেই "অগাধ জলে সীতারের" মত সুন্দর অপূর্ব্ব দৃ

বড় দুর্লভ। আমার কথা স্বীকার করিয়া রবিবাবু বলিলেন "অগাধ জলে সাঁতারের" মত দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।" নিজের জীবনী সম্বন্ধে বলিলেন, অন্যায় কাজের মধ্যে মদ খাই, কিন্তু ইহা বলিতে পারি সে জন্য কখন কোন দুর্নীতির কাজ করি নাই। খাইতে বলিলে একটু অপব্যবহার না হয় এমন নহে। প্রশ্ন—"মদে আপনার শারীরিক কোন অসুখ হয় না?" উত্তর—"না, বরং নদ ধরিয়া শরীর ভাল আছে। সে যেমনই হৌক, আমাদের মতন লোকের নিকট হইতে এটা বড় কুদৃষ্টান্তের কাজ করে। সেবার ডাক্তার গুরুদাস যখন হরিণঘাটায় ছিলেন, কতকগুলি স্কুলের ছাত্রকে মদ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া উত্তর পাইয়াছিল "দোষ কি মশায়? আপনি হলে বঙ্কিম বাবু খাবেন কেন?" গুরুদাস বাবু আমার নিকটে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি যেন ওটা ত্যাগ করি। দুই একবার ত্যাগও করিয়াছিলাম।" রবীন্দ্র বাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন? উত্তর—পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে লেটা নিখুঁত হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশী "গিফ্‌টেড্" কিন্তু "পুকোমাছু", এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সে দিন রবিকে বলেছি। রবি বলেন, আপনিও ত অল্প বয়সে "দুর্গেশনন্দিনী" লেখেন। আমি যখন "দুর্গেশনন্দিনী" লিখি, তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর। * আমি বলিলাম এই বয়সে দুইবার ইয়ুরোপ ভ্রমণে যাওয়াও আমার বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ সুবিধা। উত্তর—"তাতে উপকার হয়েছে কি না

পারি না। আমার ইচ্ছা আছে, পেনসেন লইয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া একবার ইউরোপ যাব।" [illegible] নিজের সৃষ্ট স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে আমার বলিলেন "এদেশে স্ত্রীলোকই মানুষ, সে কথা আমি এবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল বাঙ্গালীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন নায়িকা আর নাই। ইংরাজ সেনাপতি রাজনীতি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল "প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোকপুরুষ"। আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক "আনন্দ মঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাকিবে না।" ইডেন সাহেবের কথা উঠিল। বলিলেন "লোকটা যেমনই হোক্, খুব বুদ্ধিমান। আমায় একদিন বলিয়াছিল, কাপড়ের দুই খুব পপুলার, অনেক বোধ হয় বিক্রয় হয়। আমি উত্তর করি, আমাদের দেশ বড় গরিব, বেশী বিক্রী হয় না। ইডেন সাহেব—"৫০ টাকায় এক কাপড় বিক্রয় করিতে পারেন না?" তখন আমার কাছে শুনিলেন যে একটাকা দামেও লোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না। ইডেন সাহেব আর কিছু দিন এখানে থাকিলে আমার কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল হতো"। অন্যান্য সাহেবদের কথা হইল। অনেকে বঙ্কিম বাবুকে বলে, এ দেশে এই লোকটাই অদ্ভুতশক্তিশালী। কথা প্রসঙ্গে শুনিলাম রিয়াক্ সাহেব হোমিওপ্যাথ লোকনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সত্যই কি হেষ্টির বিরুদ্ধে পত্রগুলা বঙ্কিম বাবুর নিজের লেখা?

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "এক সময়ে মিলের শ্যামার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।" মিলের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, "শ্যামাটা" সব ভুল, ২৷৷ বিক্রয় হয় বটে কিন্তু আর ছাপাব না।

প্রায় পুস্তকেও অনেক ভুল, সেটাও ছাপাব না। তবে ভিন্ন পুস্তকাকারে উহার কথটা প্রবন্ধ দিব।

পূজার সময় নবমীর দিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা আহার করিতে বসিলে বঙ্কিম বাবু দেখ পরিবেশন করিলেন। নীচে কাঙ্গালী ভোজন হইতেছিল, হাসিয়া বলিলেন "দেখ চন্দ্র, নানা রকম রূপ, দেখিলে আর খেতে পারবে না।" বঙ্কিম বাবুর প্রথম যৌবন কালের একখানি ছোট ফটোগ্রাফ্ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতীশচন্দ্র আমায় দেখাইলেন। বঙ্কিম বাবু বলিলেন এখানি "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিবার আগের ছবি। বঙ্কিমবাবুদের বংশ বৈষ্ণব, পূজায় আমিষের সম্বন্ধ নাই। এক মেছুনী মাছ লইয়া দরওয়াজায় ঢুকিল, বঙ্কিম বাবু সেদিকে আসিতেছিলেন, একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "মাছ নাবাদ্দে, আজ মাছ আনতে নেই।" জ্যোতীশ বলিল "যা কখন হয়নি, তাই করলি ?"

বাহিরের বৈঠকখানায় টেবিলের উপর বঙ্কিম বাবুর আর একখানি বড় ফোটো দেখিলাম। খুব অল্প বয়সের ছবি, নবি বাবুর প্রথম যৌবনের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের মত চুল, মুখের চেহারাও অনেকটা সেইরূপ,—এখন কিছু মেলে না। চন্দ্র বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনকার চেহারার সঙ্গে কিছু কি মেলে ? আচ্ছা বলত, এখনকার চেহারা ভাল কি তখনকার ?' আমি তখনকারটাকেই পছন্দ করিলাম। চন্দ্রনাথ বাবু হাসিয়া আমার মতে মত দিলেন। বঙ্কিম বাবুও হাসিলেন, বলিলেন "এ কথা সেজ বাবু স্বীকার করেন না, বলিলে মারিতে আসেন।"

বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য।

অল্পদিন হইল সুইডেন্ দেশীয় একটি যুবক বঙ্গদেশে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া বাঙালীর বাড়িতে বাস করিতেন—বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষা দিতেন—যাহা কিছু পাইতেন তাহাতে পুঁথি কিনিতেন ও সেই বই ছাত্রদিগকে পড়িতে দিতেন, এবং গ্রামের দরিদ্র বালকদিগকে পয়সা বিতরণ করিতেন।

কোন য়ুরোপীয়কে অতিথি আত্মীয়ভাবে সন্নিকটে পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। ইংরাজ কিছুতে আপন বাসগৃহে ঢুকিতে পাবে না, আমাদের কাছে আসিতে তাহার ইচ্ছাও নাই তাহার অবকাশও নাই। সেই জন্য এই সুইডেন্‌বাসীর সঙ্গ আমাদের নিকট সবিশেষ মূল্যবান্ ছিল।

যে লোকটির কথা বলিতেছি তিনি আকারে প্রকারে ব্যবহারে নিতান্ত নিরীহের মত ছিলেন। কোট্ প্যাণ্ট্‌লুনের মধ্যে এত নম্রতা ও নিরীহতা দেখা আমাদের অভ্যাস নাই।

কিন্তু এই সাহেবটি আমাদেরই মত বিনম্র মৃদু প্রকৃতির লোক ছিলেন বটে তথাপি তাঁহার অস্থিমজ্জার মধ্যে য়ুরোপের লোহশক্তি নিহিত ছিল। দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সহজ লোকের মত, অথচ লোকটি যে-সে লোক নহে এমন দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর পাই না। আমাদের দিশী ভাল মানুষ মাটির মানুষ, দেব প্রকৃতি; কিন্তু ভিতরে কোন চরিত্র নাই, বহুল পরিমাণে খড় আছে। যথার্থ চরিত্রঅগ্নি থাকিলে সেই তৃণনির্ম্মিত নির্জ্জীব ভালমানুষী দগ্ধ হইয়া যায়।

এই কৃশ খর্ব্বকায় শান্তস্বভাব য়ুরোপীয় যুবকটির অন্তরের মধ্যে যে একটি দীপ্তিমান চরিত্র অগ্নি ঊর্দ্ধশিখা হইয়া জ্বলিতেছিল তাহা

তাঁহার প্রথম কার্য্যেই প্রকাশ পায়। তিনি যে স্বদেশ ছাড়িয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজন হইতে বহুদূরে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরজাতির মধ্যে আশ্রম গ্রহণ করিলেন এই দুঃসাধ্য কার্য্যে কে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইল। কোথায় সেই মেদুরধাবচুম্বিত য়ুরোপের শীর্ষ-বিলম্বিত সুইডেন আর কোথায় এই এসিয়ার প্রান্তবর্ত্তী খররৌদ্রক্লান্ত বঙ্গভূমি। পরস্পরের মধ্যে কোন সভ্যতার সাম্য, কোন আত্মীয়তার সম্বন্ধ, কোন ঐতিহাসিক সংযোগ নাই। ভাষা, প্রথা, অভ্যাস, জীবনযাত্রার প্রণালী সমস্তই স্বতন্ত্র। সমস্ত প্রিয়বন্ধন সমস্ত চিরাভ্যস্ত সংসার হইতে কোন দেশের রাজশাসনও কোন ব্যক্তিকে এমন সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিতে পারে কি না সন্দেহ।

কলিকাতায় বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণসভায় উৎসবক্ষেত্রে ধর্ম্মসমাজে এই শুভ্রকেশধারী সৌম্য প্রফুল্লমূর্ত্তি শ্বেতাস্য বিদেশীকে এক প্রান্তভাগে অনেকবার দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য যেন তাঁহার একটি বিশেষ আগ্রহ ছিল। অনেক সভাস্থলে আমাদের বক্তৃতা ভাষা আমাদের সঙ্গীতের সুর তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। ধৈর্য্য সহকারে হৃদয়ের অন্তর্দ্বার উদ্ঘাটনে আমাদের ভাবের মধ্যে যেন স্থান লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। পরজাতির গূঢ় হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিবার দ্বারস্থ যে নম্রতাগুণের আবশ্যক তাহা তাঁহার বিশেষরূপে ছিল।

ছাত্রশিক্ষার যে কার্য্যভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে অসামান্য কষ্টস্বীকার করিতে হইত। নরনারীর ভীড়ে অনাহারে অনিদ্রায় কলিকাতার পথে পথে সমস্ত দিন পরিভ্রমণ করিয়াছেন কিছুতেই তাঁহার অশ্রান্ত উদ্যমকে

পরাভূত করিতে পারে নাই। রৌদ্রতাপ এবং উপবাস তিনি কিরূপ সহ্য করিতে পারিতেন বর্ত্তমান লেখক একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে উৎসব উপলক্ষে গত বৎসর পৌষ মাসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিয়া প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হন। বিনা ছাতায় বিনা আহারে সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অপরাহ্ণে উৎসবারম্ভকালে ফিরিয়া আসেন—তখন কিছুতেই আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পদব্রজে ষ্টেশনে গমন পূর্ব্বক সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

একদিন তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া একেবারে বারাকপুরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে পুনর্ব্বার পদব্রজে ফিরিতে রাত্রি দশটা হইয়া যায়। পাছে ভৃত্যদের কষ্ট হয় এই জন্য সেই দীর্ঘ ভ্রমণ দীর্ঘ উপবাসের পর অনাহারেই রাত্রি যাপন করেন। কোন কোন দিন রাত্রে তিনি আহারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে গৃহস্বামিনী যখন খাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তিনি বলিতেন ভোজনে আজ আমার অধিকার ও অভিরুচি নাই—দিনের কার্য্য আজ আমি ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি নাই। প্রাতঃকালে আহার করিবার সময় তিনি রুটিখণ্ড গাছের শাখায় এবং ভূতলে রাখিয়া দিতেন, পাখীরা আসিয়া খাইলে পর তবে তাঁহার আহার সম্পন্ন হইত।

তাঁহার একটি সাধ ছিল আমাদের দেশীয় শিক্ষিত যুবকদের জন্য ভাল লাইব্রেরি এবং আলোচনাসভা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রৌদ্রবৃষ্টি অর্থব্যয় এবং শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়াছেন। যাহারা তাঁহার সহায়তা-

সাধনে প্রতিশ্রুত ছিলেন তাঁহাদের উৎসাহ অনবরত প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। অবশেষে আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন।

শুনা যায় এই লাইব্রেরি স্থাপন চেষ্টার জন্য গুরুতর অনিয়ম ও পরিশ্রমই তাঁহার পীড়ার অন্যতম কারণ। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে তিনি আমাদের দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন, দেশে আমার যে কোন আত্মীয় স্বজন নাই তাহা নহে, খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করাতেই আমি তাঁহাদের পর হইয়াছি। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার লাইব্রেরির কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কোন একটি ছাত্রের নিকট হইতে তিনি অগ্রিম বেতন লইয়াছিলেন, সেই টাকা তাহাকে ফেরৎ দিবার জন্য মৃত্যুশয্যায় তাহার বিদেশীয় নাম স্মরণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সেই তাঁহার শেষ চেষ্টা—এবং সেই ছাত্রকে সন্ধান করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—সেই তাঁহার শেষ অনুরোধ।

তিনি যদি এখানে আসিয়া তাঁহার স্বজাতীয়দের আতিথ্য লাভ করিতেন তবে আর কিছু না হউক্ হয়ত তাঁহার জীবন রক্ষা হইত, কারণ ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য য়ুরোপীয়ের পক্ষে কি কি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য সে অভিজ্ঞতা তিনি স্বজাতীয়ের নিকট হইতে লাভ করিতে পারিতেন। যদি বা জীবনরক্ষা না হইত তথাপি অন্ততঃ যেরূপ চিকিৎসা, যেরূপ আরাম, যেরূপ সেবা শুশ্রূষা তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত, বিদেশে মৃত্যুকালে সেটুকু হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত না। এবং য়ুরোপীয় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার জন্য অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত ছিল তাহাও পূর্ণ হইতে পারিত।

সুইডেনবাসী স্থামারগ্রেন্ সাহেবের বাঙ্গালায় আতিথ্যগ্রহণের সংক্ষেপ বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়াছি। তিনি এদেশে অল্পকাল ছিলেন, এবং যদিও আমাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রেম ও আমাদের হিতসাধনে তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল এবং যদিও তাঁহার অকৃত্রিম অমায়িক স্বভাবে তিনি ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি এমন কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই যাহাতে সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইতে পারেন সুতরাং এই বিদেশীয় বৃত্তান্ত সাধারণের আলোচ্য বিষয় না হইবার কথা। আমরাও সে প্রসঙ্গে বিরত থাকিতাম কিন্তু আমাদের কোন কোন বাঙ্গলা সংবাদপত্র তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসৎকার সম্বন্ধে যেরূপ নিষ্ঠুর আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে কোভ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

স্থামারগ্রেন্ মৃত্যুর পূর্ব্বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তাঁহার সেই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ হইয়াছিল। শাস্ত্রমতে অগ্নি যদিও পাবক এবং কাহাকেও ঘৃণা করেন না তথাপি হিন্দুর পবিত্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় ইহাতে কোন কোন হিন্দুপত্রিকা গাত্রদাহ প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন এ জাতি মৃত্যুর পরে তাহারা "হাড়িডোম" প্রভৃতি অনার্য্য অন্ত্যজ জাতির ন্যায় একস্থানে ভস্মীভূত হইতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যে শ্মশানে কোন সুইডেনবাসীর চিতা জ্বলিয়াছে সেখানে যে তাঁহাদের পবিত্র মৃতদেহ পুড়িবে ইহাতে তাহারা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

কিছুকাল পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন আমাদের স্বদেশপ্রেমিকতার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতাম যে, হিন্দুধর্ম্মে উদারতা বিশ্বপ্রেম

নির্ব্বিচার আতিথ্য অন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু জানিনা কি দুর্দ্দৈবক্রমে সম্প্রতি এমন দুঃসময় পড়িয়াছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও হিন্দুধর্ম্মকে নিষ্ঠুর, সঙ্কীর্ণ এবং একান্ত পর-বিদ্বেষী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

শ্রুতিতে আছে, অতিথিদেবোভব। কিন্তু কালক্রমে আমাদের লোকাচার এমন অনুদার ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে যে, কোন বিদেশীয় বিজাতীয় সাধু ব্যক্তি যদি আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন তবে কোন হিন্দুগৃহ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসঙ্কোচে স্থান দেয় না, তাঁহাকে দ্বারস্থ কুক্কুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে; এই অসহিষ্ণু মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে, অবশেষে আমাদের শ্মশানকেও কি আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব? জীবিত কালে আমাদের গৃহে পরদেশীর স্থান নাই, মৃত্যুর পরে আমাদের শ্মশানেও কি পরদেশীর দগ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে না?

যদি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধে কোন নিষেধ থাকিত তাহা হইলেও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া আমরা অগত্যা নীরব থাকিতাম। যখন সেরূপ নিষেধ কিছু প্রচলিত নাই তখন ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া, অকারণে গায়ে পড়িয়া বিদ্বেষ-বহ্নিকে প্রধূমিত করিয়া হিন্দুসমাজের কি হিতসাধন হইবে বলিতে পারি না।

শ্মশান বৈরাগ্যের মহাক্ষেত্র। সেখানে মতভেদ ধর্ম্মভেদ জাতি-ভেদ নাই—সেখানে একদিন ছোটবড়, ধনী দরিদ্র, দেশী বিদেশী সকলেই মুষ্টিকয়েক ভস্মাবশেষের মধ্যে সমান পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের হিন্দুসন্ন্যাসীরা শ্মশানে সমাজবন্ধনবিহীন মহা-

আলোক নিরঞ্জন নির্দ্দিকার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন, সেখানে সেই দেশকালাতীত ব্যাপ্তিনিমগ্ন বৈরাগ্যের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রীদেবীও কি পরজাতিবিদ্বেষী আপন সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র জাতাভিমান লইয়া কর্কশ শব্দে আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না!

আমাদের দেবতার মধ্যে যিনি কোন জাতিকে ঘৃণা করেন না, যাঁহাকে মহাদেবও সর্ব্বজাতির প্রতি অপক্ষপাতের কথা শুনা যায়। কিন্তু আজ তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র বিরাটভূমি হিমালয়ের প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরীগণ মৃতদেহের জাতিবিচার করিতে বসিয়াছেন—সে কি ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, না, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য?

এই সুবৃহদ্দেশীয় নিরীহ প্রবাসী প্রীতিপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া অতি দূরদেশে পরজাতীয়দের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, পাছে কোথাও অনধিকারপ্রবেশ হয়, পাছে বা কাহাকেও অজ্ঞাতে আঘাত লাগে, পাছে অজ্ঞাতসারে কাহারও পীড়ার কারণ হন, এই জন্য তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই ত্রস্ত সতর্ক বিনম্রভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন। সেই ম্রিয়মাণ নম্রদেহ মহাশয় ব্যক্তি কাহারও কোন অপকার করেন নাই, কেবল পরজাতি পরধর্ম্মীর চিত্তচেষ্টায় আপন জীবনপাত করিয়াছেন মাত্র। সেই অনল্পন্ন চেষ্টার ফল তাঁহার প্রতি কাহারো হস্তক্ষেপ হইতে অনুরোধ করিতেছি না। কিন্তু এই অকালমৃত বিদেশী বান্ধব প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুর অবমাননা প্রকাশ করিতে কি নিষেধ করা উচিত নহে?

যদি দৈবক্রমে কোন বিদেশী আপন আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়—তবে কৌতুক না [illegible] পরিশ্রমী—বঙ্গভূমি কি জননীর ন্যায় আপন [illegible] তাহাকে স্থান দিতে পারিবে? কিন্তু তাহার অকাল মৃত্যুর পরে—নকল ঘৃণার অবসানে শ্মশানভূমির মধ্যেও তাহার প্রতি কুকুরের ঘৃণা প্রকাশ করিবে? এই নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা কি আমাদের পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত, না, এই পতিত জাতির দুর্ব্বিবেকমাত্র?

এই প্রবাসী যুবক মৃত্যুকালে পবিত্র জন্মভূমির নিকটে কোন পবিত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন? আমাদের চরিত্র সংস্পর্শ, না

আমাদের সুদুর্লভ আত্মীয়তা? তিনি ব্রাহ্মণের ঘরের আসন, কুলীনের ঘরের কন্যা, যজ্ঞমানের ঘরের দক্ষিণা চাহেন নাই, তিনি হুইহুডলের উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া—কলিকাতার যে শ্মশানে 'হাড়ি ডোম' প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ নহে সেই শ্মশানপ্রান্তে ভস্মসাৎ হইবার অধিকার চাহিয়াছিলেন মাত্র। *

হায় বিদেশী, বঙ্গভূমির প্রতি তোমার কি অন্ধ বিশ্বাস! কি দুঃসহ স্পর্দ্ধা! মনে যত অনুরাগ যত শ্রদ্ধাই থাক্ পুড়িয়া মরিবার এবং মরিয়া পুড়িবার এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে জীবনে মরণে তোমাদের কোন অধিকার নাই।

অনধিকার প্রবেশ।

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুর বাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না।

হাজার শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার খুঁটিনাটি আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রামানাথ গ্রামের সর্ব্বময়ী অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি [illegible] হইয়াছিলেন পত্নীর নিকট এক দিনের জন্যও সে উপাধি [illegible] পাবেন নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উপাধি [illegible] করণ, তর্ক এবং বাকা সমস্তই তাহার পক্ষে, অর্থে পড়িয়াছিল, [illegible] পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয় [illegible]

---

* পাঠকগণ মনে করি[illegible] না আমরা, [illegible] তির নামোল্লেখ করিতেছি [illegible] সংবাদপত্রে

তেন না—কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি, নীরবে অতি বড় প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

প্রথমকালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার যো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সহবদ্ধ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লিবাসী ভদ্র পুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাঁহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনাবাক্যে অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে, সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মধ্যস্থলে উদ্যত উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভাল-

থাকিতে পারিবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক-অভাবে তাহাদের যে, কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। কনিষ্ঠের বয়ো বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটি কিছুও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নব দম্পতির মধুরোজ্জ্বল দৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে এ সম্ভাবনা তাহার নিকট নরকতিপয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্য প্রতিবেশিনীদের কানে বিষাক্ত হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি অনাবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের ভাল বসন ভূষণ আহারের নিয়মিত ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। স্বর্গে এক সময় ছিল যখন দেবতার অসুর দেবতা পূজা পাইতেন না। কারণ, পূজা নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিবার প্রতিমা স্বর্গে মন্দিরে ছিল। তাই সে ছিল নিরুপায়। গোপনে ধূপ গন্ধ ফুল নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে চালাচালি হইয়া যাইত। কিন্তু আজ কাল স্বয়ংকালীন পূজনে [illegible] আসিতেছে—উপদেবতা [illegible] কার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইতেছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার [illegible] করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে [illegible] অবলম্বন

করিয়া নাবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র খসিবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পাপি-পাট্য পবিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিপদা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্ব্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষ্যে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া নাবীবীজলতার বৃন্তলাগ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই! পর্ব্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়া দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকন্যাপরিকুক্ষি মাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয় সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সুখোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর সর্ব্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মাতৃভাবের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একাধারে জননী পত্নী দাসী। ইহার কাছে তিনি সলজ্জ, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রভেদের মন্দির এবং প্রভুত্বের মূর্ত্তিটি তাহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থ-তার বিষয় ছিল। ইহাই তাহার স্বামী পুত্র তাহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে, সে একটি মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে নারীমাত্রকে আহ্বান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কমিটি লাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভাল বাসিয়াই জানিত তথাপি তাহার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি পিসিমার বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার গভীর আকর্ষণ ছিল এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার

জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত! জনশ্রুতি আছে বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতে ছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন সে ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুই একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মজুমদারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, ঠাকুর মা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী কুটীরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জ্জনে পরিণত হইয়া ভূমিষ্ঠ—অবশেষে [illegible]

তাহার কাণ্ডজ্ঞানের প্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জগন্নিয়ন্তার পীলাসাদ কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাত্রিদেবের আর্ত্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন-সময়ে একটি স্ত্রীলোকের ভীতিকাতর ধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্ত্তী দীর্ঘশ্বাস শব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের মধ্যপথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

জয়কালী পশ্চাতে প্রবল পদশব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া ফিরিলেন—দেখিলেন হঠাৎ একটা অত্যন্ত মলিন শুষ্কবর্ণ ছায়া ভেলকি লাগিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশপূর্ব্বক ভূপর্য্যন্ত পর্য্যাপ্তপ্রায় মাধবী লতার মধ্যে প্রাণভয়ে লুক্কায়িত হইল।

সে লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ স্তোত্রপাঠকের সুগন্ধি নিঃশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দী তীরবর্ত্তী বেণু-বিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধাতার সেই প্রাণ-বিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল। পূজারি ব্রাহ্মণ অদূরে উপস্থিত ছিল। সে মহাশব্দে হইয়া লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। জয়কালী কদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা এটা নিয়ে যা! আমরা চলে যাচ্ছি।

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরঝি যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা জীর্ণ মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা স্বপ্নেও প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্ব্বজীবের সহদেবতা যখন ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনায়িকা অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

প্রলয়।

গত বৈশাখের সাধনায় প্রলয় শীর্ষক প্রবন্ধে আমার অনবধানতাবশতঃ একটি গুরুতর ভ্রম ঘটিয়াছিল। বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের কক্ষমধ্যে বস্তুতঃ ক্ষুদ্র গ্রহগুলি বর্ত্তমান নাই; তাহারা মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ মধ্যে অবস্থিত। আষাঢ় মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এই ভ্রমটি দেখাইয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আমার প্রবন্ধে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, অপূর্ব্ব বাবু তল্লিখিত প্রবন্ধে তাহা পূরণ করিয়াছেন। কুতূহলী পাঠককে অপূর্ব্ব বাবুর প্রবন্ধ পাঠে অনুরোধ করিতে পারি।

ভূবৃত্তগতের ব্যাপার এত জটিল যে, দিন তারিখ হিসাব করিয়া পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধে কোন কথার এখনও শেষ সিদ্ধান্ত রূপে নির্দ্দেশ চলে না। পৃথিবীর অবস্থিতির উপরে চন্দ্রের প্রভাব আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম। অপূর্ব্ব বাবু আর এক ধাপ উঠিয়া সেই বিষয়ে সূর্য্যের প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রাকর্ষণের ফলে যেমন পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা আছে, পৃথিবীর আকর্ষণ সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলে জোয়ার ভাটা সম্ভব। সূর্য্যের আকৃতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের আরও অভিজ্ঞতা না জন্মিলে সেই জোয়ার ভাটার ফলে সূর্য্যের "ঘূর্ণনগতি" ও পৃথিবীর "আবর্ত্তন গতি" কতদিনে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে বলা যায় না।

অর্ণার্স সাহেবের ক্ষুদ্র গ্রহগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান অসিদ্ধ ও অপ্রামাণিক, তাহা পূর্ব্বলেখে উল্লেখ করিয়াছিলাম। অপূর্ব্ব বাবু এই অপ্রামাণিকতা পাঠককে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

অপূর্ব্ব বাবু যেরূপ যত্ন ও আগ্রহসহকারে এই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রচার করিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গলা পাঠক সম্প্রদায়ের তরফ হইতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। হর্শেলের প্রেতাত্মা মন্ত্রভেদের জন্য তাঁহার প্রতি [illegible] বঙ্গ ভারতীর আশীর্ব্বচন তাঁহার রক্ষাকবচস্বরূপ হইবে। তিনি নির্ভয়ে রহস্যভেদে প্রবৃত্ত থাকুন।

সাধনা।

ভারতবর্ষে

বারাণসী।

আজ অপরাহ্ণে গাড়ি করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইলাম। খুব অল্প টাকার মধ্যে, একটা যুড়ি-ঘোড়ার গাড়ি, একজন কোচ্‌ম্যান, এক জন সহিস একজন পেয়াদা পাওয়া গিয়াছে। এই লোকগুলা চুপ-চাপ্, গম্ভীর ও অচলমূর্ত্তি। এই পেয়াদা গম্ভীরভাবে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলে, রাস্তার ভীড় সরাইয়া দেয়, আঁট-সাঁট হইয়া চাপকান পরে—নিজ কর্ত্তব্যের গুরুত্ব-বোধ যেন উহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ফুটিয়া বাহির হয়; শরীরের বাহুদ্বয় সংলগ্ন করিয়া রাখে, মাথা সিধা রাখিয়া, চলিতে চলিতে হাঁক্ দিতে দিতে দৌড়িতে থাকে।

এখানে শ্রম-বিভাগের অন্ত নাই। গাড়ি হাঁকাইবার জন্য কোচ্‌ম্যান চাই, গাড়ির দরজা খুলিবার জন্য সহিস চাই, পথিক-দিগকে সতর্ক করিবার উদ্দেশে হাঁক্ দিবার জন্য পেয়াদা চাই। য়ুরোপীয়দিগের এই সমস্ত আড়ম্বর না হইলে চলে না। য়ুরোপীয়দিগের হাঁটিয়া চলা, কিম্বা কোন জিনিষের মোটক হাতে বহন করা, নিতান্ত রীতিবিরুদ্ধ। কোন ইংরাজ বান্ধকর্ম্মচারীকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে লোকলস্কর ও জিনিসপত্রের ঝাঁক তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে থাকে। গত বৎসর রঙ্গুন-নগরে, এক-জন সামান্য সেনানায়ক আমার নিকট গল্প করিতেছিল, ভারতবর্ষে

কমালটা কুড়াইতে হইলেও সে ঘণ্টা বাজাইয়া চাকর ডাকিত। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের বাড়িতে শুদ্ধ 'পাইপ' সাজিবার জন্য এক-জন ভৃত্য বিশেষরূপে নিযুক্ত। প্রত্যেক সিভিলিয়ানের বাড়িতে পাঁচজন করিয়া চাকর থাকে। তা ছাড়া, মর্জি, সেতর, কটিওয়ালা, দোকানদার, মজুর প্রভৃতি তাঁহার বিবিধ অভাবের সরবরাহ করি-বার জন্য সকালবেলা তাহার বাড়িতে হাজির। পুরাকালে রোম নগরীতেও পেট্রিশিয়ানেরা এই প্রকার চাকরবাকর মক্কেল ও দাসত্ব-মুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিবৃত থাকিত। এইখানে গৌরা-ঙ্গেরাই প্রভু—আমীর-ওমরাও-স্থানীয়। অনেকেই ইহাঁদিগকে যাদুকর বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু আসলে লক্ষ্য করিয়া দেখিও য়ুরোপীয়েরা প্রতিদিন মদ্যমাংস সেবন করে বলিয়া এদেশীয় লোকেরা উহাদিগকে অশুচি ও অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করে। ইংরাজ-দের ঘোর অট্টহাস, বিবিধ ব্যায়াম-খেলা, বিবিধ অভাব, অসংখ্য গতিবিধি, অবিরাম উদ্যম; এই সকল কারণে, এই গম্ভীর-প্রকৃতি, অচঞ্চল, সূক্ষ্মরুচি হিন্দুজাতির নিকট উহারা অপেক্ষাকৃত স্থূল-রুচি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইংরাজের স্ত্রী ঘোমটা না দিয়া বাহির হইলে, তাহাতে লোকে মনে করে, উহাদের কোন লজ্জা-সম্ভ্রম নাই। জীব-সোপানে উহারা শূদ্রেরও বহু নিম্নে অবস্থিত। অনেক পাপ না করিলে কেহ য়ুরোপীয়ের দেহ ধারণ করিয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু সে যাহাই হোক্, এদেশীয় লোক, য়ুরোপীয়ের নিকট, ভয়ে ও বিস্ময়ে জড়সড়; কারণ, য়ুরোপীয়দিগের বাহুবল, য়ুরোপীয়দিগের ধন ঐশ্বর্য্য, য়ুরোপীয়-দিগের অস্ত্র-শস্ত্র, য়ুরোপীয়দিগের বহুসংখ্যক বিবিধ যন্ত্র—এই সমস্ত দেখিয়া হিন্দুরা উহাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মনে করে। এই যে মাঠ ময়দানের উপর দিয়া তারের সূত্র বিস্তৃত, ইহা দেখিয়া উহারা

কি মনে করে? এই যে একটা অদ্ভুত ধরণের বাক্স—কালো কাপড় দিয়া ঢাকা—স্মৃতি-মন্দির প্রভৃতির দিকে যাহার মুখ ফিরাইয়া সমসূত্রপাতে রাখা হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই বা উহারা কি ভাবে? আজ প্রাতে আমার মাজি-গাল্লারা আমার একটা ফোটোগ্রাফির সরঞ্জাম কিছুতেই স্পর্শ করিল না। আমি যখন কোন হুকুম দি, আমার ভৃত্য অবনত হইয়া, ক্রীতদাসের মত, বাক্সদ্বয় বুকের উপর উপর্য্যুপরি আড়-ভাবে স্থাপন করিয়া আমার কথা শ্রবণ করে। সিপাহীরা য়ুরোপীয় পর্য্যটক দেখিলে তাহারা সম্মানার্থ বন্দুক নামায়। ইহার প্রত্যুত্তরে য়ুরোপীয় পর্য্যটক নিতান্ত কৃপাভাবে অর্দ্ধভাচ্ছিল্য সহকারে ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করেন। এবং তাহার পরেই গাড়ির ভিতর গাড্ডিলভাবে বসিয়া—প্রথম ঘণ্টা বারো আনা, তাহার পর প্রত্যেক ঘণ্টা ছয় আনা হিসাবে ভাড়া দিয়া বিস্ময় হইতে বিস্ময়ে, প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে দ্রুতবেগে উপনীত হয়েন।

* * *

রীতিমত পর্য্যটক হইতে হইলে বিনীত শিষ্যের ন্যায় নগর-প্রদর্শক পাণ্ডার পদানুসরণ করিতে হয়। আমার পাণ্ডা, যে বংশানুক্রমে এই কাজ করিতেছে, সে আমাকে গঙ্গার ধারে লইয়া গেল। তাহার পর, একটা নৌকা করিয়া ওপারে যাওয়া গেল। আমরা মহারাজার প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। তিনটা বড় বড় মার্ব্বেলের প্রাঙ্গণ পার হইয়া মহারাজার নাট-মন্দিরে উপনীত হইলাম। সেখানকার অর্দ্ধ-হিন্দু ও অর্দ্ধ-বিলাতী আস্‌বাবের বিলাসিতা একটু বেশিমাত্রায় পরিস্ফুট। দ্রষ্টব্যের মধ্যে এক সারি চিত্র। সকলই মহারাজার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিকৃতি। তাঁহারা সকলেই যোদ্ধৃ-জাতি বীরত্বব্যঞ্জক ক্ষত্রিয়—শুভ্র সমান পরিচ্ছদ—পুষ্পগুচ্ছ কিম্বা অসি হাতে ক'রে—হাতটি বুকের উপর ন্যস্ত—দেখিতে অতি সুঠাম—

ভারি জম্‌কালো। উহার মধ্যে একজন দ্বিভঙ্গিম ভাবে দণ্ডায়মান—নাট্য-প্রহসনে যে ভঙ্গীতে অভিনেতারা রাজা সাজিয়া দাঁড়ায় কতকটা সেইরূপ। বাহুদ্বয় পার্শ্বে আলম্বিত; একটা বৃহৎ যষ্টির উপর একটা অঙ্গুলী ন্যস্ত—দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিলে রিগো-নামক চিত্রকরের চিত্রিত চতুর্দ্দশ লুইর চিত্র মনে পড়ে; মুখের দুই দিকে দাড়ি ফোলানো—তাহাতে বীরত্বের আস্ফালন ও বাহবা আকর্ষণ করিবার ভাব প্রকাশ পায়। তাহার পাশে, সেই একই দেয়ালে, প্রিন্স-অফ্-ওএল্‌সের চট্‌চটে দাড়িমেড়ে ছবি এবং ডার্বি ঘোড়-দৌড়ের বিজয়ী ঘোড়ার এক চিত্র। ঘোড়াটা বড় ও পাৎলা-ধরণের, পায়ে বুট ও মাথায় খুদে টুপি-পরা একজন খুদে জকি ঘোড়ার মুখ ধরিয়া আছে। এই সকল পুরাতন ছবি যাহা ইংলণ্ডের সকল পাঠশালাতেই সচরাচর দেখা যায়, তাহা এখানে মহামূল্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য ও অতীব যত্নসহকারে মূল্যবান ফ্রেমের মধ্যে সংরক্ষিত।

এই রাজা যিনি পবিত্র গোবৃন্দ ও শিবের মন্দির পোষণ ও রক্ষণের জন্য প্রতিদিন ১০০ টাকা করিয়া দান করেন, ইনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর জুবিলি-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। লোকে বলে, ইনি সেখানকার সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অতীব বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সেখানকার অশ্বের বৃহৎ আকার দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

* * *

সম্মুখে, গঙ্গার অপর পারে, সারি-সারি তটশোভী অট্টালিকার মধ্যে বানরদিগের একটা বৃহৎ মন্দির।

সেখানে দেবতারা বিরাজমান—সেই পাটখিলে রঙের দেবতারা প্রবেশ-দ্বারের থামাওয়ালা নীচে নিষ্কর্ম্ম সহকারে খেলাইয়া বেড়াইতেছে। প্রস্তরময় কারুকার্য্যের খোঁজখাঁজের মধ্যে বাদুল

বাঁধাইয়া ঝুলিতেছে। আমাদের আগমনে তাহাদের মধ্যে তুমুল কোলাহল—কৌতূহল পড়িয়া গেল। লম্বু-ধরণের এক এক বৃহৎ লম্ফ দিয়া আমাদের নিকট দৌড়িয়া আসিল।

দন্ত কিড়্‌মিড়্‌ করিতে করিতে, ঘনঘন চোখের পাতা ফেলিতে ফেলিতে, উদ্বিগ্নভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। মন্দির-দ্বারস্থিত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কিছু দানা ক্রয় করিয়া বানরদিগকে ভক্তিভাবে নৈবেদ্য-উপহার প্রদান করিলাম। অমনি তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ চীৎকার—তীব্র তারধ্বনি সমুত্থিত হইল। পরস্পরের লোমশ দেহ ধরিয়া টানাটানি—তরঙ্গায়িত মেরুদণ্ড-সমূহের মেশামেশি ও ডিগ্‌বাজির মধ্যে লোহিতবর্ণ লাঙ্গুল-মূল দেখা যাইতে লাগিল।

এই বানর-দেবতারা আমাদিগের পশুশালাস্থিত বানরদিগের ন্যায় বদ্ধ নহে। এই স্থানটি উহাদের প্রধান আড্ডামাত্র, এখান হইতে নির্গত হইয়া প্রতিদিন প্রাতে উহারা সমস্ত নগরময় ছড়াইয়া পড়ে এবং বাগান ও বাড়ির জিনিসপত্র লুটপাট করিয়া বড়ই উৎপাত করে। একবার ফল চুরি করায় একজন ইংরাজ বানরদিগকে গুলি করে। তাহাতে বেনারস-সহরে একটা মহা জনরব উঠিল। দেশীয় লোকেরা সেই ইংরাজের বাড়ি ঘেরাও করিল; এমন কি, সেই ইংরাজকে রক্ষা করিবার জন্য সিপাহীদিগকে আনিতে হইয়াছিল।

মঙ্গলবার বানরদিগের মহা উৎসব। বানরের সকল দলই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ভক্তের দল আসিতে আরম্ভ হইল—তাহাদিগের সঙ্গে নারিকেলের শাঁস ও ফলাদি নৈবেদ্য। ঘটা করিয়া একটা ছাগল বলিদান হইল। এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া, বানরেরা খুঁটি ধরিয়া, দন্ত কিড়মিড় করিল, ছোট ছোট তীক্ষ্ণনেত্রের উপরিস্থ লোমশ ভ্রূদেশ কুঞ্চিত করিল।

এখানকার বিদ্যা-বিস্তালয় দেখা আবশ্যক। কারণ, এই বারাণসী নগরী হিন্দুদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার একটি অতীব প্রাচীন কেন্দ্র-স্থল। পূর্ব্বকালে, এখানকার ব্রাহ্মণেরা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; তখন বহু দূর হইতে লোক সকল ইহাঁদের প্রকটিত মতবাদ শিক্ষা করিতে আসিত। যে জ্যোতির্বিদ্যা অনন্তের ধ্যানে নিযুক্ত, এখানে সেই জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ আদর ছিল। আজ আমি একটা পুরাতন মান-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা প্রস্তর-নির্ম্মিত অগোলিকাময় বিবিধ যন্ত্রে পরিপূর্ণ—এবং উহাদের গাত্রে অসংখ্য রহস্যময় লেখা বিদ্যমান। এই সমস্ত যখন দেখিলাম, তখন যেন আমার আত্মা সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালে উপনীত হইল—যে সময়ে এই নগরী য়ুরোপীয়দিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল এবং যে সময়ে এখানে এই পুরাতন প্রাচ্য বিজ্ঞানের অনুশীলন বিশেষ চলিতেছিল—কৌতূহলাক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যের অয়ন-গতি গণনা করিতেছিলেন ও মেরুদেশের চতুর্দ্দিকস্থ তারকাবলীর আবর্ত্তন পরিমাণ করিতেছিলেন।

এখন সংস্কৃত এখানে পণ্ডিতী ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। য়ুইডেনের যেমন কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এখনও যেরূপ ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া থাকেন, সেইরূপ এখানকার পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন। বেনারসে এখনও বেদ পুরাণ উপনিষদ্ মহাকাব্য প্রভৃতির পুরাতন শ্লোক সকলের ভাষ্য ও টীকা লেখা হইয়া থাকে। এই পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ য়ুরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের নিকট পরিচিত।

ইংরাজেরা যেমনতরে ভারতবর্ষে অক্সফোর্ড বলিয়া থাকেন।

এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, মনে হয় যেন উহা অক্‌স্‌ফোর্ড হইতে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। এই সকল ছুঁচালো খিলান, এই সকল খাঁজ-ওয়ালা চতুষ্কোণ চূড়া—এই সকল তোরণ—এই সকল কুলাঙ্গী—এই সকল সরু সরু লম্বা থাম দেখিলে মনে হয় যেন "ওক্সিয়েল" কিম্বা "ম্যাগ্‌ড্যালেনে" প্রবেশ করিতেছি। কেবল এইমাত্র প্রভেদ,—অক্‌স্‌ফোর্ড বিদ্যামন্দিরের গ্রেনাইট প্রস্তরে বৃষ্টি ও কালপ্রভাবে স্থানে স্থানে চাক্‌লা উঠিয়া গিয়াছে—ম্লান আকাশের বিষণ্ণভাব যেন তাহাতে মুদ্রিত হইয়া আছে। পক্ষান্তরে, বেনারসের বিদ্যামন্দিরের প্রস্তর আলোক-কিরণে দীপ্যমান; অনতিতপ্ত সুখস্পর্শ বায়ুর বিলাসময় প্রভাব যেন উহার সর্ব্বাংশে অনুপ্রবিষ্ট। উত্তরদেশের বিচিত্রতাশূন্য অসীম প্রান্তর ও কম্পিতকায় স্পষ্ট উদ্ভিজ্জের সহিত এখানকার সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত তালজাতীয় বৃক্ষের যে প্রভেদ, এই উভয় মন্দিরের মধ্যেও সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। ছুঁচালো খিলান-ওয়ালা ঘরের মধ্যে তিন চারি দল ছাত্র অধ্যাপকের চারিদিকে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিয়া আছে। অক্‌স্‌ফোর্ডের পাঠশালা এখানকার পাঠশালার সদৃশ বটে, কিন্তু সেখানে যেরূপ সাহস-দীপ্ত উজ্জ্বল মুখ সকল দেখা যায়, এখানে তাহার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য মুখ মৃদুমধুর, অপৌরুষিক—অতীব কোমল ও দেহ পাৎলা পাৎলা—আল্‌গা চাদরে আচ্ছাদিত—দেখিতে পাওয়া যায়। গণিতের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। ছাত্রেরা শোভনভাবে শরীর ঈষৎ হেলাইয়া, মাটির দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ওষ্ঠ-সমীপে উঠাইয়া আমাকে অভিবাদন করিল। বীজগণিতের সঙ্কেত-লিপিতে পরিপূর্ণ একটা কালো বঙ্গের চিত্রের সম্মুখে ছেলেরা আসনপীঁড়ি হইয়া বসিল। আমি [illegible]

টুপি তাহাদের মাথায়। ইহাদের ডিম্বাকৃতি মুখ, দীর্ঘ নেত্রপল্লব, শ্যামবর্ণ, সুবঙ্কিম ওষ্ঠ—এই সমস্ত মুখশ্রীতে একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও রমণীয় গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছে।

আর একটু দূরে, বড় বড় ছেলেরা দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিতেছে। অধ্যাপকের টেবিলে দুইখানা গ্রন্থ রহিয়াছে। আমি গ্রন্থের নাম পড়িয়া দেখিলাম ম্যান্‌সেনের দর্শন—স্পেন্‌সরের সামাজিক স্থিতিতত্ত্ব।

* * *

এখানে রাস্তা ও পুরাতন মন্দিরাদি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া দুর্ঘট।

পরিচয়-পত্রের সাহায্যে কেবল য়ুরোপীয়দিগের বাড়িতে যাওয়া যায়—সুতরাং হিন্দু-জগতের শুধু বহির্দ্দেশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। যাহা হউক, আমার পাণ্ডাকে ত্যাগ করিয়া ও কৌতূহলজনক দ্রষ্টব্য পদার্থের ফর্দ্দটা আপাততঃ ফেলিয়া রাখিয়া আমি দুইটি হিন্দুগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলাম।

প্রথম, বাবু দেবীপ্রসাদের বাড়ি। ইনি জরির কাপড়ের ব্যবসায়ী। ইহাঁর বাড়ির ঘরগুলি ছোট ছোট, সাদা, টাট্‌কা দেখিতে ও নীচু, কোন আস্‌বাব নাই। পাথরের দেয়ালে চৌকোণা কুলাঙ্গি কাটা। এই কুলাঙ্গিতে লালঘরের দেবতা, মানুষের মুখ-ওয়ালা চতুষ্পদ পশু, বাণিজ্য ও সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদ্ভুত আকৃতি গণেশ গ্রহবীরূপে অধিষ্ঠিত। প্যারী নগরের প্রধান প্রধান দোকানে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও দেবতাদিগের শিরোদেশে ইংরাজি প্রশংসাপত্র, জগদর্শন মেলার প্রশংসা-পত্র সকল সংরক্ষিত। চাবি-তালা-ওয়ালা দ্বার-বিশিষ্ট একটা ঘরের [illegible] একটি অল্পবয়স্ক বালক আমাদের সম্মানার্থে—নানা

প্রকার বহুমূল্য ধাতুতে বোনা অদ্ভুত বিচিত্র ধরণের কাপড়—মাকড়সার তন্তুবৎ অতিসূক্ষ্ম জরির কাপড়—আরব্যোপন্যাসের এক সহস্র এক রাত্রি সদৃশ বিবিধ রেশমি কাপড়—কোনটাতে সূর্য্যের আভা, কোনটাতে চন্দ্রের আভা—এই সমস্ত দোকানের ঐশ্বর্য্য সাবধানে আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিল। ঘরের মধ্যস্থলে, গদির উপর সর্ব্বোৎসুক্য-বিরহিত, কোমলমুখশ্রী গৃহস্বামী রেসমি কাপড়ে আচ্ছাদিত হইয়া, আসনপীঁড়ি হইয়া গাড্ডিলভাবে বসিয়া ওস্তাদের নিকট সেতার শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার দীর্ঘ সেতার হইতে বারম্বারাবৃত্ত স্বরলহরী উত্থিত হইতেছে—সে স্বর-লহরী প্রাচ্য-সুলভ, জটিল, বেসুরা, বিষাদযুক্ত ও অত্যন্ত একঘেয়ে।

এককোণে, ঘরের মেজের উপর, একটা প্রকাণ্ড সবুজ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, আঁক্-জোঁক্-কাটা রহস্যময় লেখায় পূর্ণ কতকগুলা খেতাবের উপর ঝুঁকিয়া একজন মসীজীবী বসিয়া আছে। তাহার বুড়োটে মুখ কামানো, ঠোঁট্ পাত্‌লা ও চাপা, চষ্‌মা-ধারী শুক-চঞ্চু নাসা, আল্‌সাস্-প্রদেশীয় পাঠশালার বৃদ্ধ শিক্ষকের ন্যায় মুখশ্রী—বুদ্ধি বিকশিত ও কঠোর। তাঁহার যজ্ঞোপবীত আমাকে দেখাইলেন—তাহাতে প্রমাণ হইল তিনি ব্রাহ্মণ। আমি এই ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যে ইতিপূর্ব্বেও অনেক মুখ দেখিয়াছি যাহা আশ্চর্য্য রকম য়ুরোপীয় ধরণের। এই কিছু পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে একটি যুবককে দেখিলাম—তাহার মুখশ্রী বুড়োটে ধরণের—প্যারী নগরের ছাত্রের মুখশ্রীর ন্যায় সুস্পাবয়ব ও ক্লান্তিভারাক্রান্ত। ছাঁচ বিশেষের কি আশ্চর্য্য শক্তি—সহস্র সহস্র বৎসরেও ছাঁচ নষ্ট হয় না—সেই একই ছাঁচ রোমীয় প্রস্তরমূর্ত্তিতে—প্যারী নগরস্থ "বুল্‌বার্দ"-টোটো-কারীর মুখ-ভাবে—ও বেনারস ব্রাহ্মণের মুখশ্রীতে দেদীপ্যমান।

যে সময়ে দোকানের বড়বাবু তাঁহার সেতারে বিষাদযুক্ত বার-

ঘারাবৃত্ত অবসান-বিরহিত সুর-সমূহ ভাঁজিতেছিলেন, সেই সময়ে এই বৃদ্ধ মসীজীবী—মনে হয় খুব পণ্ডিত—আমার নিকট সংস্কৃত ও ইংরাজির এক-গোত্রীয়তা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছিলেন; পিতর্ শব্দের সহিত ফাদার শব্দের—ভ্রাতর্ শব্দের সহিত ব্রাদারের—দুহিতর্ শব্দের সহিত ডটারের সাদৃশ্য দেখাইতেছিলেন। এই সকল পুরাতন তুলনা তো আজকাল আমাদের সকল ব্যাকরণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মত দেখিতে এই শৈব হিন্দুর মুখে এই কথাগুল বিশেষরূপে চমৎকার বলিয়া মনে হইয়াছিল।

* * *

অতঃপর আমরা নাচ্‌ওয়ালীদের গৃহে প্রবেশ করিলাম। ইহা নগরের হৃদয়-দেশে—সর্ব্বাপেক্ষা লোকাকীর্ণ রাস্তায়—বাজারের মধ্যে অবস্থিত। এই চিত্র-বিচিত্র জনতার প্রবাহ—নানা বর্ণের রূপ—নগ্নতার সহিত তরঙ্গায়িত ঢিলা-ঢালা পরিচ্ছদের সংমিশ্রণ—এই সমস্তই চিরবিস্ময়কর। রাজপথের মধ্যে মানবপ্রবাহ অবিরাম প্রবাহিত; রাস্তার বাঁধানো পদ-পথের উপর এক দল লোক সারি সারি বসিয়া তাঁবার উপর খুদিতেছে—কাঁসা পিটিতেছে। দোকানদারেরা তাহাদের খাতার উপর ঝুঁকিয়া আছে—কতকগুলি লোক উবু হইয়া বসিয়া তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ মস্তক নাপিতের হস্তে জলসভাবে বিসর্জ্জন করিয়াছে।

রাস্তাটা খুব বাঁকা-চোরা। যেখানে রাস্তার দুই ধার হইতে দোকান ও বাড়ি বাহির হইয়াছে সেইখানকার রাস্তাটা খুব সোজা। ফল, তাঁবার জিনিস্, সবুজ বঙ্গের খেলনা, জরির চটিজুতা প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীতে এই সকল দোকান পূর্ণ। মাথার উপর গৃহ-বহির্গত

স্ফীতোদর গবাক্ষ, ছোট ছোট প্রস্তরমূর্ত্তি, বারাণ্ডা প্রভৃতি তে রাস্তাটা আরও সংকীর্ণ দেখাইতেছে। এই তো প্রাচা পিপীলিকা-বাসার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছি—সহস্র সহস্র দ হইতে ইহা একইভাবে রহিয়াছে। উপন্যাসোক্ত বাগ্‌দাদ ায় বণিক্-মহল এই প্রকার ছিল বলিয়া কল্পনা করা যাইতে ।

মার ভৃত্য তাহার সুপরিচিত একটি ক্ষুদ্র দ্বার উদ্‌ঘাটন পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ হইল, সহসা সমস্ত অন্ধকার—নিস্তব্ধ। সহস্র সহস্র নগ্নপদের যে ঘর্ষণ-রব শোনা যাইতেছিল ব শোনা গেল না।

ল্প শেষপ্রান্তে আর একটি দ্বিতীয় দ্বার—এই দ্বার দিয়া একটা নিম্ন-ছাদ, অর্দ্ধালোকিত গৃহ-শালায় উপনীত হই তাহার চারিদিকে সরু সরু থাম বিরাজমান। কেহই নাই। কেবল তিনটা লম্বোদর ছোট ছোট দেবমূর্ত্তি অর্দ্ধ পরিমিত কুলঙ্গিতে উপবিষ্ট। গৃহ-শালার প্রান্তভাগে একটা কালো রঙ্গের সিঁড়ি। খুব সাবধানে হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে এই সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম। দোতালায় উঠিয়া নাচ্‌ওয়ালীদের ঘরে পৌঁছিলাম।

অর্দ্ধ-অন্ধকার ঘর। গুরু মতরঞ্জি—জরির কাজ-করা বেশমি মাচ্ছাদন প্রভৃতি নানাপ্রকার কাপড়ের সজ্জায় এই বড় ঘরটি ভারাক্রান্ত। আস্‌বাবের মধ্যে গদি ও গের্দা। জমির উপর অসংখ্য ডাল-ওয়ালা একটা বহুমূল্য বৈঠকী ঝাড়।—হিন্দুদের সব সামগ্রীই প্রায় ডালপালা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঘরের বায়ু তীব্র সুগন্ধে ভরপুর—শিরঃ-পীড়ক। জমির উপর কতকগুলি ফুলদানে সেই মত্র-তত্র-পরিদৃশ্য এক বকমের হল্‌দে রঙ্গের ফুল রক্ষিত—

এবং কতকগুলা ধূপ দান হইতে ধূপের ঘূর্ণায়মান নীলবর্ণ ধূম উত্থিত হইতেছে।

এই বিপুল নিস্তব্ধ ঘরটি দেখিয়া আমরা পূর্ব্বে মনে করিতেছিলাম ইহা বুঝি একেবারে খালি; কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহা লোকে পরিপূর্ণ। মঞ্চের উপর বসিয়া, বারাণ্ডার গবাদের উপরে রাখিয়া, হাঁটুর দিকে মাথা ফিরাইয়া, তিনটি স্ত্রী নিরুৎসুকভাবে রাস্তার পানে চাহিয়া আছে। আমাদের বলে তাহাদের এই জড়ভাব দূরীকৃত হইল না—তাহার মগ্নতা ভঙ্গ হইল না। অতি কষ্টে, বিলম্ব করিয়া একবার মুখ ফিরাইল। মুখের রং শ্যামবর্ণ—মুখাবয়ব-রেখা নিখুঁত—নেত্রের পল্লব যে-আন্দাজ সুদীর্ঘ—চোখ্ বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ—মলালস্য ও বিলাসিতার ভাবাক্রান্ত—সমস্ত মুখশ্রীতে কেমন একটি গৌরব বিরাজমান—নাসিকা-বিলম্বিত নথও তাহা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু অবিচলতা, এই গম্ভীর ভাব, এই প্রাচ্য মূকতা, তাহাকে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছে। দিনের পর দিন উহারা এইরূপেই যাপন করে; অলসভাবে কখন অঙ্গ ছড়াইয়া আছে—অবগুণ্ঠনে কখন আবৃত হইতেছে—কখন বা ধূপগন্ধসমাকুল অর্দ্ধ-অন্ধকারে নিদ্রাসেবন করিতেছে—কখন বা বারাণ্ডার কাষ্ঠময় রেলিংএর ফাঁকের ভিতর দিয়া বাহিরের লোকদিগকে দেখিতেছে—অথচ উহারা স্বয়ং প্রচ্ছন্ন—বাহির হইতে অদৃশ্য। কখন কখন উহারা ফুলের তোড়া রচনা করে, ফুল লইয়া খেলা করে, অথবা উহাদের মধ্যে কেহ সেতার বাজায়;—অন্ধকারময় ঘর সেতার-ঝঙ্কার দ্রুত ঝর্ঝরনিঃসৃত সুরে পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার স্বরভাগ অর্দ্ধাস্ফুটবিশিষ্ট—তালের ছন্দ ধরা যায় না—ক্রমাগত ঘুরিয়া আসিতেছে—মিশিয়া যাইতেছে—মিলিয়া যাইতেছে—এমন সময়ে

[illegible] সেখানে থামা যায় না—সেখানে, আরও কিছু পরে [illegible] আছে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। উহাদের জীবনের [illegible] উহাদের সঙ্গীতও নিতান্ত এক-ঘেয়ে। অন্তঃপুরে আবদ্ধ হিন্দু [illegible] এই প্রকার জীবন-প্রণালী। এই প্রকার জীবন-[illegible] মন তো নিতান্ত সাদা-সিধা [illegible] হইবার কথা। তবে [illegible] সকল গীত এমন আশ্চর্য্যজনক গভীরভাবে পূর্ণ—নারী [illegible] অন্তরে হৃদয়ের প্রবল আবেগ কেন [illegible] করিল। [illegible]

বাহিরে [illegible]

তাহা আ [illegible]

[illegible]

আমর [illegible]

বাম [illegible]

স্বরলিপি।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল একতালা।

তুমি সুন্দর শুচিরঞ্জন,
তুমি নন্দন দুর্লভ,
তুমি অনঘ নববসন্ত
অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বিত,
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিমগ্ন,
আসন ঘেরি সঙ্গীতময়ী
শুভ্রতে শতধার।
ঝলকিছে শঙ্খ ইন্দ্রকিরণ,
পুলকিছে যূথমল্লিকা,
চন্দনগন্ধে বলিত অঙ্গে
চরণে চর্চিত [illegible]

ছিঁড়ি মর্ম্মের শতবন্ধন
তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের কুলচন্দন
বন্দন-উপহার।

৩।২

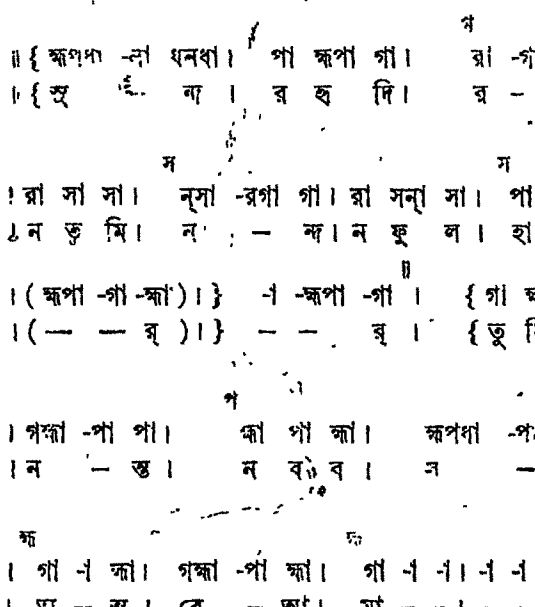

র্গ
।র্সা -ৰ্গা। র্রা র্গা র্মা। র্গরর্গা -ৰ্রা। র্রা র্সা র্সা।
।অ — ঞ্চ। ল ঘে রি। স — ঙ্গী। ত য ত।

।সা -ৰ্রা। গা গা পা। ক্ষপধা -পা -ৰ্। -ক্ষপা -ক্ষা -ক্ষা॥
।গু — রু। রে শ ত। বা — —। — — ব্ ।

।র্সা র্সা র্রা। র্সা র্সা র্সা। নর্সা -র্রা র্সা। র্সা নর্সা ধা।
।ঝ ল কি। ছে শ ত। ই — ন্দু। কি র ণ।

র্প
।ধা ধা র্সা। না ধা ধা। ধা -ৰ্ পা। -ৰ্ ক্ষপা পা।
।পু ল কি। ছে কু ল। গ — ন্ধ। — — —।

র্প
।ক্ষা পা না। ধা -ৰ্ পা। ক্ষা পা ধা। পা -ৰ্ ক্ষা।
।চ র ণ। ভ — ঙ্গে। ধ্বা লি ত। অ — ঙ্গে।

।গা গমা রা। গা পা রা। গা -ৰ্ -রা। সা -ৰ্ -ৰ্।
।চ ম কে। চ কি তে। ছ — —। দ্ব — —।

।পা ধা পা। -র্সা র্সা র্সা। র্সর্রা র্সা র্সা। -ৰ্ র্সা র্সা।
।ছি ড়ি ম। — র্মে র। শ ত ব। — ন্ধ ন।

।র্সা র্রা র্রা। র্রা র্সর্রা -র্গা। র্রা র্সা নর্সা। -ধা না পা।
।তো মা পা। নে ধা য়। ব ত ক্র। — ন্দ ন।

।পা ধা ধা। ধর্সা র্সা -ৰ্। পা ধা পধা। -র্সা র্সা র্সা।
।ল হ হ্ব। দ য়ে ব্। ছু ল চ -ৰ্। — ন্দ ন।

। সা -। মা। গা গা পা। ঋপধা -পা -। -ঋপা -গা -ঋা ॥
। ব — ন্দ। ন উ প। হা — —। — — র্ ॥

ব্যাখ্যা।

১। পরলিপির শিরোদেশে যে তালাঙ্ক ৩।২ রহিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, এই গানটির প্রতি তাল-বিভাগের মধ্যে তিনটি করিয়া মাত্রা আছে এবং এই প্রত্যেক মাত্রার স্থায়িত্ব-কাল ২ সংখ্যা। অর্থাৎ, এক দুই, এক দুই, এক দুই, এইরূপ এক-নিঃশ্বাসে তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিতে যত সময় লাগে, এই প্রত্যেক মাত্রা ততকাল স্থায়ী। গান গাহিবার কিম্বা বাজাইবার পূর্ব্বে, এক দুই, এক দুই, এক দুই এইরূপ তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিয়া এবং সেই সঙ্গে হাতে তালি দিয়া প্রতি মাত্রার স্থায়িত্বকাল নিরূপণ করিয়া লইবে এবং সেই লয়ে গান গাহিবে বা বাজাইবে।

২। শুষ্ক-বন্ধনী { } পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। অর্থাৎ, ইহার অন্তর্গত স্বর-গুলি পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। যেখানে শুষ্ক-বন্ধনীর বিমুখী } শাখাটি দেখিবে, সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া, অব্যবহিত-পূর্ব্ব প্রমুখী { শাখাটি হইতে পুনরাবৃত্তি করিবে।

৩। রক্ত-বন্ধনী ( ) পুনরাবৃত্তির সময় কতকগুলি স্বর ডিঙাইয়া যাইবার চিহ্ন।

৪। পার্শ্বস্থ যুগলচ্ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। শিরোদেশস্থ যুগলচ্ছেদ সেইখানে বসে যেখানে থামিয়া অন্তরা প্রভৃতি ধরিতে হয় কিম্বা যেখানে একেবারেই থামিতে হয়।

৫। এই গানটিতে "সুন্দর" হইতে "হার" পর্য্যন্ত প্রথমে দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে। তাহার পর, "তুমি" হইতে "আমার" পর্য্যন্ত দুইবার আবৃত্তি করিয়া আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আবার "সুন্দর" হইতে "হার" পর্য্যন্ত দুইবার আবৃত্তি করিয়া যেখানে শিরোদেশে যুগলচ্ছেদ আছে সেইখানে থামিয়া "নীল অম্বর" এই অন্তরা ধরিবে।

অপমানের প্রতিকার।

একদা কোন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারীর বাড়িতে কোন কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-বন্ধন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

ঐ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরিপ্রথার কথা উঠিল। ইংরাজ প্রোফেসর কহিলেন যে দেশের লোক অর্দ্ধসভ্য, অর্দ্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্ম্মনীতির আদর্শ উচ্চ নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হাতে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরাজ, এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা দূরে থাকুক, সৌজন্য স্থান করে। আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উচ্চ আছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাঁহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পরুষ বাক্যে অবমানিত করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

অধ্যাপক মহাশয় আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে কথা কেবল মাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে পরন্তু ইংরাজের মুখে অত্যন্ত অসঙ্গত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার গুরুতর দূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরাজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প পরিমিত। সেই জন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।

যাহারা যাযাবর জাতি এবং যাহারা বিরাট সাম্রাজ্যের দ্বারা পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মহাদেশের মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এবং সম্প্রতি অন্যান্য

দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশ অল্পে অল্পে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্য অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে তাহারা যদি নিমন্ত্রণ-সভায় আরামে ও স্পর্দ্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

এই ঘটনা আজ বছর দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজ কর্ত্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ইংরাজের আদালতে সেই সকল হত্যাকাণ্ডে এক জন ইংরাজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্য্যুপরি এই সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিতশ্মশ্রুগুম্ফশ্মশ্রু খড়্গনাসা ইংরাজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবন হনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরাজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরাজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্ত স্বরূপে গণ্য করে।

ইংরাজ এমন কথা মনে করিতে পারে, আমরা গুটিকতক প্রবাসী পঁচিশ কোটি বিদেশীকে শাসন করিতেছি। কিসের জোরে? কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে নহে, নামের জোরেও বটে। সেইজন্য সর্ব্বদাই বিদেশীর মনে ধারণা জন্মাইয়া রাখা আবশ্যক আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা সমান ক্ষেত্রে আছি এরূপ ধারণার লেশমাত্র জন্মিতে দিলে আমা-

দের বলক্ষয় হয়। পরস্পরের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধান, অধীন জাতির মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্ভ্রম এবং অকারণ ভয় শত সহস্র সৈন্যের কাজ করে। ভারতবর্ষীয় যে, কোন দিন বিচারে নিজের প্রাণের পরিবর্ত্তে ইংরাজকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখে নাই, ইহাতে তাহার মনে সেই সম্ভ্রম দৃঢ় হয়—মনে ধারণা হয় আমার প্রাণে ইংরাজের প্রাণে অনেক তফাৎ, অসহ্য অপমান অথবা নিতান্ত আত্মরক্ষার স্থলেও ইংরাজের গায়ে হাত তুলিতে তাহার দ্বিধা হয়।

এই পলিসির কথা স্পষ্টতঃ অথবা অস্পষ্টতঃ ইংরাজের মনে আছে কিনা জোর করিয়া বলা কঠিন—কিন্তু একথা অনেকটা নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা দুঃখিত হন—সেটাকে একটা "গ্রেট্ মিস্‌টেক্," এমন কি, একটা "গ্রেট্-ক্রাইম" মনে করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপে য়ুরোপীয়ের প্রাণ হরণ করা তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। তদপেক্ষা গুরু শাস্তি যদি আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকিত তবে ভারতবর্ষীয় হত্যাপরাধে ইংরাজের শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক হইত। যে জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায়, সে জাতিসম্বন্ধে আইনের দ্বারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য স্খলন এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরাজ অপরাধী অনায়াসে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্মৃতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্নায়ুর মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক কথা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না—এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসঙ্গতি ও দ্বিধা থাকে—এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে সুনিশ্চিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্ব্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিযুক্ত যখন স্বদেশী তখন কঠিনতা শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষতঃ যখন স্বভাবতই ইংরাজের নিকটে স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পবল ভারতবাসীর "প্রাণের পবিত্রতা" স্বদেশীয়ের তুলনায় অতি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে পরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্ব্বল, তাহাতে প্লীহা প্রভৃতি আমাদের শারীরযন্ত্রগুলিরও বিস্তর ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে মারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের দ্বারা দুঃসাধ্য হয়।

লজ্জা এবং দুঃখ সহকারে এ সমস্ত দুর্ব্বলতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া বলা উচিত যে, উপর্য্যুপরি এই সকল ঘটনার সময়ের লোকের চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ লোকে আইনের এবং প্রমাণের সূক্ষ্মবিচার করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কোন ইংরাজেরই ফাঁসি হয় না এই কথাটি বারম্বার এবং অল্পকালের মধ্যে যখন যখন লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মনে

ইংরাজের অপক্ষপাত ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সুতীব্র সন্দেহের উদয় হয়।

সাধারণ লোকের মূঢ়তার কেন দোষ দিই, গবর্মেণ্ট্ অনুরূপ স্থলে কি করেন? যদি তাঁহারা দেখেন কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ অধিকাংশ সংখ্যক আসামীকে খালাস দিতেছেন, তখন তাঁহারা এমন বিবেচনা করেন না যে, সম্ভবতঃ উক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পর, এবং তিনি সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় না করিয়া আসামীকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত, অতএব এই সচেতন ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সতর্ক ন্যায়পরতার জন্য সত্বর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; অথবা যদি দেখিতে পান, যে, কোন পুলিশ্ কর্ম্মচারীর এলাকায় অপরাধের সংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক অপরাধী ধরা পড়িতেছে অথবা চালান আসামী বহুল সংখ্যায় খালাস পাইতেছে তখন তাঁহারা এমন তর্ক করেন না যে, সম্ভবতঃ এই পুলিস কর্ম্মচারী অন্য পুলিস্ কর্ম্মচারী অপেক্ষা সৎপ্রকৃতির—ইনি সাধু লোককে চোর বলিয়া চালান দেন না এবং মিথ্যাসাক্ষ্য স্বহস্তে সৃজন করিয়া অভিযোগের ছিদ্র সকল সংশোধন করিয়া লন না, অতএব পুরস্কার স্বরূপে অচিরাৎ ইহার গ্রেড্ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা যে দুই আনুমানিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম উভয়তই সম্ভবপরতা ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকেই অধিক। কিন্তু কাহারও অবিদিত নাই গবর্মেণ্টের হস্তে উক্তবিধ হতভাগ্য সাধুদিগের সম্মান এবং উন্নতি লাভ হয় না।

জনসাধারণও গবর্মেণ্টের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মবুদ্ধি নহে, সেও খুব মোটামুটি রকমের বিচার করে। সে বলে আমি অত আইনকানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয়কে হত্যা

করিয়া একটা ইংরাজও উপযুক্ত দণ্ডার্হ হয় না এ কেমন কথা!

বারম্বার সাধারণে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে যদি একটা সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে থাকে তবে তাহা গোপনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা রাজভক্তি নহে। সেই বাবু-অভিহিত অসৎপক্ষীয়েরা এ সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। আমরা ভারত-রাজ্য পরিচালক বাষ্প-যন্ত্রের "বয়লার"স্থিত তাপমান মাত্র, আমাদের নিজের কোন শক্তি নাই, ছোট বড় বিচিত্র লৌহচক্রচালনার কোন ক্ষমতাই রাখি না, কেবল বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে আমাদের চঞ্চল পারদবিন্দু হঠাৎ উপরের দিকে চড়িয়া যায়, কিন্তু এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাহাতে রাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি একটি ঘুসি মারিলেই এই ক্ষুদ্র কাচনলের পাত্রটি ভাঙ্গিয়া তাহার সমস্ত পারদটুকু নাস্তিনাবুদ হইয়া যাইতে পারে—কিন্তু বয়লার-গত উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যন্ত্রচালনসম্বন্ধে একটা প্রধান অঙ্গ। ইংরাজ অনেক সময় বিপরীত উপদেশ ধারণ করিয়া বলে—প্রজাসাধারণের নাম করিয়া আবদার দিতেছ, তোমরা কে? তোমরা ত আমাদেরই স্কুলের গুটিকতক বাচালবিশারদ ইংরাজিনবিশ!

প্রভু, আমরা কেহই নহি! কিন্তু তোমাদের ঔদাস্য বিরক্তি এবং ক্রোধদহনের দ্বারা অনুমান করিতেছি তোমরা আমাদিগকে নিতান্তই সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর না। এই সামান্য জ্ঞান করা কর্তব্যও নহে। সংখ্যায় সামান্য হইলেও এই বিচ্ছিন্নসমাজ ভারতবর্ষে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং হৃদয়ের ঐক্য আছে—এবং এই শিক্ষিত মণ্ডলীই ভারতবর্ষীয় হৃদয়বেদনা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং নানা উপায়ে সংশোধিত করিয়া দিতে

পারেন। এই শিক্ষিত সাধারণের অন্তরে কখন্ কিরূপ আঘাত অভিঘাত লাগিতেছে তাহা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করা গবর্মেণ্টের রাজনীতির একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। বক্ষনে যতদূর প্রকাশ পায় গবর্মেণ্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য নাই।

আমরা আলোচিত ব্যাপারে দুই কারণে আঘাত পাইয়া প্রথমতঃ, একটা অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিলেই তাহার উপযুক্ত দণ্ড-বিধানের প্রত্যাশা করিয়া হৃদয় ব্যগ্র হইয়া থাকে। যে জন্যই হৌক্ দোষী অব্যাহতি পাইলে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল ঘটনায় আমরা আমাদের জাতীয় অসম্মান তীব্ররূপে অনুভব করিয়া একান্ত মর্ম্মাহত হই।

দোষী অব্যাহতি পাওয়া দোষের কথা কিন্তু আদালতের বিচারের নিকট অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে না। আইন এতই জটিল, সাক্ষ্য এতই পিচ্ছল, এবং দেশীয় চরিত্রজ্ঞান যথাস্থানে অবতারকারী বিদেশীয়ের পক্ষে এতই দুর্লভ, যে, আনিশ্চিতফল মকর্দ্দমা অনেকটা জুয়াখেলার মত বোধ হয়। এইজন্যই জুয়াখেলার যেমন একটা মোহকরী উত্তেজনা আছে আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছে মকর্দ্দমার সেইরূপ একটা মাদকতা দেখা যায়। অতএব মকর্দ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং যখন সে অনিশ্চয়তা জন্য আমাদের স্বভাবদোষও অনেকটা দায়ী তখন মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষীর পীড়ন ও দোষীর নিষ্কৃতি শোচনীয় অথচ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু বারম্বার ঘৃণ্যোপায় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে রাজপুরুষদের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরাজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের বিষের জ্বালা হাহাকারে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে।

যদি ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত, যদি স্বল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি য়ুরোপীয় দেশীয় কর্তৃক হত্যা হইত এবং প্রত্যেক অভিযুক্তই নির্দোষ প্রতিপন্ন হইত, তবে এরূপ দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করিবার জন্য কিরূপ উদ্যম উদ্ভাবিত হইত। কিন্তু প্রাচ্য ভাবভরবাসী সহজে নিরর্থক আদি পাইয়া থাকি বলিয়া যখন পাশ্চাত্য কর্তৃপুরুষদের কোনপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না। কি করিলে এ সময়ে উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনরূপ আন্দোলন উত্থাপন হইতেও শুনা যায় না।

কিন্তু আমাদিগের প্রতি কর্তৃজাতিবর্গের এই যে অবজ্ঞা, সে জন্য আমাদিগেরই সর্বাপেক্ষা ধিক্কারের যোগ্য। কারণ, একথা কিছুতেই স্বীকারের বিষয় হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না—সম্মান নিজের হৃদয়ে। আমরা সাম্প্রদায়িক ঘরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ রুজু করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিয়তিশয় লাঘব হইতেছে।

উদাহরণ স্থলে আমরা খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্তৃক মুহুরি মারার ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেল্ সাহেবের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। আমরা নিজে জানি বেল্ সাহেব অত্যন্ত দয়ালু উদারচেতা সহৃদয় ব্যক্তি, দেশীয়দিগের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি, যে, মহরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কোনও দুর্মতি ইংরাজ প্রকৃতির হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তবিক তাহা প্রকাশ পায় নাই। জঠরানল যখন প্রজ্বলিত তখন ক্রোধানল অতি অল্প কারণেই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তা সাহেবেরও হয় বাঙ্গালীরও হয়। অতএব এ ঘটনার প্রসঙ্গে বিলাতি বিদ্বেষের কথা উত্থাপন করা উচিত হয় না।

কিন্তু করিয়াদীর পক্ষের বাঙ্গালী বারিষ্টার মহাশয় এই মকদ্দমার প্রসঙ্গে বারম্বার বলিয়াছেন, মুহুরিদের কাজটা ইংরাজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে কিরিঙ্গা মারিতে পারে না।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরির এবং মুহুরির স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্ব্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্ব্বলতা। এ কথা বলিতে পারি মুহুরি যদি কিরিঙ্গা মারিত তবে বেল্ সাহেব যথার্থ ইংরাজের ন্যায় তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

যথেষ্ট অপমানিত হইলেও এখনো মুহুরি কোন ইংরাজকে কিরিঙ্গা মারিতে পারে না এই কথাটি ধ্রুব সত্যরূপে অম্লানমুখে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরাজকে বেশি করিয়া দোষারোপ করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অন্যায়সঙ্গত এবং লজ্জাজনক আচরণ।

মার খাওয়ার দরুণ আইনমতে মুহুরির যে কোন প্রতিকার প্রাপ্য, তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত হইতে পারে কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র পরিমাণে আহা উহু করার, এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিমন্দ দিবার কোন কারণ দেখি না। বেল্ সাহেবের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু মুহুরি ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত লোকের আচরণ হেয়, এবং খুলনার বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণে হীনতা ও অজ্ঞান মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পকাল হইল ইহার অনুরূপ ঘটনা পাবনায় ঘটিয়াছিল।

সেখানে ম্যুনিসিপালিটির খেয়াঘাটের কোন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী পুলিস সাহেবের পাখাটানা বেহারার নিকট হইতে উচিত মাশুল আদায় করিয়াছিল বলিয়া সেখানকার পুলিস্ সাহেব তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া একশেষ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেই অপরাধী ইংরাজের কোনরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া কেবলমাত্র ধমক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অথচ যখন পাখাটানা বেহারা উক্ত ব্রাহ্মণের নামে উপদ্রবের নালিশ আনে তখন তিনি ব্রাহ্মণকে জরিমানা না করিয়া ছাড়েন নাই।

যে কারণবশতঃ বাঙ্গালী মাজিষ্ট্রেট্ প্রবল ইংরাজ অপরাধীকে সতর্ক এবং অক্ষম বাঙ্গালী অভিযুক্তকে জরিমানা করিয়া থাকেন, সে কারণটি আমাদের জাতির মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, অন্যেরা আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরাজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।

এক বাঙ্গালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙ্গালী যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙ্গালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না একথা যখন বাঙ্গালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে, যে, ইংরাজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট্ কোন আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময় ইংরাজ কর্ত্তৃক অপমানবৃত্তান্ত শুনিলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকি, কোন ইংরাজের প্রতি ইংরাজ এমন ব্যবহার করিত না। করিত না বটে, কিন্তু সে জন্য ইংরাজের উপর রাগ করিতে বসার অপেক্ষা নিজের প্রতি রাগ করিতে

বসিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যে যে কারণবশতঃ একজন ইংরাজ আর একজন ইংরাজের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে না, সেই কারণগুলি থাকিলে আমরাও অনুরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, সামুনাসিক স্বরে এত আক্ষেপ কান্নাকাটি করিতে হইত না।

বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালী কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্ব্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না? আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে: নিম্নবর্ত্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের নিকট "চাষা বেটা" প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে;—ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কনষ্টেবল্, কনষ্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে গবর্মেণ্টের কাজ আদায় করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, তদতিরিক্ত দাসত্ব দাবী করিয়া থাকে—চৌকিদারের নিকট কনষ্টেবল্ যথেচ্ছাচারী রাজা, এবং কনষ্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ, তেমনি আমাদের সমাজে সর্ব্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবীর একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভাব পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আত্মস-

কালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাসি হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অবমাননের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্য-মাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্য্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্য্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই কারণেই ইংরাজ ইংরাজের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন করিতে পারিব তখন ইংরাজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্য্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

স্তব-গীত।

নমঃ প্রকৃতি নমঃ!
নমঃ শঙ্করি নমঃ!
লীলাময়ী তব লীলার ক্ষেত্রে
নব নব লীলা নিরখি নেত্রে,
লোমাঞ্চ শরীরে সাধি মা অধীরে
থাক হৃদে হয়ে স্থির সৌদামিনী!
নাহি দিগ্বিদিক সব একাকার
গভীর গহন আদিম আঁধার,
নিস্তব্ধ মহা শূন্য পাবাবার
ঘুমন্ত অনন্ত তামসী নাগিনী!
তুমি মা জাগিলে, কটাক্ষে তোমার
চমকি উঠিল আদিম আঁধার,
বেণু রেণু সনে মত্ত হল রণে
তব উত্তেজনে সমররঙ্গিণী!
সে রণ-নির্ঘোষে ব্যোম বিদরণ,
ঘাত-প্রতিঘাতে জ্যোতি বিকীরণ,
মহা সূর্য্য হল গগনে উদয়
তোমারি প্রতাপে স্ফুলিঙ্গ-বর্ষিণী!
সেই সূর্য্য হতে পদ্মদল প্রায়
খসে খসে এল গ্রহ সমুদায়,
তুমি মা গাঁথিয়ে গ্রহমালা তায়
শূন্য সাজাইলে বিশ্ব-বিমোহিনী!
এ পৃথিবী ছিল দীপ্ত হুতাশন,

তোমারি কল্যাণ পরশে এখন
ফলে ফুলে যেন নন্দন-কানন!
দিকে দিকে বহে অমৃত-বাহিনী!
উষা-নব রাগে তব অনুরাগ,
পূর্ণিমা নিশীথে তোমারি সোহাগ,
কুসুম সৌরভ তোমারি গৌরব,
কোকিল ঝঙ্কারে তোমারি রাগিণী!
মায়ের আশীর্ব্বাদে তোমারি নিশ্বাস,
সতীপ্রাণে তুমি প্রেমের উচ্ছ্বাস,
সর্ব্বত্যাগী যোগীর তুমিই সে বিশ্বাস,
মুমূর্ষু হৃদয়ে আশ্বাসরূপিণী!
সাধনাতে তুমি ভকতি অনল,
অনুতাপ-দাহে তুমি অশ্রুজল,
মহামন্ত্রে তব ঘুরিতেছে ভব
মোহমুগ্ধকরী মায়া-প্রসবিনী!

—

ঘাত প্রতিঘাত।

প্রতাপপুরের জমীদার রাজীবলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় প্রতাপ! তাঁকে ভয় না করে ও অঞ্চলে এমন লোকটী নাই। [illegible] সেখানে কল্পিত জুজুর ভয় দেখাইতে হয় না!

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জমীদারীর আয় খুব বেশী না হইলেও "পাড়াগেঁয়ে" জমীদারের পক্ষে যথেষ্ট হইতে হইবে। শুনা যায়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ, এই জমীদারী [illegible] হেয় যৌতুকস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। [illegible]

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজেও যে প্রথম দুইবারের বিবাহে এরূপ যৌতুক না পাইয়াছিলেন তাহা নহে। সুতরাং বলিতে গেলে, এই জমীদারীর সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধটা বংশাবলী ক্রমে মধুররসাত্মক। বোধ হয় এই কারণেই, বন্দ্যোপাধ্যায় সময়ে অসময়ে, আবশুকে অনাবশ্যকে, প্রজাবৃন্দকে সেই মধুর-রসের সম্বন্ধ ধরিয়া সম্বোধন করিতেন। প্রজারা কিন্তু এ সম্বোধনের মাধুর্য্য কতদূর অনুভব করিত বলা যায় না। আর এক কথা, রাজীবের প্রকৃতি "বড় উদার!" "বসুধৈব কুটুম্বকং," উদারচেতার লক্ষণ! সে জন্যও বোধ হয় রাজীব, কর্ম্মচারী, প্রজা এবং শত্রু, সকলকেই সমভাবে "বড় কুটুম্ব" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন।

রাজীবের তিনটী অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনটীই জীবিত। কিন্তু তিন-টীতেও রাজীবের অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ণ হইত না! কাজেই পরম হিন্দু রাজীব সে অভাবটুকু অন্য উপায়ে পূরণ করিয়া লইতেন!

কিন্তু এসংসারে সব সুখ নাকি ঘটে না। তাই ত্রিসংসার সত্ত্বেও রাজীব অপুত্রক। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' শাস্ত্রের এই মহাবাক্য রাজীব একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার প্রতি-পালন করিলেন, কিন্তু হায় এত করিয়াও তাঁর আশা ত পূরিল না! যাগ যজ্ঞ পূজা কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন মনের দুঃখে, রাজীব সংসারধর্ম্মে ইতি দেওয়াই স্থির করিতেছিলেন, সহসা একটা পুনশ্চ সিখিতে সাধ হইল। সাধ যদি হইল ত তা সাধিতে কতক্ষণ? এক সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থপক্ষের গৃহিণী হইলেন। কিসে কি হয় বলা যায় না, নূতন গৃহিণীর কৃপায় বৎসরের ভিতরেই রাজীব পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন! সুখের সাগর উথলিয়া উঠিল। আর এত দিন "পুন্নাম" নরকের যে ভয় ছিল, তাহাও দূর হইল।

বন্দ্যোপাধ্যায় যে খাঁটি হিন্দু ভাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা এ সকলত তার যথারীতি করা আছেই, তার উপর মুখে হরিনামের ঝুলি, এবং হাতে হরিনামের ঝুলি, এক মুহূর্ত্ত ছাড়া নাই। দুষ্ট লোকেরা কথা যতদূর, তারা গোপনে কত কথাই বলে, হরিনামের ছলে কাহার কোন সম্পত্তিটী আত্মসাৎ করিবে চক্ষু বুজিয়া নিশ্চিন্ত মনে, কুড়াজালি হাতে, বুড়া নাকি তাহারই হিসাব করে। আর পূজা করিতে করিতে কোন দেবদেবীটি কিরূপে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে সেই ফন্দীই নাকি রাগটা আমার কখনও কখনও শালগ্রাম-শিলার উপর দিয়া যায়। কিন্তু বাজে লোকের কাজ করা আমাদের কাজ নাই। আমরা জানি অলকাতিলকাধারী রাজীব পরম বৈষ্ণব। আর রাজীব যে কেবল নিজে ধর্ম্মাচরণ করিয়াই ক্ষান্ত, তাও নয়, সদাচারী অধার্ম্মিকদমনেও তাঁর দৃঢ় অনুরাগ। যদি কেহ, সামাজিক কোন আচারব্যবহারের কেন্দ্র হইতে চুলমাত্র সরিয়া যায়, তবে তার রক্ষা নাই, রাজীব তাকে এক ধমকে না করিয়া ছাড়েন না। তবে নিতান্ত অনুগতের প্রতি তাঁর শাস্ত্রে যে দুই একটা বর্জ্জিত বিধি না ছিল, এমনও বলা যায় না।

ছেলেটা জন্মিবার পর হইতে, রাজীবের সংসারে আর একটু আঁট হইল। ধর্ম্মের উপরও ভক্তিটা যেন কিছু বেশী বেশী হইয়া উঠিল। শুনিয়াছি এর পর তিনি কিছুতেই আদালতে হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তবে, মামলা মোকর্দ্দমা সাজাইতে ও সাক্ষী সাবুদ শিখাইতে অবশ্য তাঁর কোন আপত্তি ছিল না।

বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র। লোকে

পণ্ডিত কৃষ্ণভক্ত রাজীব পুত্রনামের ছলে কৃষ্ণ নাম দিয়াছিলেন। নামে খরচ তাঁর আদৌ ছিল না।

কৃষ্ণচন্দ্র রাজীবের বৃদ্ধ বয়সের বিশেষতঃ চতুর্থ পক্ষের একমাত্র পুত্র, তার যত্নের কথায় আর কাজ কি? পিতৃ মাতৃ উভয় দিক হইতেই আদরের স্রোত কিছু খরতর বহিয়াছিল, কৃষ্ণচন্দ্র সেই আদরের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে, ক্রমে যৌবনসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দিনে দিনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্র ষোল কলায় পূরিয়া উঠিলেন। যৌবন সমুদ্র উছলিয়া পড়িল। সে জোয়ারের জলে গ্রামবাসী ক্ষুদ্র বৃহৎ সব পাশব্যস্ত হইয়া উঠিল!

আঠার বৎসর বয়সে, কৃষ্ণচন্দ্র ঝোঁক ধরিলেন, গ্রামের স্কুলে তেমন ভাল পড়া হয় না, কলিকাতায় পড়িতে যাইবেন। অনেক গুরুর আপত্তি কান্নাকাটি উঠিল, শেষ কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের কথাই বজায় রহিল। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, পরিচারকবৃন্দ পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন 'পড়া' আরম্ভ হইল।

ইংরাজি বিদ্যার আলোকে অতি অল্প দিনেই কৃষ্ণচন্দ্রের কুসংস্কার তামস দূরে পলাইল! তখন আর পানাহারের কোন 'বাছবিচ' রহিল না! বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যদি কেহ তামাসার ছলে, কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিত "তোমার বাবা অত শুদ্ধাচারী, পক্ষ হরিনাম ভিন্ন নামগ্রহণ করেন না, আর তোমার এ অনাচার অধর্ম্ম কেন?' তখন কৃষ্ণচন্দ্র একটু রঙ্গে চড়িয়া জবাব গাহিতেন, "তবে বোঝ না, বাবা ধর্ম্মের দিকে বড় বেশী ঝুঁকেছেন, আমি যদি এদিকে একটু না ঝুঁকি তবে দাঁড়িপাল্লা ঠিক থাকে কি?

রাজীবলোচনের অন্য দিকে সিকি পয়সা অপব্যয় না থাকিলেও, পুত্রের খরচ যোগাইতে কোনরূপ কার্পণ্য ছিল না! এর উপর

কৃষ্ণচন্দ্র নানা অছিলায় মাধের নিকট হইতেও মাঝে মাঝে কোন্ হুশ একশ, না লইতেন ? সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের, স্বেচ্ছামত পানাহার ভাবাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে আহার বিহারটা কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল। পরম্পরায় পুত্রের এই "অনাচার, অবিচারের" কথা রাজীবেরও কানে গেল, একবার ছুটীতে কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ী আসিলে, রাজীব জনরবের কথা পুত্রকে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এসব কথা কি সত্য ?" কৃষ্ণচন্দ্র ছেলাবেলা হইতেই পিতাকে বড় একটা "ভয় ডর" করিতেন না, এখনত ইংরাজি পড়িয়া স্বাধীনচেতা হইয়াছেন, পিতার কথায় অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন, দোষের কোন্ আচরণ করি না, তবে সংস্কৃত শিক্ষার আমলে টিকেকোঁটা নামাবলী যেমন চলিত ছিল এখন আমরাও যা করি তাও তেমনি ইংরাজী বিদ্যার অঙ্গ, সভ্যতার লক্ষণ।" রাজীব ভাবিলেন, হবেও বা কলিকাল! কিন্তু শীঘ্রই রাজীবের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিল, ক্রমে পুত্রের এই সব ইংরাজি সভ্যতা যে কি, তাহা প্রত্যক্ষীভূত করিতে লাগিলেন! দেখিয়া দেখিয়া রাজীব কেবল নিজ কপালে করাঘাত করিতেন। এখনত আর অন্য কোনও উপায় নাই! হায়, তখন যে হাত চেয়ে আম বিস্তর ভাগর হইয়া উঠিয়াছে! রাজীব আরও শুনিলেন, গোপনে তাঁর পুত্র সভ্যতার মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া বিস্তর টাকা ঋণ করিয়া বসিয়াছেন! রাজীবের তখন শেষ অবস্থা। বার্দ্ধক্যে, এবং জরায়, তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া আসিতেছিল, সেই অন্তিমে, পুত্রের ও বিষয়ের পরিণাম ভাবিয়া, নিজের এই পরিণামে তিনি হরিনাম ভুলিয়া গেলেন! তৈলহীন প্রদীপ যেমন অন্তিমে দারুণ জ্বালা বুকে জ্বালিয়া নিবিয়া যায়, রাজীবের জীবন-প্রদীপও তেমনি শেষে বড় জ্বলিয়া পুড়িয়া নিবিয়া গেল! অন্তিম অধ্যায়, শেষ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরিয়া রাজীব দুইটী অনুরোধ

করিয়া যান! রাজীব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"বাপু, দেখ যেন অন্ন পাপটা আমার বংশে না হয়, আর যে দেনা করেছ তা আমি যে টাকা রেখে যাচ্ছি তাই হ'তে শোধ দিও। এখন আর অপব্যয় করো না, ধার করো না, বিষয় আশয়গুলিও নষ্ট কর না লক্ষ্মীবাপ্ আমার!" বৃদ্ধের আর কথা সরিল না, একবিন্দু অশ্রুও নাকি সেই শেষ মুহূর্ত্তে, তাঁর অপাঙ্গে দেখা দিয়াছিল!

আমরা জানি, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পিতার, এই অন্তিম অনুরোধের প্রথমটী বরাবরই রক্ষা করিয়াছিলেন। উইলসন হোটেলে প্রথম সময়ে "Rice" বাইস্ দিতে আসিলে, কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "ওটা আর দিও না, পিতৃআজ্ঞা অন্নপাপ করা হবে না"। দ্বিতীয় আদেশ প্রতিপালনে তিনি যে, বিশেষ সমর্থ হইয়াছিলেন, এমনটী বলিতে পারি না! পিতার মৃত্যুর পর, কৃষ্ণচন্দ্রের খরচ অধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল, তবে এ সকলকে তিনি সদা অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন না! এই ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের আর একটা খেয়াল্ চাপিয়াছিল, তিনি বুঝিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে একটা টাইটেল—রাজা কি নিতান্ত পক্ষে, প্রসাদ-বারে রায় বাহাদুর না লইতে পারিলে, তাঁর বাবুয়ানা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে! এ অসম্পূর্ণতা দূর করিতে কৃষ্ণচন্দ্র যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই! জলের মত অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন! শুনিতে পাই তাঁহার এত চেষ্টা ও অর্থব্যয় নিতান্ত বৃথায় যায় নাই, তবে টাইটেলগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁকে বিষয়সহ ঋণ-গ্রাহগ্রস্ত হইয়াছিল।

বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা।

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে জর্ম্মান্ অধ্যাপক ডাক্তর পৌল্ ডয়সেন্ সাহেবের মত সাধারণ পাঠকদিগের নিমিত্ত নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক ভারতবর্ষে অধিকাংশ প্রাচীন দর্শনের কেবল ঐতিহাসিক গৌরব আছে মাত্র। যথার্থ সাংখ্যমতাবলম্বী অল্পই দেখা যায়, ন্যায় শুদ্ধমাত্র ব্যাকরণ এবং অঙ্কশাস্ত্রের মত বুদ্ধির চর্চ্চা এবং কৌশল প্রকাশে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত এখনও প্রত্যেক চিন্তাপরায়ণ হিন্দুর হৃদয় যন জীবন্তভাবে অধিকার করিয়া আছে। যদি চ রামানুজ, মাধ্ব এবং বল্লভ কর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈত নামে বেদান্তদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত হইয়াছে তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈদান্তিকদের মধ্যে বারো আনা অংশই শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী।

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দরিদ্র ভারতবর্ষের বিপুল দুর্ভাগ্যের মধ্যে ইহাই একটি মহৎ সান্ত্বনার কারণ। কারণ অনিত্য বিষয়ের অপেক্ষা নিত্য বিষয়ের গৌরব অধিক; এবং পৃথিবীতে নিত্য সত্য অন্বেষণ চেষ্টায় মানবের প্রতিভা যত কিছু অমূল্যতম পদার্থ সঞ্চয় করিয়াছে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য তাহার অন্যতম, উহা প্লেটো এবং কাণ্টের রচনার সহিত তুলনীয়।

শঙ্কর উপনিষদকে চরম প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সব উপনিষদের নানা বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সাধন পূর্ব্বক তাহা হইতে একটি আদ্যোপান্ত সুসঙ্গত দার্শনিক তত্ত্ব প্রণয়ন করা সহজ ব্যাপার হয় নাই। উপনিষদের স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে নানাপ্রকারে বর্ণিত করা হইয়াছে আবার তিনি বাক্য মনের ও মনের অগম্য

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—কোথাও বা ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন তাহার দীর্ঘ বিবরণ পাঠ করা যায় আবার কোথাও বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই মায়া ইহাও কথিত হইয়াছে। কোথাও বা আত্মার সংসার ভ্রমণের বিচিত্র কল্পনা দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও বা উক্ত হইয়াছে আত্মা কেবল একমাত্র।

শঙ্কর এই সকল বিরুদ্ধ বচনের মধ্য হইতে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য-সহকারে পথ কাটিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি উপনিষদের সমস্ত উক্তি হইতে দুইটি শাস্ত্র গঠন করিয়াছেন,—একটি কেবল নিগূঢ় দার্শনিক, ইংরাজিতে যাহাকে esoteric কহে, শঙ্কর যাহাকে নিষ্প্রপঞ্চ বা নির্গুণা বিদ্যা কথন বা পারমার্থিকী অবস্থা কহিয়াছেন; ইহার মধ্যে সেই তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে যাহা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই অতি অল্পসংখ্যক লোকের ধারণাগম্য। দ্বিতীয়টি সাধারণ ধর্ম্মত, শঙ্কর ইহাকে সগুণা বিদ্যা, ব্যবহারিকী অবস্থা কহিয়াছেন; ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য, যাহারা রূপ চাহে স্বরূপ সত্য চাহে না, পূজা করে ধ্যান করে না।

অধ্যাপক মহাশয় এই দুইটি, এক্সটেরিক্ এবং এসোটেরিক্—ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিদ্যাকে চারি প্রধান অংশে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন।

প্রথম। ব্রহ্মতত্ত্ব। Theology।

দ্বিতীয়। জগতত্ত্ব। Cosmology।

তৃতীয়। অধ্যাত্মতত্ত্ব। Psychology।

চতুর্থ। পরকালতত্ত্ব। Eschatology।

১। ব্রহ্মতত্ত্ব।

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়। তিনি সর্ব্বব্যাপী আকাশ, তিনি সূর্য্য মধ্যস্থ দেবতা, তিনি চক্ষু-

অন্তর্গত পুরুষ, দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার নিঃশ্বাস, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ, তিনি জগদাত্মা-রূপে বহিস্তোমহীরূপে এবং জীবাত্মারূপে অণোরণীয়ান্; তিনি বিশ্বরূপে ঈশ্বর, মনুষ্যকৃত পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারবিধাতা।

শঙ্কর এই সমস্ত বর্ণনাকে তাঁহার সগুণা বিদ্যার মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা নহে, ভক্তির দ্বারা নিত্য সত্যের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য এই সকল বিদ্যা উপযোগী, এবং ইহা-দের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ফল আছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, যে, সকল করিয়া দেখা আবশ্যক ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে বর্ণনা সেও সগুণা বিদ্যার অন্তর্গত. সেও সাধারণের জন্য, তাহাতে পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব পাওয়া যায় না; বস্তুতঃ যখন বিবেচনা করিয়া দেখা যায় গুণ (Personality) বলিতে কি বুঝায়, তাহার সীমা কতই সঙ্কীর্ণ, তাহা অহঙ্কারের সহিত কত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট, তখন ব্রহ্মে প্রতি গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে খর্ব করিতে কে ইচ্ছা করিবে?

এই সগুণা বিদ্যার সহিত পরমাত্মার নির্গুণা ভাবের সম্পূর্ণ প্রভেদ। তৈত্তিরীয় বাক্যমনের অতীত বলিয়া তাহার মূল সূত্র।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

পুনশ্চ;—

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

পুনশ্চ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন—নেতি নেতি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে যত প্রকার চেষ্টা কর এবং তাঁহাকে বর্ণনা করিতে যে কোন বাক্য প্রয়োগ কর, তাহার উত্তর, ইহা নহে ইহা নহে। সেই জন্য রাজা বাকলি যখন বাহ্য বস্তুকে ব্রহ্মের

স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বালক পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে তিনি কহিলেন, আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না—শান্তোঽয়মাত্মা, পরমাত্মা শান্ত। আমরাও এক্ষণে কাণ্টের শিক্ষামত জানিয়াছি যে, আমাদের মনের প্রকৃতিই এমন যে কিছুতেই আমরা দেশকাল ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অতীত সত্তাকে জানিতে পারি না। অথচ তিনি আমাদের অপ্রাপ্য নহেন তিনি আমাদের হইতে দূরে নাই, কারণ, তিনি সম্পূর্ণরূপে সমগ্রতঃ আমাদের আত্মাস্বরূপেই রহিয়াছেন। এবং আমরা যখন বাহির্দেশ হইতে, এই প্রতীয়মান জগৎ-সংসার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরের গভীরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি সেখানে ব্রহ্মে আসিয়া উপনীত হই—জ্ঞানের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা, আপনার মধ্যে আপনার সংহরণের দ্বারা। * জ্ঞানে এবং অনুভবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকে পরন্তু অনুভবে উভয়ে বিমিশ্রিত হইয়া যায়। অনুভবের দ্বারা আমি ব্রহ্ম এই ধারণা লাভ করার অবস্থাকে শঙ্কর "সমাধান" কহিয়াছেন।

২। জগত্তত্ত্ব।

জগত্তত্ত্বেরও দুই বিভাগ আছে, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। ব্যবহারিক বিদ্যায় জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ব্রহ্ম কর্ত্তৃক তাহার সৃষ্টিকারিনী বিচিত্র কল্পনা-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু অনন্ত কাল অনর্থক যাপন করিয়া সহসা কালের একটি

---

* এই খানে বলিয়া রাখা আবশ্যক ইংরাজি Knowledge শব্দ যেমন আমি এখানে অনুবাদ করিলাম।

অনুবাদক।

বিশেষ অংশে অবস্তু কারণের দ্বারা বস্তু-জগতের সৃষ্টি কেবল যে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের বিরোধী তাহা নহে তাহা বেদান্তের একটি প্রধান মতের বিপরীত, যে মতে আমাদিগকে "সংসারস্য অনাদিত্বম্", জন্ম মৃত্যুর অনাদি স্বভাব শিক্ষা দিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য সুন্দর কৌশলে এই বিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন সৃষ্টি কেবল একবার হয় নাই, অনন্তকাল যাবৎ ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে এবং লয় পাইতেছে। কোন সৃষ্টিকেই আমরা আদি সৃষ্টি বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে কেন সৃষ্টি করিলেন? তাঁহার নিজের গৌরব প্রচারের জন্য? এরূপ অহংকার তাহাতে আরোপ করা সঙ্গত নহে। তাঁহার নিজের খেলার জন্য? কিন্তু অনন্তকাল ত তিনি এই খেলনক-জগৎ স্থাপন করিয়াছেন। জীবের প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত? কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার প্রতি প্রীতি কিরূপে সম্ভব হইবে, এবং অসংখ্য জীবকে সৃষ্টি করিয়া অনন্ত দুঃখে নিমগ্ন করার মধ্যে প্রীতির লক্ষণ কি দেখা যায়?—ব্যবহারিক বেদান্ত পুনঃপুনঃ-জগৎসৃষ্টির একটি ধর্ম্মনিয়মগত আবশ্যকতা (moral necessity) দেখাইয়া এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

শঙ্কর কহেন—মনুষ্য উদ্ভিদের ন্যায়। অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মরে না। শস্যের চারা যেমন মরিবার পূর্ব্বে বীজ রাখিয়া যায় এবং সেই বীজ স্বাপন গুণানুসারে নূতন চারা উৎপন্ন করে, তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকালে স্বাপন কর্ম্ম রাখিয়া যায়, সেই কর্ম্ম পরজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া ফলপ্রসবার বহন করে। কোন জন্ম প্রথম নহে কারণ তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মের ফল, এবং শেষ নহে কারণ তাহার কর্ম্ম পরবর্ত্তী [illegible]

হইবে। অতএব সংসার অনাদি অনন্ত, এবং প্রলয়ের পরে জগতের পুনঃসৃজন পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আবশ্যক।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, নিম্নোল্লিখিত এই সংসার যদিচ পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্যের কাল্পনিক ছায়ি। কারণ, সত্যকে স্বরূপভাবে আমরা বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। এই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুবাদকে কাল্পনিক কেন বলিতেছেন? না, যাহা যথার্থতঃ দেশকালের অতীত সুতরাং আমাদের বুদ্ধির অগম্য তাহাকে দেশকালের ছাঁচে ঢালিয়া দেখান হইতেছে। নির্গুণ বিদ্যা হইতে সগুণ যত দূরে, সত্য হইতে এই সংসার ততদূরে। অর্থাৎ ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে বটে কিন্তু তাহা সত্যের রূপকমাত্র, সেই রূপক ব্যতীত মনুষ্যবুদ্ধিতে সত্যের ধারণা হইতেই পারে না। ব্যবহারিক বেদান্ত এই রূপক লইয়া এবং পারমার্থিক বেদান্ত রূপ ভেদ করিয়া সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত।

পারমার্থিক বিদ্যা কহিতেছেন, যাহাকে আমরা জগৎ বলি তাহা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়মাত্র, নিকটে আসিলেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। জগৎ যে মায়ামাত্র তাহা তর্কের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা জানা যায়। নিজের আত্মগুহায় প্রবেশ করিয়া যখন দেশকালাতীত নির্ব্বিকার শুদ্ধসত্যের অনুভব হয় তখন তদ্ব্যতীত আর সমস্তই স্বপ্নরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মনস্বীগণ এই পথে গিয়াছিলেন এবং গ্রীসীয় তত্ত্বজ্ঞানী প্লেটো, তিনিও এই সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, জগৎ ছায়ামাত্র এবং সত্য ইহার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। প্লেটো এবং বৈদান্তিক ঋষিদের মতের সাদৃশ্য ঐক্য আছে কিন্তু উভয়েই কেবল আত্মপ্রত্যয়দ্বারা এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন আপন মত কেহ প্রমাণ করিতে পারেন

নাই। এইস্থানে জর্ম্মন্ পণ্ডিত কাণ্ট্ ভারতীয় গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় দর্শনের অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। কাণ্ট বৈদান্তিক ও প্লাটোনিক আত্মপ্রত্যয়ের পথ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মানবমনকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কাণ্ট্ দেখাইয়াছেন, যে, বাহ্য জগতের ভিন মূল পদার্থ দেশ, কাল এবং কার্য্যকারণসম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বাহ্যসত্তার অনাদি অনন্ত ভিত্তিভূমি নহে তাহা আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির ছাঁচ মাত্র। তাহা বাহিরে নাই আমাদের মনে আছে ইহা কাণ্ট্ এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শোপেন্‌হৌয়ার পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা এই যে জগৎকে দেশে ব্যাপ্ত, কালে প্রবাহিত এবং কার্য্যকারণসম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখিতেছি তাঁহাদের মতে ইহা কেবল আমার মনের কার্য্য মাত্র। শঙ্কর কহেন, জগৎ মায়া; প্লেটো কহেন জগৎ ছায়া; কাণ্ট্ কহেন জগৎ আমাদের মনের প্রতীতি মাত্র সত্য পদার্থ নহে। পৃথিবীর তিন বিভিন্ন প্রদেশে এই এক মত দেখা দিয়াছে কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেবল কাণ্ট্-দর্শনের মধ্যেই আছে।

৩। অধ্যাত্মতত্ত্ব।

সকলই মায়া, কেবল আমার আত্মা মায়া হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন আপনাকে অস্বীকার করিতে গেলেও স্বীকার না করিয়া থাকিবার যো নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি। তাঁহার পরবর্ত্তী রামানুজ, মাধব এবং বল্লভের মত শঙ্কর পূর্ব্বে হইতেই খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না কারণ ব্রহ্ম অংশনহিত (অংশ বলিতে, দ্রব্য, কালের পর্য্যায়, নয়, দেশের সংস্থান বুঝায়)। জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ, আমরা যাহাকিছু জানি

উপলব্ধি করিয়া থাকি ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং। জীব ব্রহ্মের বিকার হইতে পারে না, কারণ, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার (কাণ্টের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত)। সিদ্ধান্ত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশও নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রও নহে, ব্রহ্মের বিকারও নহে—পরন্তু সম্পূর্ণতঃ স্বয়ং পরমাত্মা। এই সিদ্ধান্তে বেদান্তবাদী শঙ্কর, প্লেটো-দর্শনবাদী প্লোটিনোস্, এবং কাণ্ট-দর্শনবাদী শোপেনহৌয়ার ঐক্য লাভ করিয়াছেন। শঙ্কর অপর দুই দার্শনিক হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি কহেন আমার আত্মাই যদি স্বয়ং ব্রহ্ম হইল তবে সুতরাং সর্ব্বব্যাপকতা, নিত্যতা এবং সর্ব্বশক্তিমত্তাও আমার আছে। (অর্থাৎ আমি দেশকাল এবং কার্য্যকারণবন্ধনের অতীত)। শঙ্কর কহেন, যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি গোপন থাকে তেমনি এ সকল শক্তিও আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, মুক্তির পরে তাহার প্রকাশ হয়।

কেনই বা প্রচ্ছন্ন থাকে?

শঙ্কর কহেন উপাধি সকল তাহার কারণ।

উপাধি কি কি? না, মন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং তাহার পঞ্চ শাখা, এবং সূক্ষ্ম শরীর। ইহারাই জন্মে জন্মে আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে।

উপাধিত্রয় কোথা হইতে আসিল? মায়া হইতে। আবার মায়ার উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে। কিন্তু এই যে আমাদের অজ্ঞান, পাপ এবং দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা, ইহার কারণ কি? ভারতবর্ষ এবং গ্রীস্ ইহার সদুত্তর দেন নাই। কাণ্ট কহিতেছেন, তুমি অবিদ্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? অবিদ্যার কারণ থাকিতেই পারে না। যেহেতু এই সংসারের মধ্যেই কার্য্যকারণসূত্রের অবসান—সংসারের বাহিরে কার্য্যকারণের শাসন নাই—অতএব

অবিদ্যার কারণ অনুসন্ধান বৃথা। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে এই দুঃখ পরম অজ্ঞান হইতে আমাদের মুক্তি পথ আছে।*

৪। ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্ব।

এক্ষণে, সংসার হইতে যে মুক্তির পথ আছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাইতে।

বেদের প্রাচীন শ্লোকে প্রথমে স্বর্গ এবং পরে নরকের কথা আছে কিন্তু সংসারবাদ অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ কোথাও দেখা যায় না।

বেদান্তে স্বর্গনরক ভোগ এবং পুনর্জন্ম উভয় মতই মিশ্রিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে পুণ্যকারীগণ পিতৃযান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ চন্দ্রলোকে গমন করেন সেখানে আপন সৎকর্ম্মের ফল নিঃশেষ করিয়া পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর ব্রহ্মলোকে গমন করেন, পৃথিবীতে তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম নাই। কিন্তু তাঁহারা যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন তিনি সগুণ ব্রহ্ম এবং এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসকেরা যদিচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না তথাপি তাঁহাদিগকে সম্যক্‌দর্শন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পাপকারীদের জন্য নরক যন্ত্রণা এবং তদবসানে বারম্বার নীচজন্ম-ভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এই স্বর্গ এবং সংসার কেবল তাহাদেরই পক্ষে সত্য যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। যাহারা অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নহে।

---

* শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন—অজ্ঞান কেন ভবতীতিচেৎ? ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং। অজ্ঞান কাহা হইতে হয়? কাহা হইতেও হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয়।

পারমার্থিক বেদান্তমতে এই জগৎ এবং সংসার কিছুই সত্য নহে, সত্য কেবল ব্রহ্ম যিনি আমাদের আত্মারূপে উপলব্ধ হন। "আমিই ব্রহ্ম," এই জ্ঞানের দ্বারায় যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা নহে, এই জ্ঞানই মোক্ষ।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।

যখন শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায় তখন হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় দূর হয় এবং সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

নিঃসন্দেহ কোন লোক কর্ম্ম ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, জীবন্মুক্তও নহে। কিন্তু তিনি জানেন, যে, সকল কর্ম্মই মায়াময় এই জন্য কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি থাকে না এবং সেই আসক্তিহীন কর্ম্ম মৃত্যুর পরে পুনর্জ্জন্মের কারণ হইতে পারে না।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, লোকে বেদান্তকে ধর্ম্মনীতিঅংশে অঙ্গহীন বলিয়া দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিকও ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কর্ম্ম অপেক্ষা ধ্যানের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী। কিন্তু তথাপি তাঁহার মতে উচ্চতম এবং বিশুদ্ধতম ধর্ম্মনীতিজ্ঞান বেদান্ত হইতে প্রসূত হইয়া থাকে। প্রতিবেশীকে আপনার মত ভালবাসা বাইবেলের মতে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মনীতি—এবং কথাটিও সত্য বটে। কিন্তু যখন আমি সমস্ত সুখদুঃখ নিজের মধ্যেই অনুভব করি প্রতিবেশীর মধ্যে করি না তখন প্রতিবেশীকে কেনই বা নিজের মত ভাল-বাসিব? বাইবেলে ইহার কোন উত্তর নাই কিন্তু বেদের একটি কথায় ইহার উত্তর আছে—তত্ত্বমসি—তুমিও সে। বেদ বলেন তুমি ভ্রমক্রমে আপনাকে প্রতিবেশী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জান, কিন্তু তোমরা এক। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—যিনি আপনার মধ্যে

সকলকে দেখেন তিনি ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং, আপনার দ্বারা আপনাকে হিংসা করেন না। ইহাই সমস্ত ধর্ম্মনীতির সার কথা এবং ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতিষ্ঠাভূমি। তিনি আপনাকেই সর্ব্ব বলিয়া জানেন এই জন্য কিছু প্রার্থনা করেন না;—তিনি আপনাতেই সমস্ত উপলব্ধি করেন এই জন্য কাহারও ক্ষতি করেন না, তিনি মায়া দ্বারা পরিবৃত হইয়া জগতে বাস করেন অথচ মুগ্ধ হন না। অবশেষে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাঁহার পক্ষে আর সংসার থাকে না; ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। তিনি ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। তিনি নদীর ন্যায় ব্রহ্মসমুদ্রে প্রবেশ করেন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্র
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

এই যে মিলন ইহা অনন্ত সমুদ্রে জল বিন্দুর মিলনের ন্যায় নহে; এ যেন অনন্ত সমুদ্র তুষারবন্ধন মোচন করিয়া আপন সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্য এবং সর্ব্বক্ষম স্বরূপে প্রত্যাগমন করিল, যথার্থতঃ যে স্বরূপ তাহার চিরকাল আছে এবং কোন কালেই দূর হয় নাই।

অনুবাদকের প্রশ্ন।

অধ্যাপক ডয়সেন্ বেদান্তমতের যে সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উপরে প্রকাশিত হইল।

আমরা অনেক সময় এক রহস্যের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশে অন্য রহস্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

ডয়সেন্ সাহেব বেদান্তমত অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে,

নির্ব্বিকার ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্টি এবং অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বিভাগ কল্পনা করা মানব যুক্তির বিরোধী। সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বেদান্ত বলেন যে, জগৎ নাই এবং ব্রহ্মে এবং জীবে যে প্রভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা ভ্রম মাত্র তখন মানবের মনে যে সহজ দুই একটি প্রশ্ন উদয় হয়, তাহার পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন: ভ্রম কাহার?

উত্তর। জীবের।

ইহাকে মীমাংসা বলে না। কারণ, জীবের ভ্রমে জীব হইতে পারে না।

শঙ্কর কহেন স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর নামক উপাধিত্রয়ের দ্বারা আবৃত হওয়াতেই আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু এই শরীর পরিগ্রহ কোথা হইতে হইল? শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি?

শঙ্করাচার্য্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন।

কর্ম্মণা। কর্ম্ম দ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়।

কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? কর্ম্মই বা কিসের দ্বারা হয়?

রাগাদিভ্যঃ। রাগ প্রভৃতি হইতে।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদি কি করিয়া হয়?

অভিমানাৎ। অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অভিমান কি জন্য হয়?

অবিবেকাৎ। অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেক কি নিমিত্ত হয়?

অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ। অজ্ঞান কাহার দ্বারা হয়?

ন বেলাপি স্বতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ম্। আমার জানাই হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয়।

এখনে দেখা যাইতেছে উপাধিপরিগ্রহ দ্বারা জীবব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বকারণ অজ্ঞান, অবিদ্যা।

অজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা মনে করিতে পারি না; তাহা কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আছে। সে অজ্ঞান যদি ব্রহ্মের হয় তবে ব্রহ্মকে নিরঞ্জন নির্ব্বিকার বলা যায় না। যদি তাহার পৃথক্ অনাদি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান এই দুই অস্তিত্ব মানিতে হয়। তবে ওটা কেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব ভিন্ন নামে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মও অনাদি অনির্ব্বচনীয় এবং অজ্ঞানও অনাদি অনির্ব্বচনীয়, অথচ ব্রহ্মই অজ্ঞান নহেন এবং অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। ইহা স্বীকার করা যদি সহজ হয় তবে জীব এবং ব্রহ্ম, জগৎ এবং ঈশ্বর, বিভিন্ন রূপে স্বীকার করাও সহজ।

বেদান্তশাস্ত্রে জগদ্ভ্রমের যতগুলি উপমা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই দ্বৈতমূলক। শুক্তিতে রূপ্যভ্রম। এ ভ্রম ঘটিতে অন্তত তিনটি পদার্থের আবশ্যক হয়—শুক্তি এবং রূপ্য এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি। মৃগতৃষ্ণিকাও এইরূপ। যাহাকে ভ্রম করা যায়, যাহা বলিয়া ভ্রম করা যায় এবং যে ভ্রম করে এই তিন ব্যতীত ভ্রম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না।

ডয়সেন্ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের শেষে যে তুলনা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই তুলনার দ্বারাই কথাটার সাম্যবিরোধ প্রকাশ পায়। মূলের সহিত উদ্ধৃত করা উচিত।

It is not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean, becoming free from the

fetters of ice, returning from its frozen state to that what it is really and has never ceased to be, to its own all-pervading, eternal, almighty nature.

বস্তুতঃ ইহার অর্থ এই যে, যদি সমুদ্রে দাঁড়াইতে পারে এ কথা বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে ভেদ স্বীকার করা হয়; কঠিন সমুদ্র গলিয়া স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল তাহাও বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে অজ্ঞানের বিক্রিয়া স্বীকার করা হয়—বলিতে হয় সমুদ্র যাহা আছে যাহা ছিল তাহাই রহিল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ পাওয়া যায় না, কারণ পূর্ব্বে বলা হইতেছিল জীবমুক্ত যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার কি দশা হয়—তিনি নদীর মত সমুদ্রে পড়েন অথবা কঠিনাবস্থাপ্রাপ্ত সমুদ্রের ন্যায় গ্রীষ্মোত্তাপে গলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন? তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, যে জীবের মৃত্যুর কথা হইতেছিল সে জীব ছিল না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় নাই। তবে, সে জীব ছিল এ কথা উঠে কোথা হইতে? ভ্রম হইতে। কাহার ভ্রম? যদি ব্রহ্মের ভ্রম হয় তবে ত যথার্থই তাঁহার বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর, ভ্রম বটে কিন্তু কাহারও ভ্রম নহে! সে স্বতই ভ্রম, সে অনাদি অনির্ব্বচনীয়!

স্বীকার করিতে হয় যে, যদি দ্বৈতবাদ অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে মূলরহস্যের আবর্ত্ত মধ্যে বুদ্ধিতরণী ইহা পেলেই এইরূপ গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু যখন কোন অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদকে যুক্তির বিরোধী বলিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে থাকেন তখন তাঁহাকেও হাস্যাস্পদের দলিক না করিয়া থাকা যায় না। বোধ করি, ব্যাখ্যাতাদের মূল প্রদেশে ভেদ এবং অভেদের কোন এক আশ্চর্য্য সমন্বয় আছে যাহা আমাদের বুদ্ধি নিকট রহস্যাচ্ছন্ন। সেখানে বোধ করি মন এবং বুদ্ধি

শাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া এককে দুই বলা যায় এবং দুইকে এক বলিলেও অর্থের বিরোধ হয় না।

বেদান্তের ধর্ম্মনীতিবিষয়ে ডয়সেন্ সাহেব যে কথা কয়েকটি বলিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও আমাদের প্রশ্ন আছে।

ডয়সেন কহেন পুনঃপুনঃ জন্মমরণ ও জগৎসৃষ্টির একটি moral necessity অর্থাৎ ধর্ম্মনিয়মগত আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বহনের জন্য জন্মলাভ অনন্তধর্ম্মনিয়মের অবশ্যম্ভব বিধান। কর্ম্ম ফল ফলিতেই হইবে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদে ধর্ম্মনিয়মের অবশ্যম্ভবতার কোন অর্থ নাই। যেখানে এক ছাড়া দুই নাই সেখানে "মরল্" বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।

শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—যে, কর্ম্ম অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এবং অজ্ঞান অনাদি। অজ্ঞান নামক এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ হইতে কর্ম্ম নামক এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া আমাদের জীব গ্রহণের কারণ হইয়াছে, এবং সেই অনির্ব্বচনীয় পদার্থের ফলস্বরূপে আমরা শরীরধারীগণ পুনঃপুনঃ জন্ম ও দুঃখ ভোগ করিতেছি ইহাকে যে-কোন নিয়ম বলা যাক্ ধর্ম্মনিয়ম বলিবার কোন হেতু দেখি না। প্রথমতঃ, অজ্ঞান বলিতে কি বুঝায় আমরা জানি না, এবং জানিতেও পারি না, কারণ তাহা অনির্ব্বচনীয়। (তবে যে কেন তাহাকে অজ্ঞান নাম দেওয়া হইল বলা কঠিন; কারণ, উক্ত শব্দে একটা নির্ব্বচন প্রকাশ পায়।) দ্বিতীয়তঃ, তাহা হইতে কর্ম্ম হইল বলিতে যে কি বুঝায় আমাদের বলা অসাধ্য, কারণ আমরা কর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। অবশেষে আরও কতকগুলি নিরালম্ব গুণপরম্পরা হইতে

শরীরী জীবের জন্ম হইল। এ সকল কথা বলাও যা আর শরীরের প্রথম সৃষ্টি কি করিয়া হইল তাহা বলিতে পারি না এবং যদি কেহ বলিতে পারিত তথাপি আমরা বুঝিতে পারিতাম না এ কথা বলাও তা'—বরঞ্চ শেষোক্ত কথাটা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সরল।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বেদান্ত যেমন আমাদের শরীর পরিগ্রহের কোন জ্ঞানগম্য কারণ দেখাইতেছেন না, তেমনি আমাদের দুঃখ ভোগেরও কোন কারণ নির্ণয় করিতেছেন না। যে হেতু, কর্ম্ম নামক কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থকে আমাদের দুঃখভোগের কারণ বলাও যা, আর আমাদের দুঃখ ভোগের কারণ জানি না বলাও তা।

বেদব্যাসরচিত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে।

বেদব্যাস বলিতেছেন ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ ছিল না এ কথা বলা যায় না যেহেতু কর্ম্ম এবং সৃষ্টি কার্য্যকারণরূপে অনাদি। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। বীজও বৃক্ষের কারণ এবং বৃক্ষও বীজের কারণ এই ভাবে কোন কালেও কাহারও আদি পাওয়া যায় না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কর্ম্মের ফল সৃষ্টি এবং সৃষ্টির ফল কর্ম্ম ইহার আর শেষ নাই। বোধ করি এস্থলে কর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় ইংরাজি ফোর্স্ বলিতেও তাহা বুঝায়—অর্থাৎ এমন একটা কিছু বুঝায় যাহা আমরা ঠিক বুঝি না অথচ বুদ্ধিগম্য একটা ছবির আভাস আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা মিলাইয়া দেখিতে গেলে মিলাইতে পারি না।

তথাপি যেমন করিয়াই দেখি এবং বেদান্তশাস্ত্রে যেমন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় শেষকালে দাঁড়ায় এই যে, আমরা কেন হইয়াছি এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। আমরা হইয়াছি—আমাদের হওয়াটা

অনাদি। এবং ইওয়াটিই দুঃখভোগের কারণ—সুতরাং কেন দুঃখ-ভোগ করিতেছি তাহারও কোন কেনত্ব নাই। অতএব এস্থলে "মরল্" অথবা অন্য কোন "নেসেসিটি" দেখা যায় না।

মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন অজ্ঞান অনাদি তখন সে অনন্ত। যতক্ষণ সে আছে ততক্ষণ কাহারো মুক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, বেদান্ত মতে আমি সকলের অন্তর্গত এবং আমার অন্তর্গত সকলি, যতক্ষণ অজ্ঞান কোথাও আছে ততক্ষণ সে অজ্ঞান আমাকে বদ্ধ করিতেছে। এ যেন আপনার ছায়াকে আপনি কেমন করিবার চেষ্টা করার মত।

কেন ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিলেন তদুত্তরে ব্রহ্মসূত্র কহেন, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং। লোকেতে যেমন বালকেরা রাজা প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়া লীলা করে জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের লীলা-মাত্র। এ মত অনুসারে, যাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জগতের মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে, অথবা ইচ্ছা প্রতিসংহার করিলে তাঁহার জগৎরূপ লীলারূপ দূর হইয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে, অতএব এস্থলে সমস্ত জগতের নিত্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির কোন অর্থ থাকিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ হওয়া তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তি-বিশেষ না হওয়াও তাঁহার ইচ্ছা, এবং ব্যক্তিবিশেষ না হইলেও যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ তিনি লীলারূপেই বিরাজ করিবেন।

ডয়সেন্ সাহেব অন্যত্র তাঁহার দর্শনেতে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিদ্যা নামক পরিচ্ছেদে প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, কাণ্টের অ-কাট্যবুদ্ধি অনুসারে দেশকাল ও কার্য্যকারণত্ব আমাদের বুদ্ধির ধর্ম্ম, বাহিরের ধর্ম্ম নহে। অতএব বস্তুকে যে আমরা বস্তুরূপে দেখিতেছি তাহা আমাদের বুদ্ধির রচনা। এই বুদ্ধির আরোপ

বাহির হইতে উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—সেই দেশকাল কারণাতীত পদার্থকে অধ্যাপক মহাশয় শোপেনহৌয়রের মতে উইল (ইচ্ছা) এবং বেদান্ত মতে আত্মা বলিতেছেন। এই একমেবাদ্বিতীয়ং অনবচ্ছিন্ন "উইল্" পদার্থের নোঙে আত্মার নির্গুণ ভাবই বিশুদ্ধভাব—তাহাতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, কার্য্যত্ব নাই।

এই বিভক্ত, দুঃখবিহীন কামনা বিহীন, নোঙত্বের আনন্দময় [illegible] একটা ঘোর একটা পাপের সূচনা দেখা দিল—(কোন বিশেষকালে নাহে, তাহাও বটে অনন্তকালও বটে অনন্তকালের পূর্ব্বেও বটে) এই উইল এই আত্মা ইতি-ভাত্মক সগুণ ভাব ধারণ করিল।

মূলের ভাষা উদ্ধৃত করি:—

"Here there was formed,—not at any time, but before all eternity, to-day and for ever,—like an inexplicable clouding of the clearness of the heavens, or the pure painless, and will-less bliss of denial, a morbid propensity, a sinful bent: the affirmation of the Will to life. In it and with it is given the myriad woes of all the sins and woes of which this miserable world is the revealer.

মানব বুদ্ধি চিরকাল এই করিতেছে সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? দুঃখের উৎপত্তি হইল কেন? শঙ্করাচার্য্য এবং ডয়সেন উত্তর দিতেছেন—এক অনাদি অনির্ব্বচনীয় পদার্থে এক অনাদি অনির্ব্বচনীয় ছায়া পড়িয়া তাহাই সৃষ্টি তাহাতেই দুঃখ। ইহার মর্ম্ম এই, সৃষ্টিই নাই তার সৃষ্টির কারণই বা কি তার দুঃখ পাপইবা কেন তাহা কিছুই জানি না। এই বেদান্ত মতে এই অনাদি অজ্ঞান

হইতে মুক্তিই বা কিরূপে এবং মুক্তিই বা কাহার তাহাও সুস্পষ্ট-রূপে বলা যায় না।

বৌদ্ধ নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না। তাহারা এ কথাও স্বীকার করে না যে জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদের মতে ব্রহ্মও নাই জগৎও নাই, আমিও নাই, তুমিও নাই—তাহাদের যুক্তি কিছুকাল পূর্ব্বে সাধনায় অনুবাদ করিয়া দেখান হইয়াছিল। যাহা অনাদিকাল আছে তাহা অনন্তকালে ধ্বংস হইতে পারেনা, তাহাকে মায়াই বল আর সত্যই বল, অতএব তাহাকে একবার স্বীকার করিলে মুক্তি স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাস্তিবাদীরা কিছুই মানেনা তাহাদের পক্ষে সকল কথাই সহজ। যদি বলি কিছুই যদি নাই তবে তুমি তাহা প্রমাণ করিতেছ কি করিয়া। তখন তাহারা প্রমাণ করিতে বসে যে তাহারা প্রমাণ করিতেছে না। যদি বলি, কিছুই যদি নাই তবে তুমি মুক্তির কথা পাড় কেন—তখন সে বলে যখন কিছুই নাই, তখন আমি কোন কথা বলিতেছি ইহাও হইতে পারে না। অতএব কোন কথাই স্বীকার না করিলে গায়ের জোর খাটানো সহজ হয়। কিন্তু যখনি এক স্বীকার করা গেল অমনি দুই প্রমাণ করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং দুই স্বীকার করিলেই তাহাকে এক বলিয়া চালানো কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি বল? আমি আদি অন্ত যখন কিছুই জানিনা, আমি কেবল এইটুকু জানি আমার হৃদয়ে যে প্রীতি ভক্তি দয়া স্নেহ সৌন্দর্য্যপ্রেম আছে তাহা অনন্ত চরিতার্থতা চায়—এমন কি আমার সেই সকল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আমি অনন্তের আস্বাদ পাই—সেই আমার সর্ব্বসফলতা যিনিই হোন্ যেখানেই থাকুন তিনিই আমার ব্রহ্ম তাঁহাতেই আমার মুক্তি।

অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি।

৺ গোকুলনাথ দত্ত। ইন্দ্রলোক।

গোকুলনাথ। (স্বগত) আমি দেখ্‌চি স্বর্গটি স্বাস্থ্যের পক্ষে দিব্য জায়গা হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। অনেক উচ্চে থাকার দরুণ অক্সিজেন্ বাষ্পটি বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দনবনের তরুলতাগুলি কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস পরিত্যাগ করবার সময় পায় না, হাওয়াটি বেশ পরিষ্কার। এদিকে ধূলো নেই, তাতে করে একেবারে রোগের বীজই নষ্ট হয়েচে। কিন্তু এখানে বিদ্যাচর্চ্চার যে রকম অবস্থা দেখ্‌চি তাতে আমি সন্দেহ করি ধূলোয় রোগের বীজ উড়ে বেড়ায় এ সংবাদ এখনো এঁদের কানে এসে পৌঁচেছে কি না। এঁরা সেই যে এক সামবেদের গাথা নিয়ে পড়েছেন এর বেশি আর ইণ্টেলেক্‌চুয়াল্ মুভ্‌মেণ্ট্ অগ্রসর হল না। পৃথিবী দ্রুতবেগে চল্‌চে কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেম্‌নিই রয়েছে, কন্‌সার্ভেটিভ্ যতদূর হতে হয়।

(বৃহস্পতির প্রতি) আচ্ছা, পণ্ডিত মশায়, ঐ যে সামবেদের গান হচ্চে, আপনারা ত বসে বসে মুগ্ধ হয়ে শুন্‌চেন, কিন্তু কোন্ সময়ে ওর প্রথম রচনা হয় তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেচেন কি?—কি বল্লেন? স্বর্গে আপনাদের ইতিহাস নেই? আপনাদের সমস্তই নিত্য?—সুখের বিষয়! তাহলে দেব তারিখ মুখস্থ করতে হয় না—কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা ওতে করে কি অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকে না? ইতিহাস শিক্ষার উপযোগিতা কোন্ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।—প্রণব, ক—

মনোযোগ দিচ্চেন কি?—(স্বগত) গান শুনতেই যত তার

আর মন দেবে কি করে? পৃথিবী ছেড়ে অবাধ এঁদের কাউকে যদি একটি কথা শোনাতে পেরে থাকি! শুনতে কি না শুনছে মুখ দেখে কিছু বোঝবার যো নেই—একটা কথা বল্লে সেও তার প্রতিবাদও করে না, এবং কারো কথায় কোন প্রতিবাদ করলে তার একটা জবাব পাওয়াই যায় না। শুনেছি এইখানেই আমাকে সাড়ে পাঁচ কোটি সালে পঞ্চান্ন বৎসর কাটাতে হবে। তা হলেইত গেছি! আত্মহত্যা করে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে সে সুবিধাও নেই—এখানকার সাপ্তাহিক মৃত্যুসংখ্যার তালিকা অন্বেষণ করতে গিয়ে শুনলুম এখানে মৃত্যু নেই। অশ্বিনীকুমার নামক দুই ভৈষজ্য যে পদটি পেয়েছেন তাঁদের যদি যমরাজ পোষাক বরাদ্দ না পাঠান তা হলে সমস্ত স্বর্গ রেঁটিয়ে এক পয়সা ডিস্ট্রিক্ট জুটবে না। তবে কি করতে এঁরা এখানে আছেন তা আমাদের মানুষের বুদ্ধিতে বুঝতে পারিনে! কাউকে ত কোন হিসাব দিতে হয় না যার যা খুসি তাই হচ্চে। খাসা একটা ইরিগেশন্‌-ডিপার্টমেণ্ট, এবং নিয়মনত কাজ হত, তা হলে আমিই ত সর্ব্বাগ্রে ঐ চুনী কেল্‌থ্‌-অফিসারের পদ উঠিয়ে দেবার পরামর্শ দিতুম। এই যে মোক্ষ সভার মধ্যে অমৃত ছড়াছড়ি যাচ্চে, তার একটা হিসেব রাখা আছে? সে দিন ভাচী ঠাকরুণকে পটের উপর চিত্রিত করলুম, স্বর্গের সমস্ত ভাঁড়ার ও ভাণ্ডারের ভিস্তার আছে—খাতার খাক্ খলখায় রোজ তার কোন একটা হিসাব রাখে কি—কতটা, কি পরিমাণ, কি রকমের একটা নিকাশ রাখা হয়? সচীঠাকরুণ বল্লেন যারা মনে রাখে তারা স্বর্গে সৃষ্টি হয় অবধি একজনও আছে কি না সন্দেহ। যা পাচ্চিকের ঐশ্বর্য্য তার রীতিমত হিসাবদিহি থাকা চাই, সে মোক্ষটা এঁদের কারো দেখতে পাই নে, সাহস আছে বলেই

কি জন্যে খরচ করতে হবে? যদি আমাকে বেশি দিন এখানে থাকতেই হয় তা হলে স্বর্গের সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া রিফর্ম্ না করে আমি নড়চিনে। আমি দেখ্‌চি, গোড়ার দরকার অ্যাক্সিটেশন্—ঐ জিনিষটা স্বর্গে একেবারেই নেই—সব দেবতাই বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। এঁদের এই তেত্রিশকোটিকে একবার নীতিমত বিচলিত করে তুল্‌তে পারলে কিছু কাজ হয়। এখানকার লোকসংখ্যা দেখেই আমার মনে হয়েছিল এখানে একটি বড় রকমের দৈনিক কিম্বা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বেশ চালানো যেতে পারে। আমি যদি সম্পাদক হই, তা হলে আর দুটি উপযুক্ত সাব্‌এডিটর পেলেই কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। প্রথমতঃ নারদকে দিয়ে খুব এক চোট্ বিজ্ঞাপন বিলি করতে হয়; তার পরে বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক চন্দ্রলোক সূর্য্যলোকে প্রতিনিয়ত নিয়মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত করতে হয়—আহা, এই কাজটি যদি আমি করে নেতে পারি তা হলে স্বর্গের এ চেহারা আর থাকে না। যারা সব দেবতাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে স্বর্গে আসে, প্রতি সংখ্যায় তাঁদের একটি করে সংক্ষেপ মর্ত্তজীবনী বের করতে পারি তা হলে আমাদের পূর্ব্বীয় মহাত্মাদের মধ্যে একটা সেন্সেশন্ পড়ে যায়!—একবার ইন্দ্রের কাছে আমার প্রস্তাবগুলো পেড়ে দেখ্‌তে হবে!

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন্ মহেন্দ্র, আপনার সঙ্গে আমার গোপনে কিছু—(অপ্সরাগণকে দেখিয়া) ও! আমি জানতুম না এঁরা সব এখানে আছেন—মাপ্ করবেন—আমি যাচ্চি!—ও কি, শচীঠাকরুণও যে বসে আছেন! আর ঐ বুড়ো বুড়ো রাজর্ষি দেবর্ষিগুলোই বা এখানে বসে কি দেখ্‌চে? দেখুন্ মহেন্দ্র, স্বর্গে অন্তঃপুর আসন প্রথা প্রচলিত করেননি বলে এখানকার কাজকর্ম্ম ভাল রকম করে চল্‌তে না। আপনি যদি কিছুদিন এই

সমস্ত নাচ বাজনা বন্ধ করে দিয়ে আমার সঙ্গে আসেন তা হলে আমি আপনাকে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারি এখানকার কোন কাজেরই বিলি ব্যবস্থা নেই। কার ইচ্ছায় কি করে যে কি হচ্চে কিছুই বোঝবার যো নেই। কাজ এমনতর পরিষ্কার ভাবে হওয়া উচিত, যে, যন্ত্রের মত চল্‌বে এবং চোখ বুলিয়ে দেখ্‌বামাত্রই বোঝা যাবে। আমি সমস্ত নিয়ম নম্বরওয়ারি করে লিখে দিয়ে এসেছি—আপনার সহস্র চক্ষুর মধ্যে একযোড়া চোখও যদি এদিকে ফেরান তা হলে—আচ্ছা তবে এখন থাক্, আপনাদের গান বাজনাগুলো না হয় হয়ে যাক্ তার পরে দেখা যাবে।

(ভৈরব ঋষির প্রতি) আচ্ছা অধিকারী মশায়, শুনেছি গান বাজনায় আপনি ওস্তাদ, একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আছে। গানের সম্বন্ধে যে কটি প্রধান অঙ্গ আছে অর্থাৎ সপ্ত সুর, ভিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা—কি বল্লেন? আপনারা এ সমস্ত গানেন না—আপনারা কেবল আনন্দটুকু জানেন! তাইত দেখ্‌চি—এবং যত দেখ্‌চি তত অবাক্ হয়ে যাচ্চি! (কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া) ভরতঠাকুর—ঐ যে ভদ্র মহিলাটি—কি ওঁর নাম—রম্ভা? উপাধি কি বলুন? উপাধি বুঝ্‌চেন না? এই যেমন রম্ভা চাটুয্যে কি রম্ভা ভট্টাচার্য্যি—কিংবা ক্ষত্রিয় যদি হন ত রম্ভা সিংহ—এখানে আপনাদের ও সব কিছু নেই বুঝি?—আচ্ছা বেশ কথা—তা শ্রীমতী রম্ভা যে গানটি গাইলেন আপনারা ত ভাব্‌ যথেষ্ট প্রশংসা করলেন—কিন্তু ওর রাগিণীটি আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন? একবার ত দেখ্‌চি ধৈবত গান্ধারে আবার দেখি কোমল ধৈবতও লাগে—আবার গোড়ার দিকে—ওঃ, বুঝেছি আপনাদের কেমন ভালই লাগে, কিন্তু ভাল লাগ্‌বার কোন নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক তার উল্টো, ভাল না লাগেত পারে কিন্তু নিয়মটা থাকবেই। আপনাদের স্বর্গে যেটি

আবশ্যক সেটি নেই যেটা না হলেও চলে তার অনেক বেশি। সমস্ত সপ্তস্বর্গ খুঁজে কলকেশে যদি আধখানা নিয়ম পাওয়া যায় ত তখনি তার হাজারখানা ব্যতিক্রম বেরিয়ে পড়ে। সকল বিষয়েই তাই দেখ্‌ছি। ঐ দেখুন না বড়ামন বসে আছেন—ওঁর ছটার মধ্যে পাঁচটা মুণ্ডর কোনই অর্থ, পাবার যো নেই। শরীরতত্ত্বের কথাও যে জানে সেও বলে দিতে পারে একটা স্কন্ধের উপরে ছটা মুণ্ড নিতান্তই বাহুল্য!—হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ! ওঁর ছয় মাত্রা সোম পান করতে ওকে ছটা মুণ্ড ধারণ করতে হয়েছিল? ওটা বলি আইডিয়লিটি আমি কিজিয়লজির কথা বল্‌ছিলুম। ছটা যেন মুণ্ডই ধারণ করলেন—পাকযন্ত্র ত একটার বেশি ছিল না।—এই দেখুন না, আপনাদের স্বর্গের বন্দোবস্তটা। আপনারা শরীর থেকে ছায়াটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু সেটা আপনাদের কি অসুবিধে হচ্ছে? আপনারা স্বর্গের লোক—বলে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, আমি জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ ছায়াটাকে কখন পশ্চাতে কখন সম্মুখে, কখনো দক্ষিণে কখনো বামে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়িয়েছি, ওটাকে পুষ্‌তে একদিনের জন্যে দিব্যিপয়সা খরচ করতে হয়নি এবং অত্যন্ত শ্রান্তির সময়ও বহন করতে এক তিল ভার বোধ করিনি—ওটাকে আপনারা ছেঁটে দিলেন, কিন্তু ছটা পা, চারটে হাত, হাজারটা চোখ, শুঁড়ে পরচও আছে, ভারও হচ্ছে—অথচ সেটা সম্বন্ধে একটু ইকনমি করবার দিকে লক্ষ্য নেই। ছায়ার বেলাই টানাটানি, কিন্তু কায়ার বেলা মুক্তহস্ত!—সাধুবাদ দিচ্ছেন! দেখ্‌তে তাদের মধ্যে আপনিই তা হলে আমার কথাটা বুঝেছেন! সাধুবাদ আমাকে দিচ্ছেন না শ্রীমতী ঐশ্বরিকে দিচ্ছেন? ওঃ! তাহলে আপনি বরঞ্চ আমি সাধুবাদটা ওঁকে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

(কার্ত্তিকের পার্শ্বে বসিয়া) গুহ, আপনি ভাল আছেন ত? আপনাদের এখানকার মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট্ সম্বন্ধে আমার দুটো একটা খবর নেবার আছে। আপনারা কি রকম নিয়মে—আচ্ছা তাহলে এখন থাক্ আগে আপনাদের অভিনয়টা হয়ে যাক্! কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে নাটকটি অভিনয় হচ্চে এর নাম ত শুন্‌চি, চিত্রলেখার বিরহ—এর উদ্দেশ্যটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য দুরকমের হতে পারে এক জ্ঞানশিক্ষা, আর এক নীতিশিক্ষা। কবি, হয়, এই গ্রন্থের মধ্যে কোন একটা জাগতিক নিয়ম আমাদের সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নয় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভাল করলে ভাল হয়, মন্দ করলে মন্দই হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন, বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম অনুসারে পরমাণুপুঞ্জ কি রকম করে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র জগতে পরিণত হল—কিম্বা আমাদের ইচ্ছাশক্তি যে অংশে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মের ফল সেই অংশে বদ্ধ এবং যে অংশে পরবর্ত্তী কর্ম্মের জন্ম দেয় সেই অংশে মুক্ত এই চিরস্থায়ী বিরোধের সামঞ্জস্য কোন্‌খানে—কাব্যে যখন সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় তখন কাব্যের উদ্দেশ্য হাতে হাতে পাওয়া যায়। চিত্রলেখার বিরহের মধ্যে এর কোন্‌টি আছে? আপনি ত বিগলিতপ্রায় হয়ে এসেছেন; যে রকম দেখ্‌চি দেবলোকে যদি ফিজিয়লজির নিয়ম বলে একটা কিছু থাকে তাহলে এখনি আপনার দ্বাদশ চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হবে! যাই হোক্ কার্ত্তিক, এ বড় দুঃখের বিষয় স্বর্গে আপনাদের রাশি রাশি কাব্য নাটকের ছড়াছড়ি যাচ্চে কিন্তু তাতে গবেষণা কিম্বা চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় স্বর্গীয় গ্রন্থকারদের হাত থেকে এমন একটা কিছুই বেরচ্চে না! (ঈষৎ হাস্যসহকারে) দেখ্‌চি "চিত্রলেখার বিরহ" নাটক খানা আপনার

বড়ই ভাল লেগে গেছে তাহলে অন্য একদিন থাক্ আপনি ঐটেই দেখুন্।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন দেবরাজ, স্বর্গে পরস্পরের মতামত আলোচনার একটা স্থান না থাকাতে বড়ই অভাব বোধ করা যায়। আমার ইচ্ছা নন্দন কাননের পারিজাত কুঞ্জের মধ্যে যেখানে আপনাদের নৃত্যশালা আছে সেইখানে একটা সভাস্থাপন করি, তার নাম দিই, শতক্রতু ডিবেটিংক্লব। তাতে আপনারও একটা নাম থাকবে আর স্বর্গেরও অনেক উপকার হবে। না, থাক্, মাপ করবেন—আমার অভ্যাস নেই—আমি অমৃত খাইনে—রাগ করি না বল্লেন ত বলি ও অভ্যাসটা আপনাদের ত্যাগ করা উচিত—আমি দেখেছি দেবতাদের মধ্যে পানদোষটা কিছু প্রবল হয়েছে! অবশ্য ওটাকে আপনারা সুরা বলেন না, কিন্তু বল্লে কিছু অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতেও দেখতুম অনেকে মদকে ওয়াইন্ বলে কিছু সন্তোষলাভ করতেন। সুরেন্দ্র, আপনি শ্রীমতী মেনকাকে এইমাত্র যে সম্বোধনটা করলেন ওটা কি ভাল শুনতে হল? সংস্কৃত কাব্যে নাটকে দেখেছি বটে ঐ সকল সম্বোধন প্রচলিত ছিল, কিন্তু আপনি যদি বিবর্তসূত্রে খবর নেন ত জানতে পারবেন, ওগুলো এখন নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে! আমরা কি রকম সম্বোধন করি জানতে চাচ্ছেন? আমরা কখন বা মাতৃসম্বোধনও করে থাকি কখনো বা খাদ্যের বলি—আবার সময়বিশেষে ভালমানুষের মেয়ে বলেও সম্ভাষণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কোনটিই আপনি এই সকল মহিলাদের প্রতি প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করেন না? তা না করুন এটা স্বীকার করতেই হবে আপনারা ওঁদের সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলি উচ্চারণ করে থাকেন, তাতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কি বল্লেন? স্বর্গে সুরুচিও নেই কুরুচিও নেই? প্রথমটি

যে নেই সে বিষয়ে সন্দেহ করিনে—দ্বিতীয়টি যে আছে তা এখনি প্রমাণ করে দিতে পারি কিন্তু আপনারা ত আমার কোন আলোচনাতেই কর্ণপাত করেন না।

(শচীর নিকট গিয়া) দেখুন শচি আপনার কি মনে হয় না, স্বর্গসমাজের ভিতরে যে সমস্ত দোষ প্রবেশ করেছে সেগুলো দূর করবার জন্যে আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আপনারা যদি এ সকল বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করতে থাকেন তাহলে আপনাদের স্বামীদের চরিত্রের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে থাকবে। ওঁদের সম্বন্ধে যে সকল অপবাদের কথা প্রচলিত আছে সে আপনাদের অবিদিত নেই—মধ্যে মধ্যে যদি মিলে আহ্বান করে এ সকল বিষয়ে আলোচনা হয়—আপনারা যদি সাহায্য করেন তা হলে—কোথায় যান? গৃহকর্ম আছে বুঝি? (শচীকে উঠিতে দেখিয়া সকল দেবতার উত্থান এবং অকালে সভাভঙ্গ)। বড় মুস্কিলে পড়া গেল—কাউকে একটা কথা বল্লে কেউ শোনেও না—বুঝতেও পারে না। (ইন্দ্রের নিকট গিয়া কাতর স্বরে) ভগবন্ সহস্রলোচন গুরোডাশ শতক্রতো, আমার সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনর লক্ষ বৎসরের মধ্যে আর কত দিন বাকি আছে?

ইন্দ্র। (কাতরতর স্বরে) সাড়ে পাঁচকোটি পনরলক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার নব শ নিরেনব্বই বৎসর।

গোকুলনাথ এবং তেত্রিশকোটি দেবতার এক সঙ্গে সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পতন।

কৃতজ্ঞতা।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুসুমমালা আর মেমের কাছে পড়িতে যায় না। দুই দিন এই ভাবে গেল। মেম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে পরিচারিকারা বলে তাঁর অসুখ করিয়াছে। তিন দিনের দিন দীনেন্দ্র মেমের কাছে সে কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন—কেননা পীড়ার কোন কথা তিনি আদৌ জানিতেন না। ইহা কি সম্ভব যে কুসুম তাঁহার কাছে তাহা গোপন করিয়াছে? দীনেন্দ্র মেম সাহেবের নিকট একটু একটু অপ্রতিভ হইলেন। দিনের বেলায় অন্দরে গিন্নী ঠাকুরাণী সতীশ ও পুরপরিজনবর্গের চক্ষে মহাপাতক স্বরূপ গণ্য দীনেন্দ্র বেলা আড়াই প্রহরের সময় অকস্মাৎ শয়ন গৃহে উপস্থিত হইলেন। কুসুম তখন মিতিনমার সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্পে ভোর ছিল। মানদা ঠাকুরাণী আশঙ্কা করিতেছিলেন, পীড়ার ভাণ করিয়া কুসুমের কদিন চলিবে? পাড়িতে না গেলে মেম কালেক্টরের কাছে অবশ্য রিপোর্ট করিবে। তখন? তখন কোকার-সঙ্গে তাকে সদরে গিয়া মেম সাজিতেই হবে! কালেক্টর সাহেবকে বলিতে হবে বাপ, এবং টেবিলে খানা খেতে হবে। বলা বাহুল্য কথা এর বেশী নয়, কিন্তু মিতিনমার হাস্য সূত্রে প্রসঙ্গ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অতএব অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কোকা যে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, সেটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কুসুমকে অকস্মাৎ কচ্ছপের মত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখ লুকাইতে দেখিয়া অনাবৃত মস্তক এবং বক্ষোদেশ মানদা দেবী ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া দেখেন সর্ব্বনাশ, কোথায় যাব না!

দিনের বেলায় এ যে কোকন! কোন মতে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া ঠাকুরাণী ঊর্দ্ধশ্বাসে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। দীনেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "অত দৌড়ে যেয়ো না মিতিন মা, পড়ে যাবে যে!" সে কথা ঠাকুরাণী কানে তুলিলেন না।

বলা বাহুল্য অন্দর মহলে সে দিন হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। মৈত্র বংশের কেহ কখন পিতৃত্ব লাভের পূর্ব্বে স্ত্রীর সঙ্গে দিবাভাগে সাক্ষাৎ করেন নাই।—কোকন হইতে এই চিরন্তন প্রথা উঠিতে চলিল, ইহা কি সহিবে? কর্ত্রী ঠাকুরাণী যত কাঁদেন, তাঁর মিতিন প্রমুখ পরিচারিকারা তত এই কথারই আলোচনা করে। শেষে হরিপ্রিয়া পরামর্শ করিলেন, কাল থেকে বউমাকে নূতন বাড়ীতে রাখিয়া দিবেন, নহিলে পুরাতন অন্দরে দম্পতির দিবাদর্শন পাপ কিছুতে কাটিবে না।

দীনেন্দ্র বুঝিলেন, কুসুমের অসুখের কথার ভিতরে বিশেষ কিছু কথা আছে। কিন্তু কিছুতে তাহা ভাঙ্গিল না। দিনেরবেলায় সে ভাবে শয়ন-গৃহে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সে লজ্জায় মরিয়া গেল। দীনেন্দ্র যতক্ষণ ছিলেন, পত্নীকে কেবল চোকের জল ফেলিতে দেখিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর রোদনের স্বরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে কুসুম স্বামীকে বলিল, দিনেরবেলায় নিঃসঙ্কোচ হয়ে আসা কেবল তাহার বস্ত্র বুদ্ধির জন্য। মরণ হলে বাঁচি। ইত্যাদি। আসল কথাটা ঠিক না বুঝিলেও দীনেন্দ্র আন্দাজ করিলেন, মায়েতে আর মিতিনে এই অসুখের ভাগ মূলে বিরাজ করিতেছেন। সে সোচনা দীনেন্দ্র স্বকর্ণে একটু একটু শুনিয়াও পোষক প্রমাণের তেমন অভাব হইল না। দীনেন্দ্রনাথ অন্দর মহল ত্যাগ করিয়া গেলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাহিরে আসিয়াই দীনেন্দ্র ডোনাল্ড সাহেবের এক সুদীর্ঘ চিঠি পাইলেন। চিঠি খানির আগাগোড়া সুরবালার কথায় পূর্ণ। সাহেব দম্পতি সেই বালিকাকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানে দীক্ষিতা করিয়াছেন, বরাবর তাঁহাদের ভরসা ছিল সে দেশীয় কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হইবে। কিন্তু সে আশায় তাঁহারা নিরাশ হইতে বসিয়াছেন। এখন এমন কোন উপায় কি হইতে পারে না, যাহাতে বালিকার মন ফিরিতে পারে? মিসেস্ ডোনাল্ড বিবিধমতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন বটে, কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস দীনেন্দ্রনাথ একটু যত্ন করিলে এখনও সুফল ফলিতে পারে। এই পত্রিকার পর ডোনাল্ড নিজে হইতে একটা উত্থাপন করে এবং সে সম্বন্ধে দীনেন্দ্রের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। চিঠির শেষ ভাগটায় দীনেন্দ্রকে জলন্ত ভাষায় খুব উৎসাহিত করা হইয়াছে।

এতক্ষণ ঐ কুণ্ডলায় থাকিয়া দীনেন্দ্র সুধুই যে সুরস্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন, তাহা নহে। ধীরে ধীরে তাঁহার মনে একটা বিপ্লব দেখা দিতেছিল। গৃহিণীর কোমল সুরভিময় চরিত্র তাঁহার হৃদয় [illegible] বিতে পারিত না বটে, কিন্তু মিস্ ভর্জ্জিনিয়ার [illegible] করিয়া চলিতে হইত এবং সুরবালার প্রতি পদক্ষেপে [illegible] একটা মহত্ত্ব অনুভব করিতেন। কুসুমকে তিরস্কার করিয়া [illegible] যখন বলিতেন—"বেনিটার মত হতে পার না," তখন তাঁহার নিজেরই মনে হইত, তাঁর চেয়ে সুরবালা কত মহৎ! মিস্ ভর্জ্জিনিয়া দীনেন্দ্রকে যে মূর্ত্তিতে চিত্রিত করিয়া ডোনাল্ড

দম্পতির চক্ষের সামনে ধরিতেন, আসলে কিন্তু তিনি তাহা ছিলেন না। কিন্তু ক্রমে সে আদর্শে উঠিতে তাঁহার আন্তরিক বাসনা হইল। তার উপর সুরবালার অমায়িকভাব, বাক্যে কার্য্যে সংযমের ভাব, কি মহান্ আদর্শ! ইদানীং কুসুমমালা দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইত যে স্বামী তাহাকে "মেম" করিতে জেদ্ করেন বটে, কিন্তু আগেকার মত দুর্ব্যবহার কিছু করেন না। অধিক কি, কিছু দিন হইতে শয়ন কক্ষে মদের বোতল আসা বন্ধ হইয়াছিল।

কালেক্টর সাহেবের চিঠি পাইয়া দীনেন্দ্র অতিশয় উল্লাসিত হইলেন। রাগাও হইয়া পত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্মিতমুখে তাহা শেষ করিলেন। "বোনটীর" জীবন যাহাতে সুখী হয়, সে জন্য বিদেশী লোকেদের কত আগ্রহ, আর তিনি এতদিন কোন চেষ্টাই করেন নাই! কুসুমের সাহায্যে তিনি কি সুরোর মন ফিরাইতে পারিবেন না? অবশ্য পারিবেন। গৃহিণীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া গেল। শয়ন কক্ষের উদ্দেশে ছুটিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরবালা সচরাচর বড়তরফের [illegible] সঙ্গে রোজ তাহাদের ইস্কুল গৃহে [illegible] এবং গল্পসঙ্গের জন্য তাহাই যথেষ্ট। [illegible] উপরও প্রাতে সন্ধ্যায় তাহারা [illegible] বটে, কিন্তু ইহাতে নানা বিঘ্ন। সুরো আ[illegible] খুব আদর যত্ন করেন বটে, [illegible] পালকীতে উঠিতে না [illegible] তাহার

সেই ভয়ে কুসুমও মেমের কাছ থেকে ফিরিয়া শাশুড়ীর কাছে বড় ঘেঁষিত না। অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে হরদাসী ছোটাইমাকে তলব করিতে আসিত না।

সেই যখন কুসুমের অসুখের কথা লইয়া সেদিন সমস্ত দিন দাসীদের দ্বারা খবরাখবর লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু তিন দিনের দিন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ইস্কুলে যাইয়া একটু সকাল সকাল পড়াশুনা শেষ করিয়া সে মেমের কাছে বিদায় হইল। দীনেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষদ্বারের সম্মুখে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই সুরো বউর ঘরে দর্শন দিল। কুসুম তখনও জাঁচলে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছিল। তাহার অসংযমিত কেশপাশ তখনও ভাল করিয়া গুছান নাই। সুরো স্পর্শ করিয়াই বুঝিল, অসুখের কথাটা ভাণ মাত্র!

সুরবালার আগমনবার্ত্তা যখন কর্ত্রীঠাকুরাণীর প্রকোষ্ঠে পৌঁছিল, বধূকে নূতন বাটীতে নির্ব্বাসনের পরামর্শ তখন স্থির হইয়া গিয়াছে; তবে বিচার হইতেছিল, কালই তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, কি একটা দিন ক্ষণ দেখান কর্ত্তব্য। এমন সময়ে বিলাসী দাসী হিতিমার কানে কানে সুরবালার নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া সেই শান্তপাত রমণীসমাজে আবার উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিল। দাসীদের উচ্চ কলকণ্ঠ অকস্মাৎ ফুস্‌ফুস্ কথায় নামিয়া আসিল। রাগ এবং অভিমানের স্থলে ভয় এবং বিস্ময় আসিয়া হরিপ্রিয়া দেবীর হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিল। তাঁহার মনে হইল, মেম সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া লেপ্টেনেণ্ট সাহেব নিশ্চয়ই একটা অন্য রকমের হুকুম দিয়াছে। নতুবা বোকাই বা কেন অমন করিয়া ছাড়িবে—আর কুটুম্ব বা সঙ্গে করে আসিয়া জুটবে কেন?

সরিয়া গেলে তখন শুনাইয়া যেমন কষ্ট, কিন্তু ঠাকুরাণী দেখিতে পাইয়া বিনোদাকে দিদাইয়া দিয়া বধমাতার গর্ব দাঁড়াইয়া থাকে। বিনোদা হইতে না যাইতে নন্দা দেবী আবার তাহাকে ডাকিয়া কাছে চোক টিপিয়া অতিশয় কথার ছলে বলিলেন, "ভাই বিনোদা, আমি না যাই ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি, কেমন থাকবি বল্‌? বিনোদা একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। তার হাসির অর্থ—"ঠাকরুণ, এমন আমরা অনেক থাকি।"

ততক্ষণ কমল কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছিল এবং মুখে মেখে আর্দ্রবস্ত্রের গোছা কাড়িয়া লইয়া কাপড় দিয়া মুছাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মনের ভাব সে এইরূপ স্থির করিয়াছিল বটে, কিন্তু সুরো হাসি থামাইতে ভীরুদৃষ্টিতে তার সমস্ত দৃঢ়তা এলাইয়া যাইতে লাগিল। বিনোদা হাসি দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। এবং সে মুখে স্বয়ং মালতী ঠাকুরাণী হেসিতে হাসিতে আসিয়াছেন দেখিয়া সুরো বুঝিল, বউতে আর তাতে নির্জনে ঘরে ঢুকিয়া এবং তাহার সহচরীদের সে ইচ্ছা নাই। আর কোন মেয়ে হইলে হয়ত পলায়ন স্থির করিত, কিন্তু সুরো ইহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সুরো ইংরাজি পড়িতে শিখিয়াছিল; কুসুম তেমন বলিতে পারিত না বলা বুঝিতে পারিত। অতএব সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, ইংরাজিতে কথাবার্তা করিয়া তাহাদের নাকাল করে। কিন্তু জেঠাইমার ভুলা খুড়ানীরা মিত্তিরমার কি তাহা দেখাইবে? সুরো তাবি বজ্জা করিয়া

হোক, সুরোর মনে কোন খল কপট ছিল না। সে স্পষ্ট কথা বলিতে এখন ইতস্ততঃ করিত না। এবং এমন স্নেহকোমল ভাবে তাহা বলিত যে কেহ তাহাতে কখন মর্ম্মে আঘাত পাইত না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাহার সেই মধুর স্নেহ স্পষ্টবাদিতা সকলের উপর জয়লাভ করিল।

নিরিনমার মুখে খানিকটা গন্ধ করিয়াই সুরো হাসিয়া বলিল, "নিরিন মা জেঠাইমার কাছে একটু পরে যাস। তোর সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে। তোমার সামনে বল্‌তে পারবো না। আমাদের দুজনকে বাপু একটু একলা থাক্‌তে দিতে হয়।" এ কথায় কুসুম নিজের বুদ্ধি বলিয়া গিয়া অপরাহ্ণে উচ্চ হাস্য করিল এবং মানদা ঠাকরুণ একেবারে মাটি হইয়া গেলেন। "তা বেশ ত মা বেশত, আমি উঠে যাচ্ছি" বলিতে বলিতে ঠাকুরাণি মহাব্যস্তভাবে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বলা বাহুল্য তখন নিরিন পাইয়া সুরো একে একে কুসুমের সব কথাই শুনিল। কুসুম ভাবিয়াছিল সব কথাই গোপন করিবে, কিন্তু ঠাকুরঝির কাছে মনের সে জিনিষটে পাকে না। যা উপলব্ধি করিয়াছিল, তাই বটিল—তার মনের কথা শুনিয়া সুরো হাসিয়া গড়িয়া অস্থির হইল। কুসুম মহা অপ্রতিভ হইয়া গেল। এমন সময়ে দীনেন্দ্র আবার নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুইজনের মনের কথা কিছু কিছু শুনিয়া ফেলিলেন। তাহাদের অকৃত্রিম সখীত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। দাদাকে দেখিয়া কুসুম লজ্জায় ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল—বউ আদর অভ্যর্থনা করিলেন। "আচ্ছা বোনটী, তোমরা বস, আমি আর যাব না" বলিয়া দীনেন্দ্র বহির্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

প্রাচীন জ্যোতিষ।

(প্রথম প্রবন্ধ)

এসিয়াটিক সোসাইটীর স্থাপনকাল হইতে ইউরোপের লোকে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। আমরা আমাদের অতীতের গুণগৌরবে এত মুগ্ধ, যে সে কালে কি ছিল না ছিল অনুসন্ধানের তত প্রয়োজন দেখি না। তবে ইংরাজ লেখকের তর্জমা অথবা প্রবন্ধ হইতে দুই চারিটা বাক্য সঙ্কলন করিয়া সেই ভিত্তির উপর পদনির্ভর করিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান করিবার ক্ষমতা আমাদের প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে সংশয় নাই। কে বলে আমাদের কোপর্ণিকস্ ছিল না; কে বলে আমাদের নিউটন ছিল না।

যা হউক এ পর্য্যন্ত ইউরোপে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি কল্পান্ত পর্য্যন্ত যেখানে যাহা কিছু আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইবে, তৎসমুদয়ই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে কোন না কোন নিগূঢ় ভাবে নিহিত রহিয়াছে, ইহা এক-রকম আমাদের মধ্যে সর্ব্ববাদীসম্মত। এবং ইউরোপে বা অন্যত্র এ পর্য্যন্ত কি আবিষ্কার হইয়াছে বা হইতেছে, এবং আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের কোন অন্ধকার গুহায় কোন্ তথ্য লুক্কায়িত আছে না আছে, এ সম্বন্ধে আমাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ইহাও একরকম সর্ব্ববাদীসম্মত।

সুতরাং আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল এ সম্বন্ধে দুই চারিটা স্থূল কথা পাঠকের সমীপস্থ করিবার পূর্ব্বে মার্জ্জনা ভিক্ষা আবশ্যক। তথাপি, প্রাচীনকালের অর্জ্জিত জ্ঞান ও

প্রাচীনকালের জ্ঞানার্জ্জন পন্থার সহিত আমাদের অধুনাতন জ্ঞান ও জ্ঞানার্জ্জন পন্থার তুলনা করিলে পদে পদে গোতমীয় ভগবৎ পথ প্রদর্শকের পরিচয়ই পাওয়া যায়। এবং দীর্ঘশ্বাসের মাহিত কোথায় সে দিন, উচ্চারণ না করিয়া থাকা যায় না।

কিরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচীনেরা জ্যোতিষ্কগণের স্থিতি গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, কিরূপে অনুমান বা hypothesis নির্ম্মাণ দ্বারা তাহাদের স্থিতিগতি ব্যাখ্যার চেষ্টা করিতেন, এবং কিরূপ উৎকৃষ্ট গণিত প্রয়োগে স্থিতি গতি গণনা করিতেন, ও কিরূপেই বা গণনার সহিত পর্য্যবেক্ষিত ফলের সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস পাইতেন, তাহা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। সেকালের জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুই চারিটা স্থূল কথা বিবৃত করাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রথম পৃথিবীর আকার। বলা বাহুল্য পৃথিবীর আকার আয়তন নিরূপণ জ্যোতিষের প্রথম বিষয়।

পৃথিবীর গোলাকার অবয়ব অতি প্রাচীন কালেই স্থির হইয়াছিল গোলাকার প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি আজ কাল প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখনও ঠিক্ সেই সেই যুক্তি প্রদত্ত হইত। যথা, পৃথিবী গোল না হইলে দৃষ্টিপ্রতিষেধক নিতম্ব রেখা বা চক্রবাল রেখা (horizon) সর্ব্বত্র বৃত্তাকার হইত না, গোল না হইলে উত্তরমুখে গমন কালে উত্তরস্থ নক্ষত্রগণের ক্রমশঃ উন্নতি লক্ষিত হইত না, গোল না হইলে চন্দ্রগ্রহণকালে দৃষ্ট পৃথিবীর ছায়া বৃত্তাকার হইত না ইত্যাদি।

ভূগোলপৃষ্ঠ বিবিধ কাল্পিত রেখা দ্বারা বিভক্ত হইত। অবস্থিতি নির্দ্দেশ, দূরত্ব নির্দ্দেশ, উন্নতাংশ কালের অন্তর, দিবারাত্রি। হ্রাসবৃদ্ধি, ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য এইরূপ রেখার কল্পনা এখনও

আবশ্যক হয়, তখনও হইত। ভূগোলে সুমেরু কুমেরু দুইটি বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়া উভয়ত্র হইতে সমদূরবর্ত্তী পরিধিটি নিরক্ষবৃত্ত অভিহিত হইত। স্থানবিশেষ হইতে উত্তর দক্ষিণবর্ত্তী সুমেরু কুমেরুভেদী একটি বৃত্ত আঁকিয়া মধ্যরেখা নিরূপিত হইত। নিরক্ষবৃত্ত হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে অক্ষাংশ ও মধ্যরেখা হইতে পূর্ব্বে বা পশ্চিমে দেশান্তর, এই উভয়বিধ দূরত্ব নির্দ্ধারণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভূপৃষ্ঠে অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। বলা বাহুল্য এখনও ঠিক্ এই উপায়ে অবস্থান নির্দ্দেশ হইয়া থাকে।

সুমেরুর প্রায় ঊর্দ্ধভাগে আমরা আজ্জি কালি একটি স্থির তারা দেখিতে পাই, তাহাকে ধ্রুবতারা বলি। সম্প্রতি ধ্রুবতারা সুমেরুর প্রায় ঊর্দ্ধে, তবে ঠিক্ ঊর্দ্ধে নহে এবং চিরকাল ঐখানে নাই ও চিরকাল ঐখানে থাকিবে না। সেই জন্য আজিকালি ভূপৃষ্ঠে সুমেরুবিন্দু নিরূপণকালে একটু সাবধান হইতে হয়; ধ্রুবতারার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চলে না। সে কালে অবশ্য ধ্রুবতারা সাহায্যেই সুমেরু বিন্দু নিরূপিত হইত। অন্য সূক্ষ্মতর উপায় বর্ত্তমান ছিল না।

কুমেরু বিন্দুর ঊর্দ্ধেও একটি দক্ষিণ ধ্রুবতারা কল্পিত হইত; অবশ্য এটা কল্পনা মাত্র।

এক্ষণে আমরা জানি ভূমণ্ডল সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকার নহে, নিরক্ষপ্রদেশ সমীপে কিঞ্চিৎ স্ফীত, ও মেরুপ্রদেশে "কিঞ্চিৎ চাপা।" এই স্ফীতির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য মোটামুটি দুইটা উপায় আছে। প্রথম নিরক্ষপ্রদেশের নিকটে দশমাইল বা দশযোজন পথ উত্তরমুখে চলিলে ধ্রুবতারা যতখানি উন্নত হয়, মেরুপ্রদেশ সমীপে দশমাইল বা দশ যোজন পথ উত্তর মুখে চলিলে ধ্রুবতারা ঠিক্ ততখানি উন্নত হয় না। পৃথিবী ঠিক্ বর্ত্তুলাকার হইলে

উভয়ত্রই সমান উন্নতি ঘটিত। দ্বিতীয় নিরক্ষপ্রদেশে পেণ্ডুলম্ বা লোলকযন্ত্র একমিনিটে যতবার দোলে, মেরুপ্রদেশে পেণ্ডুলম্ তাহার অপেক্ষা কিছু বেশীবার দোলে। সেকালে পেণ্ডুলমের ব্যবহার ছিল না; এবং স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া ধ্রুবতারার উন্নতি লক্ষ্য করারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং ভূমণ্ডল বর্ত্তুলাকার বলিয়াই গৃহীত হইত। কিন্তু তাহাতে বড় আসে যায় না। কেননা সে সেকাল আর এ একাল। *

ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া ঠিক্ উত্তরদিক্ নিরূপণ করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। ঠিক্ মধ্যাহ্নকালে ভূপৃষ্ঠে একটি যষ্টি খাড়া করিয়া তাহার ছায়া দেখিলে এই দিক্ নিরূপিত হইতে পারে। তবে ঠিক্ মধ্যাহ্নকাল অথবা মধ্যাহ্নক্ষণ নিরূপণ দুর্ঘট ব্যাপার। একটি [illegible] কৌশলে এইটি নিরূপিত হইত। 'অদ্রু সংস্তব্ধ' শিলা-[illegible] যাহার পৃষ্ঠদেশ স্থির অম্বুপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল) [illegible] সমান রাখিয়া পূর্ব্বাহ্নে যে কোন সময়ে ছায়ার গায়ে গায়ে রেখা [illegible] অপরাহ্নে যখন ছায়া ঠিক্ আবার সমান দৈর্ঘ্যযুক্ত হইবে, সেই সময়ে ছায়ার শেষে আর একটি রেখা টান। এই দুই রেখার অন্তর্বর্ত্তী কোণকে জ্যামিতি শাস্ত্রোক্ত উপায়ে দ্বিখণ্ডিত

---

* কিছুদিন পূর্ব্বে "মৃগয়ী" নামক একখানি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ চতুর্দ্দিকে ঢক্কানিনাদ সহকারে বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন বালসহকারে পৃথিবীর নিরক্ষদেশের স্ফীতি জন্মিয়াছে ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃগয়ীকার সিদ্ধান্ত করেন, হিন্দু জ্যোতিষ এত জানিত যে তখন এই স্ফীতি উৎপন্ন হয় নাই। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের জন্য মৃগয়ীকারকে দোষ দিই না। কেননা, হিন্দু জ্যোতিষ সেকালের, আর মৃগয়ী গ্রন্থ একালের। শনে পাঁচ।

করিলেই মধ্যাহ্ন কালের ছায়া রেখা পাওয়া যাইবে। বলা আবশ্যক এই উপায়ে উত্তর দক্ষিণ দিক্ নির্ণয় করিলে একটু ভুল থাকে। পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন মধ্যে সূর্য্যের গতি তত্ত্বার তাহার কারণ। সুতরাং আজ কালি উত্তরদিক্ নির্ণয়ে আরও সূক্ষ্ম উপায় ব্যবহৃত হয়। * সে যাই হউক, উল্লিখিত 'অধু সংশুদ্ধ' শব্দটির গভীরার্থতা অনুধাবন করিলেই সেকালের জন্য ইতিহাস আপনা হইতে নির্গত হয়।

ভূপৃষ্ঠে কোনস্থলের অবস্থান নির্দ্দেশের জন্য সেইস্থানের অক্ষাংশ (latitude) অবধারণ আবশ্যক। প্রধানতঃ দুই উপায়ে অক্ষাংশ অবধারিত হইত। প্রথম, ক্ষিতিজরেখা বা চক্রবাল হইতে ধ্রুবতারার উন্নতি নির্ণয়। দ্বিতীয়, যে দিন দিবারাত্রি সমান হয়, সেই দিন মধ্যাহ্নে নভোমণ্ডলে ঊর্দ্ধবিন্দু হইতে যে বিন্দু [illegible] মণ্ডলের ঊর্দ্ধে রহিয়াছে, zenith) সূর্য্যমণ্ডলের অবনতি [illegible] গণ। বলা বাহুল্য, ভূগোলের নিরক্ষদেশ [illegible] করিলে, অক্ষাংশ নির্দ্ধারণের এই প্রকৃষ্ট [illegible] ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অক্ষাংশ [illegible] এই উপায়ই শিখাইয়া থাকি। উপায় প্রয়োগে [illegible] যে সকল সাবধানতা বা সংশোধন আবশ্যক, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ঊর্দ্ধবিন্দু হইতে সূর্য্যের অবনতি চক্রযন্ত্র দ্বারা [illegible] বাহির হইত। আর এক কৌশল ব্যবহৃত হইত। নির্দ্দিষ্ট [illegible] শঙ্কু

---

* গ্রন্থকার লিখিয়াছেন সম্প্রতি দুবরবীনাদি [illegible] হওয়ায় উত্তর দিক নির্ণয়ের সুবিধা হইয়াছে। [illegible] আবশ্যক নহেন। দুরবীনের বাঁটায় কোন [illegible]

প্রোথিত করিয়া তাহার ছায়ার পরিমাণের দ্বারা সূর্য্যের অবনতি গণিত হইত।*

তার পর পৃথিবীর আয়তন। অক্ষাংশ নিরূপিত হইলে পৃথিবীর পরিধি কত মাইল কি কত যোজন তাহা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। একালেও এই উপায়, সে কালেও এই উপায়। মনে কর কৃষ্ণনগর কলিকাতার ঠিক্ উত্তরে। কৃষ্ণনগরের অক্ষাংশ হইতে কলিকাতার অক্ষাংশ বাদ দিলেই উভয়ের অক্ষান্তর কত অংশ পাওয়া গেল। তার পর কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা কত মাইল মাপিয়া দেখ। সুতরাং এত অংশ অক্ষান্তরে এত মাইল ব্যবধান স্থির হইল। পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ অংশে বিভক্ত। তার পর ত্রৈরাশিক, এক অক্ষ-অংশে এত মাইল; ৩৬০ অংশে কত মাইল। পৃথিবীর পরিধি কত মাইল এইরূপে বাহির হইল। আর্য্যভট্টের গণনায় পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন; এক যোজনে চারি ক্রোশ, ও দশ ক্রোশে উনিশ মাইল, এই হিসাবে আর্য্যভট্টের মতে ভূপরিধি ২৫০৮০ মাইল। বর্ত্তমান কালের গণনায় পরিধি ২৪৯০০ মাইল।

পরিধি হইতে ব্যাস ও পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাহির হয়। ভাস্করাচার্য্য বলেন, ব্যাসকে পরিধির পরিমাণ দিয়া গুণ করিলেই পৃষ্ঠের

---

* এইরূপ গণনা ত্রিকোণমিতির বিষয়। জ্যোতিষিক গণনার জন্য সেকালে ত্রিকোণমিতির সৃষ্টি ও চর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছিল। উক্ত গণনায় একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ও কোটির পরিমাণ হইতে কোটির সম্মুখীন কোণের পরিমাণ গণিতে হয়। সম্প্রতি এইরূপ স্থলে দুইটি রেখার পরিমাণ হইতে একটি কোণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ আবশ্যক হইলে উচ্চ গণিতসম্মত বিশ্লেষণ-ক্রিয়া দ্বারা যত ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে কষা বাহির করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থে যে হিসাব দেওয়া আছে তাহাতে গণনা করিলে বেশী ভুল হয় না।

ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। ইহাতে কোন ভুল নাই। ব্যাসের সম্বন্ধ বাহির করিতে গণিতবেত্তাগণকে অনেক হইয়াছে। সম্প্রতি এই সম্বন্ধ যথেষ্ট সূক্ষ্মতার সহিত যাইতে পারে। মোটামুটি উভয়ের সম্বন্ধ ২২ : ৭ ধরা ভট্ট সেই হিসাবই ধরিয়াছেন। কেহ কেহ আরও পরিধির বর্গকে ব্যাসের বর্গের দশগুণ ধরিয়া লইয়াছে চার্য্য আরও সূক্ষ্ম ধরিয়া ৩৯২৭ : ১২৫০ ধরিয়া গণনা

নিরক্ষদেশের উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানে সমন্তরাল একটি বৃত্ত ভূপৃষ্ঠে অঙ্কিত করিলে তাহাকে ব বলে। ইহার ইংরাজি নাম parallel of latitude এ বৃত্ত হইতে যত দূরে হইবে ততই ইহার পরিমাণ কলিকাতার অক্ষাংশ, অর্থাৎ কলিকাতা নিরক্ষবৃত্ত হই উত্তরে, জানা থাকিলেই কলিকাতার স্ফুট পরিধির জানা যায়। বলা বাহুল্য এই পরিমাণের উপায় সেকা কলিকাতার কত ক্রোশ পূর্ব্বদিকে কয় দণ্ড আগে সূর্য নির্দ্ধারণের জন্য এই স্ফুট পরিধি পরিমাণের প্রয়োজন

ইংরাজেরা গ্রীণউইচ নগরমধ্য দিয়া ভূগোলে কল্পনা করেন, এবং সেই মধ্যরেখার পূর্ব্বে বা পশ্চিমে দেশান্তর বা longitude মাপিয়া থাকেন। সেক উজ্জয়িনীনগর ভেদ করিয়া কল্পিত হইয়াছিল, এবং দেশান্তর পরিমিত হইত।

তার পর পৃথিবীর গতি। আজকাল অবশ্য স্কুলে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক একনিঃশ্বাসে উল্লেখ করিবে। তবে উভয় গতির প্র করিলে উত্তর পাওয়া কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ভ

হয় যেন সমুদয় নক্ষত্রচক্র প্রত্যহ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে; পৃথিবী সেই নক্ষত্রচক্রের কেন্দ্রগত। পৃথিবী ঘুরিতেছে, নক্ষত্রচক্র স্থির আছে, কি নক্ষত্রচক্র ঘুরিতেছে ও পৃথিবী স্থির আছে, ইহা লইয়া বিতণ্ডা একালেও যেমন চলিয়াছিল, সেকালেও তেমনি চলিয়াছিল। একটা পৃথিবীকে ঘুরাইলেই যখন চলে, তখন ঐ প্রকাণ্ড নক্ষত্রচক্রটা ঘুরাইবার দরকার কি, সাধারণতঃ এইরূপ-ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা চেষ্টা হয়। ফলতঃ এই যুক্তি একরকম অকিঞ্চিৎকর; ইহাতে মীমাংসা কিছুই হয় না। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অন্য প্রবল প্রমাণ আছে; ফুকো সাহেবের উদ্ভাবিত পেণ্ডুলম্ তাহার অন্যতম। কিন্তু সেকালে, যখন বলবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন হয় নাই, তখন এ প্রমাণ প্রয়োগের অবকাশ ছিল না। [illegible] তীক্ষ্ণদৃষ্টিবলে বলিয়াছিলেন পৃথিবীই ঘুরিতেছে; [illegible] পরিবর্ত্তনস্বীকারে কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু [illegible] মত বাহাল থাকে নাই। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা [illegible] দেন নাই; তবে আর্য্যভট্টের মত অস্বীকারে [illegible] অসুবিধা হয় নাই। আর্য্যভট্টের বিরুদ্ধে যে [illegible] উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সাময়িক বাহ্যযুক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, এমন লোকও একেবারে বিরল নহে। তবে গ্যালিলিও নিউটনের পূর্ব্বে সে সকল যুক্তির ঠিক্ সঙ্গত উত্তর মিলিত তাহাও বোধ হয় না।

পৃথিবীই ঘুরুক, আর নক্ষত্রচক্রই ঘুরুক, এই আবর্ত্তনে সূর্য্যের এবং নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক উদয় অস্ত সম্পাদিত হয়। এবং সূর্য্যের উদয়াস্তেই দিবারাত্রি। দেশবিদেশে দেশান্তর অর্থাৎ মধ্যরেখা হইতে দূরত্ব অনুসারে স্থানীয় কালের যে তারতম্য হয়, তাহা যোগবিয়োগে গণিত হইলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

নক্ষত্রেরও উদয় অস্ত আছে এবং সূর্য্য ও গ্রহগণেরও উদয় অস্ত আছে। কিন্তু এই উভয় জাতীয় জ্যোতিষ্কের উদয় অস্ত বিষয়ে বড়ই তফাৎ আছে। নক্ষত্র মাত্রই ঠিক্ এক সময়ে ফের পাক ঘুরিয়া আসে। কিন্তু সূর্য্যের এক পাক ঘুরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হয়। আজ সকালে যদি দেখিয়া থাকি কোন একটি নক্ষত্র ও সূর্য্য ঠিক্ এক সঙ্গে উদিত হইল, কাল দেখা যাইবে সেই নক্ষত্রটি একটু আগে উঠিল, সূর্য্য যেন একটু পিছাইয়া গিয়া একটু পরে উঠিল। ক্রমে সূর্য্য প্রত্যহই একটু একটু করিয়া পিছাইয়া সংবৎসরে সমগ্র নক্ষত্রচক্রটাই পিছাইয়া যায়। আজ যে নক্ষত্রের নিকট সূর্য্যকে দেখিয়াছিলাম, সেই নক্ষত্র হইতে সূর্য্য প্রত্যহ একটু একটু পূর্ব্বে সরিয়া আবার একবৎসর পরে সমগ্র নক্ষত্রচক্রটা ঘুরিয়া ঠিক্ সেই নক্ষত্রের নিকট উপস্থিত হয়, ও পুনরায় পিছাইতে থাকে। বলে নক্ষত্রচক্রও প্রত্যহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতেছে, সূর্য্যও সেই সঙ্গে ঘুরিতেছে; তবে সূর্য্য নক্ষত্রের সমান বেগে না গিয়া একটু একটু পূর্ব্বাভিমুখে [illegible] যেন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে [illegible] উপরে একটি পীপিঁড়া যেন অস্তমুখে ধীরে ধীরে [illegible]

সূর্য্যের গতি এই রকম। বুধ শুক্রাদি [illegible] গোলমেলে। ইহারাও প্রত্যহ নক্ষত্রচক্রের [illegible] ঘুরে, [illegible] অল্প অল্পঃ পিছাইয়া যায়। সূর্য্য পিছায় বটে, কিন্তু [illegible] সমান পরিমাণেই পিছায়, গ্রহগুলির পক্ষে [illegible] না। ইহারা কেহ বা খুব দ্রুত গতিতে পিছু হটে, কেহ [illegible] গতিতে পিছু হটে। বুধ শুক্র খুব দ্রুত চলে; বৃহস্পতি [illegible] ধীরে চলে। সূর্য্যের সমদৃশ নক্ষত্রচক্র ঘুরিতে [illegible] লাগে, কিন্তু বৃহস্পতি প্রায় বার সংবৎসরে নক্ষত্রচক্র

শুধু তাহাই নহে, বুধ ও শুক্র, নক্ষত্রচক্রে স্বতন্ত্র ভাবে চলে বটে, কিন্তু সূর্য্যকে ছাড়িয়া অধিক দূর যায় না; যেন কোনরূপে সূর্য্যে বাঁধা আছে। অন্য গ্রহগুলির পক্ষে তাহা নয়, কিন্তু ইহারা আবার পূর্ব্বমুখে পিছাইতে পিছাইতে দুই চারি দিনের জন্য আবার পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়। এবং পূর্ব্বমুখে চলিতেছিল, চলিতে চলিতে যেন অকস্মাৎ কিছুকালের জন্য অস্তমুখ হইল।

সুতরাং গ্রহগণের গতি অতি জটিল ও বিচিত্র। গ্রহগণের অবস্থিতি ও গতি গণনাই যখন জ্যোতিষ শাস্ত্রের মুখ্যতম উদ্দেশ্য, তখন এই জটিলতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফল বাহির করিতে পারিলেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা সার্থক হইত।

সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে একদিন সহসা এই জটিলতার আবরণ মুক্ত হয়; এই দুর্গম গহনপথ পরিষ্কৃত হয়, অন্ধকার আলোকিত হয়। মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসে সেই দিন চিরস্মরণীয় হইবে; এবং যে ব্যক্তি শুভ্র আলোকবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া সেই নিবিড় তিমির ভেদ করেন, তিনি চিরজীবী হইবেন। ইহার নাম নিকলাস্ কোপর্ণিকস্।

যদি ধরা যায় নক্ষত্রচক্র স্থির আছে এবং সূর্য্য স্থির আছে, এবং বুধ শুক্র, পরে পৃথিবী, ও পরে মঙ্গলাদি সূর্য্যকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছে তাহা হইলে গ্রহগণের আকাশ-ভ্রমণের যত কিছু জটিলতা সমুদয় একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, এবং কোন্ গ্রহ কোন্ সময় কোন্ স্থানে থাকিবে গণনা অতি সহজেরও আয়ত্ত হইয়া উঠে। কোপর্ণিকস্ পৃথিবীর ও গ্রহগণের এই সূর্য্যকেন্দ্রক গতির আবিষ্কর্ত্তা। তাহার পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

আমাদের আর্য্যভট্ট পৃথিবীর দৈনিক গতির আবিষ্কার করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর পার্শ্বস্থ গ্রহক্ষেত্রের গতির সম্বন্ধে তিনি কিছু করিয়াছিলেন এমন শুনিতে পাওয়া যায় না।

এই পর্য্যন্ত বলা বাহুল্য পূর্ব্বে এদেশে যে প্রণালীতে গ্রহগণের অবস্থিতি গণিত হইত, তাহা টলেমীর জ্যোতিষসংঘেও যেরূপ সুস্পষ্টভাবে কল সিকান্তিত হইত, তাহাতে বিলক্ষণ বাহাদুরি ও ওস্তাদি আছে। সেই বাহাদুরি ও ওস্তাদি দেখিলে একদিকে বিস্ময় নিবারণ করা যায় না, অপর দিকে যখন দেখা যায়, তাহার অসীম পরিশ্রমে আক্রান্ত অধ্যবসায়ে বনভঙ্গ ভাঙিয়া পাতিত কাটিয়া নিরস্ত্র পদস্খলন এড়াইয়া বিপুল বিক্রমে দুর্গম শৈলশৃঙ্গের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কেবল আর একটা লাফ দিতে পারিলেই শৈলশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল বায়ুস্তর মধ্য দিয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিরেখাবর্ত্তী ও আলোকিত দেখিতে সমর্থ হইতেন, তখন আর পরিতাপের ইয়ত্তা থাকে না।

সেকালে কিরূপ গ্রহগণের অবস্থিতি নির্ণীত হইত দুই একটি দৃষ্টান্তস্থল দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মনে কর বুধগ্রহ। পূর্ব্বে বলিয়াছি সূর্য্য পূর্ব্বমুখে এক বৎসরে অর্থাৎ প্রায় তিনশ নব্বই দিনে একবার নক্ষত্র চক্র ঘুরিয়া আসে। বুধগ্রহ ঠিক নক্ষত্র চক্রে ঘুরে না। বুধগ্রহ একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে প্রায় ৮৮ দিনে এক পাক ঘুরিয়া থাকে। আর সেই নির্দ্দিষ্ট বিন্দুটি যেন স্থির না থাকিয়া সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, অর্থাৎ ৩৬৫। দিনে নক্ষত্র-চক্রে এক পাক ঘুরিয়া আসে। সেই বিন্দুটি এক বৎসরে [illegible] ঘুরিতেছে, আর বুধগ্রহ সেই বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া ৮৮ দিনে একবার সেই বিন্দুটি প্রদক্ষিণ করিতেছে। আজ আমরা যেমন মনে করি চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, [illegible] চন্দ্রকে লইয়া সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিক সেইরূপ। [illegible]

বুধগ্রহ অমুক স্থানে আছে, দশ দিন পরে কোথায় থাকিবে গণনা বড়ই সহজ হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে স্থির কর, সেই বিন্দুটি দশ দিনে কতদূর যাইবে। এক বৎসরে যদি যায় ৩৬০ ডিগ্রী, দশ দিনে যাবে কত ডিগ্রী এইরূপ হিসাব। তার পর, বুধগ্রহ দশ দিনে বিন্দুর পার্শ্বে কতটুকু ঘুরিয়া স্থির কর। ৮৮দিনে ঘুরে সমগ্র এক-পাক, দশ দিনে ঘুরিবে কতটুকু। প্রথমে বিন্দুটিকে দশ দিনের মত দূরে সরাইয়া দাও, পরে গ্রহটিকে বিন্দুটির পাশে দশদিনের মত একটুকু ঘুরাইয়া দাও। এইরূপেই বুধের স্থান পাওয়া গেল।

এইরূপে অন্য অন্য গ্রহেরও স্থান নির্দ্দেশ চলে। মনে কর বৃহস্পতি। বৃহস্পতি প্রায় ৪৩৩৩ দিনে অর্থাৎ কিছু কম বার বৎসরে, একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরে। কিন্তু সেই বিন্দুটি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ৩৬৫।০ দিনে নক্ষত্রচক্রে ঘুরিয়া থাকে।

কবে গ্রহমাত্রই এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিধারে নির্দ্দিষ্ট কালে কেহ মন্দগতিতে অল্প কালে, কেহ দ্রুতগতিতে অধিক কালে, (বুধ ৮৮ দিনে, ও বৃহস্পতি প্রায় বার বৎসরে) ঘুরিতেছে, আর সেই বিন্দুগুলি যেন সূর্য্যে কোন রকমে সংলগ্ন থাকিয়া সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক এক বৎসরে নক্ষত্রচক্রে পূর্ব্বমুখে ভ্রমণ করিতেছে।

এইরূপে হিসাব করিলে গণনাও সহজ হয়, এবং গণিত ফলও প্রত্যক্ষের সহিত বেশ মিলে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এইরূপ প্রণালীতে গ্রহস্ফুটগণনা হইত, এবং এখনও দৈবজ্ঞ মহোদয়েরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নির্ব্বিকার চিত্তে এইরূপ প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপে টলেমি * এই প্রণালীমত গণনার উদ্ভাবনা করেন।

---

* প্রকৃত পক্ষে এই প্রণালী কত প্রাচীন নির্ণয় করা দুষ্কর। টলেমি ইহা সংস্কৃত ও বিবিধদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র।

এবং এই উদ্ভাবনাই জ্যোতির্বিদ্যাকে বিজ্ঞানপদে উন্নীত করে, এবং উদ্ভাবককেও অমরত্ব করে।

গ্রহ মাত্রই নির্দ্দিষ্ট কালে এক একটি বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিতেছে, এবং সেই বিন্দু গুলি যেন সূর্য্য কোনরূপে বাধা আছে বা সংলগ্ন আছে, তাই সূর্য্য ঘুরিলেই সকল তাহাদিগকেও টানিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। এইখানে কল্পনাকে একটু জাগাইয়া যদি মনে কর যায়, বিন্দু গুলি সূর্য্যে আবদ্ধ থাকার দরকার কি, সূর্য্যই সেই বিন্দু হউক না; তাহা হইলে কি দাঁড়ায়? না, গ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে সূর্য্যকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিতেছে, এবং সূর্য্য তাহাদিগের সকলকে লইয়া পৃথিবীকে কেন্দ্রগত করিয়া নক্ষত্রচক্রে ঘুরিতেছে। আর একটা কথা, সূর্য্য পৃথিবীকে পূর্ব্বমুখে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিলে যা, পৃথিবী সূর্য্যকে পূর্ব্বমুখে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলাও তাই। তাৎপর্য্য অন্যান্য গ্রহ যেমন, পৃথিবীও তেমনি, নির্দ্দিষ্ট কালে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতেছে। অর্থাৎ কি না, সূর্য্যই স্থির, আর পৃথিবীটাও ঘোরে না। ইহার উপর প্রতিদিন এক পাক করিয়া আর্য্য-দর্শন কথাভক্ত পৃথিবীর অবয়বটা বুলাইয়া দিলেই আর কিছু বাকি থাকে না। যাহা জটিল ছিল তাহা সরল হয়, যাহা দুর্ব্বোধ্য ছিল তাহা সুবোধ্য হয়, যাহা আঁধার ছিল তাহা আলো হয়। কেবল এই প্রণালীর উদ্ভাবনের দরকার, কেবল একটা লাফের দরকার। কোপর্নিকস্ লোকে কোন পদ্ধতিতে এই লাফটা দিতে বিস্মৃত হইয়া ছিল। কোপর্নিকস্ এই লাফ দিয়াছিলেন তাই কোপর্নিকসের জয়।

পুরাতন মতে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি ইহারা তিনটি সূর্য্যসংলগ্ন বিন্দু প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই বিন্দু তিনটির নাম বৃহস্পতি-শীঘ্র ও শুক্র-শীঘ্র ও শনি-শীঘ্র। এখন আমরা দেখিতেছি, ইহারা তিনটি পৃথক্ বিন্দু নহে, ইহারা সূর্য্য স্বয়ং। বুধ ও শুক্র যে দুই বিন্দু প্রদক্ষি-

তবে তাহাদের নাম বুধমধ্য ও শুক্র যে দুই বিন্দু প্রদক্ষিণ করে তাহাদের নাম বুধমধ্য ও শুক্রমধ্য; এখন দেখা যাইতেছে, ইহারাও আর কিছু নহে; সূর্য্য স্বয়ং। নামকরণকালে এক পক্ষে নীচ ও অন্যপক্ষে মধ্য কেন হইল, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন।

এই বৃহস্পতিশীঘ্রাদি এবং বুধ মধ্যাদির ভ্রমণ বলিতে গ্রহগণের নিজের সেই সেই বিন্দুর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, আমরা হাল হিসাবে তাহা সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেকালে নির্দ্ধারিত গ্রহগণের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ (অর্থাৎ সূর্য্য প্রদক্ষিণ) কালের সহিত অধুনাতন কালে নানাবিধ যন্ত্রাদি যোগে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারিত সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালের তুলনার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল। পাঠকগণ সেকালের ও একালের পর্য্যবেক্ষণ তুলনা করিবেন।

গ্রহ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুযায়ী ভগণ কাল			পাশ্চাত্যমতে (Lockyer) ভগণ কাল।		
	দিন	দণ্ড	পল	দিন	দণ্ড	পল
বুধ	৮৭	৫৮	১০	৮৭	৫৮	...
শুক্র	২২৪	৪১	৫৫	২২৪	৪২	...
পৃথিবী	৩৬৫	১৫	৩২	৩৬৫	১৫	১২
মঙ্গল	৬৮৬	৫৯	৫১	৬৮৬	৬৮	৫৬
বৃহস্পতি	৪৩৩২	১৯	১৬	৪৩৩২	৩৫	৫
শনি	১০৭৬৫	৪৬	২	১০৭৫৯	১৩	১০

অন্যান্যগ্রহের গতির সহিত আমাদের তত সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পৃথিবীর গতির, অথবা প্রাচীন কালের হিসাবে সূর্য্যের গতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই গতির সম্বন্ধে আরও কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সূর্য্য নক্ষত্রচক্রে পূর্ব্বমুখে খানিকটা করিয়া পিছাইয়া যায়। দিনে সেই এক অংশ করিয়া চলে। তবে প্রত্যহ সমান চলে না। কখন একটু দ্রুত, কখন একটু ধীরে চলে। বরাবর সমান বেগে চলিলে সময়ের কোন গোলযোগ ঘটিত না। কিন্তু এই কখন একটু ধীরে কখন একটু দ্রুত চলায় গণনায় কঠিনতা আইসে।

এই ব্যতিক্রম দুই কারণে ঘটে। প্রথম সূর্য্যের পথ ঠিক নিরক্ষবৃত্তের সহিত এক সমতলে বর্ত্তমান নাই। অর্থাৎ সূর্য্য সংবৎসর কাল নিরক্ষ বৃত্তের উপরে থাকে না। একটু পাশ কাটিয়া কখন একটু উত্তরে সরে, কখন একটু দক্ষিণে আসে, বৎসরে দুইবার মাত্র ঠিক নিরক্ষবৃত্তের উপরে আইসে। একবার চৈত্রমাসে একবার আশ্বিনে। চৈত্রের পর ক্রমে উত্তরে গিয়া ২৩॥ অংশ পর্য্যন্ত উত্তরগামী হয়, আশ্বিনের পর ক্রমে দক্ষিণে গিয়া ক্রমে ২৩॥ অংশ পর্য্যন্ত দক্ষিণগামী হয়। শাস্ত্রের ভাষায় রবিমার্গ বিষুব রেখাকে ২৩॥০ অংশ (সূক্ষ্ম হিসাবে ২৩ অংশ ২৮ মিনিট) কোণ রাখিয়া দুই ভাগের ছেদ করিয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষে ২৩॥০ অংশকে ২৪ অংশ ধরা রীতি আছে। অতি প্রাচীন কালে এই ২৪ অংশ ক্রান্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সেটুকু ভুল এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইহা বোধ করি কখন সংশোধিত হয় নাই। এই ক্রান্তির পরিমাণ আবার চিরকাল ঠিক্ সমান থাকে না। কোন্ সময়ে ২৪ অংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল না জানিলে কতটুকু পর্য্যবেক্ষণের দোষে, আর কতটুকু ক্রান্তি হ্রাস কারণে, এই আধ অংশ তফাত দাঁড়াইয়াছে, বলা যায় না হইয়া পড়ে।

---

* ৯৫৩০ সংবৎসর পূর্ব্বে এই ক্রান্তি ২৪ অংশের কাছাকাছি ছিল। আরও কয়েক বৎসর পরে ইহা প্রায় ২১ অংশে দাঁড়াইবে। শুনা যায় প্রাচীন মিসরের রাজা ক্যাম্বিসিস্ দেশের লোক এই ক্রান্তি হ্রাস করিয়াছিল।

বলা বাহুল্য সূর্য্যের এই উত্তর দক্ষিণ গতির কারণে, অর্থাৎ এই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বশে ঋতু পরিবর্ত্তন ও দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। সুমেরু কুমেরু হইতে ২৩½° অংশ দূরত্ব পর্য্যন্ত সমস্থলে সমস্থানে একদিন ঘটে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্য অস্তই হয় না, অথবা সূর্য্যোদয়ই হয় না। কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে দিবা রাত্রির পরিমাণ কত হইবে, তাহা সেকালে নিরূপিত হইত। মেরুস্থলে ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত্রি কেবল আমরাই জানি তাহা নহে।

সূর্য্যের গতির অনিয়মের আর একটি কারণ আছে। সূর্য্যের পথ (আজ কাল বলিব, পৃথিবীর পথ) ঠিক্ বৃত্তাকার নহে। কেপলার প্রথমে দেখাইয়াছিলেন এই পথ বৃত্তাভাস ক্ষেত্রাকার। বৃত্তাভাসের ইংরাজি নাম ellipse। পথের আকার এইরূপ হওয়ায় সূর্য্য সংবৎসর সমান দূরে থাকে না; কখন একটু বেশী দূরে থাকে ও ধীরে চলে, কখন একটু কম দূরে থাকে ও দ্রুত চলে। সম্প্রতি পৌষের সাঝামাঝি সূর্য্য অন্য সময়ের চেয়ে নিকটে থাকে, ও আষাঢ়ের সাঝামাঝি অন্য সময়ের চেয়ে দূরে থাকে। শীতকালে সূর্য্য দ্রুত চলে ও গ্রীষ্ম কালে সূর্য্য ধীরে চলে, এই কারণে বৎসরের মধ্যে শীতার্দ্ধটা এখন ছোট, ও গ্রীষ্মার্দ্ধটা এখন বড়।

এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যাইবে ইংরাজি মতে পঞ্জিকা গণনা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন মতের গণনা অধিক যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসঙ্গত। প্রথম কথা, বৎসর প্রায় ৩৬৫¼ দিনে, কিন্তু বারো হইয়া সকলকেই ৩৬৫ দিনে ব্যবহারিক বৎসর ধরিতে হয়। এজন্য যে ভুল ঘটে ইংরাজি পঞ্জিকায় তাহার চারি বৎসর অন্তর ও চারিশত বৎসর অন্তর সংশোধিত হইয়া থাকে। আমাদের পঞ্জিকায় বৎসর বৎসর সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের

ব্যবস্থা আছে। দিনীয় ইংরাজি বার মাসের দিনসংখ্যার যে আঁটা-আঁটি নিয়ম আছে, তাহাতে ব্যবহারে কিছু সুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যুক্তি কিছুই নাই। আমাদের পঞ্জিকা মতে মাসের দিন সংখ্যা ঠিক্ সূর্য্যের গতিবেগানুসারে নির্দ্ধারিত হয়। গ্রীষ্মকালে মাসগুলা বড় হয়, কেন না সূর্য্য তখন ধীরে চলে, শীতকালে ছোট হয়, কেন না তখন দ্রুত চলে। এই জন্যেই সূর্য্যের উত্তর দেশ ভ্রমণে (১০ই চৈত্র হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত) ১৮৬ দিন, দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে (১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত) ১৭৮ দিন মাত্র অতিবাহিত হয়।

পথ বৃত্তাভাস, এবং পৃথিবী ঠিক্ সেই পথের মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নহে, একটু পাশ চাপিয়া রহিয়াছে। এই জন্যই উল্লিখিত গোলযোগ। সে কালে সূর্য্যের পথ ঠিক্ বৃত্তাভাস বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বৃত্তাভাসের তত্ত্ব তখন পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সূর্য্যের এই অনিয়ত গতি গণনার জন্য একটু কারিকরির দরকার হইত। দুইটি বিন্দু খুব কাছাকাছি গ্রহণ করিয়া সেই বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া ঠিক্ সমান দুইটি বৃত্ত টান। পৃথিবী একটি বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত, এবং সূর্য্য দ্বিতীয় বৃত্তে ভ্রমণশীল এইরূপ ধরিয়া লইলে, সূর্য্যের বেগের হ্রাস বৃদ্ধি বেশ বুঝা যায়। পৃথিবী-কেন্দ্রক ক্ষেত্রটিকে বৃত্ত, ও রবিমার্গ ক্ষেত্রটিকে প্রতিবৃত্ত বলা যায়। কেন্দ্র দুইটির দূরত্ব যদি অধিক না হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রতিবৃত্ত কল্পনা করিলে বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ বেশী ভফাত দাঁড়ায় না।

এইরূপ প্রতিবৃত্ত কল্পনা করিয়া যে প্রণালীতে সূর্য্যের অবস্থিতি গণনা হইত, সেই প্রণালী আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জ্যোতিষে বর্ত্তমান আছে। তাহার মৌলিক পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। প্রণালীটির বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধে দেওয়া যায় না। গণনার জন্য প্রতিপদে ত্রিকোণমিতির সাহায্য আবশ্যক, এবং উপরে বলিয়াছি, এই কার্য্যসাধনের জন্য সেকালে ত্রিকোণমিতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

সূর্য্যের গতির সম্বন্ধে আর একটি কথা। রবিমার্গ ঠিক্ বৃত্তাকার নহে, অর্থাৎ পৃথিবী সকল সময়ে সূর্য্য হইতে সমান দূরে থাকে না। রবিমার্গের যে স্থানটি পৃথিবী হইতে সব চেয়ে দূরবর্ত্তী,

সেই স্থানের নাম মন্দোচ্চ। আর রবিমার্গ যে স্থলে ১০ই চৈত্র তারিখে বিষুব রেখাকে ছেদ করে সেই স্থানের নাম ক্রান্তিপাত। এই মন্দোচ্চ ও ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয় আকাশে একত্র স্থির নাই, ক্রান্তিপাতটা ক্রমশঃ পশ্চিমে একটু একটু সরিয়া যাইতেছে। এবং মন্দোচ্চ স্থানটাও ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে একটু একটু সরিয়া যাইতেছে। ইহাদের গতি এত ধীরে, যে বহুকালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত এই গতি ধরা পড়ে না। বাস্তবিকই সৌর জগতের অন্যান্য গতির তুলনায় ইহারা একরকম আধুনিক কালেই ধরা পড়িয়াছে বলিতে হইবে। ক্রান্তিপাত বৎসর বৎসর কিঞ্চিদধিক ৫০ বিকলা হিসাবে পশ্চিমে যায়। অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ হাজার বৎসরে সূর্য্যের চক্রটা ঘুরিয়া আইসে। সূর্য্য চলে পূর্ব্ব মুখে, আর ক্রান্তিপাত ধীরে চলে পশ্চিমমুখে! ফলে এই দাঁড়ায়, সূর্য্য ক্রান্তিপাত হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া পুরাপুরি এক পাক ঘুরিবার একটু পূর্ব্বেই ক্রান্তিপাতকে আবার দেখিতে ও ধরিতে পায়। ক্রান্তিপাতের এই গতিটুকু না থাকিলে সূর্য্য সংবৎসরে পুরা একপাক ঘুরিয়া ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইত। আমরা সূর্য্যের পুরাপুরি একপাক ঘুরিবার সময়কে এক বৎসর ধরি। ইংরাজেরা সূর্য্যের ক্রান্তিপাত হইতে গতি আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে উপস্থিতির সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর ধরে। সেই জন্যে আমাদের বৎসরের চেয়ে ইংরাজি পঞ্জিকার বৎসর একটু ছোট। ইহাতে দোষ বা ভুল কোন পক্ষেরই নাই। তবে আমাদের একটু অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদের পঞ্জিকা গণনা যখন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সূর্য্য বৎসরারম্ভে ১লা বৈশাখ তারিখেই ক্রান্তিপাতে ছিল; এই কয়েক শ বৎসরে ক্রান্তিপাত এতটা সরিয়া গিয়াছে, যে এক্ষণে ১লা বৈশাখের প্রায় বিশ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে সূর্য্য ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হয়; আগে ১লা বৈশাখ দিবা-রাত্রি সমান হইত; এখন ক্রমে পিছাইতে পিছাইতে ১০ই চৈত্র দিবারাত্রি সমান হইতেছে। আমরা যদি এই বড় বৎসর অবলম্বন করিয়া থাকি, ইংরাজদের মত ছোট বৎসর না করি, তবে কালে পৌষ মাসে দিবারাত্রি সমান হইবে, ও মাঘে বৈশাখী গ্রীষ্মের [illegible] নাম

অয়ন চলন। অয়ন চলন এদেশে অতি প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃত পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা; আমাদের পঞ্জিকায় ৫৫ বিকলা ধরে। ৫ বিকলার তফাত, সামান্য বটে। আবার সামান্য নহেও। কিরূপে এতটা তফাত ঘটিয়াছে পরে বুঝা যাইবে।

কিন্তু এই অয়ন চলন গতি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীনদের একটি বড় বিষম ভ্রমাত্মক ধারণা ছিল। এখন আমরা নিঃসংশয়ে জানি, যে ক্রান্তিপাত প্রতি বর্ষে একটু একটু চলিয়া প্রায় ২৫০০০ বৎসরে একচক্র ঘুরিয়া আসে। সেকালের পণ্ডিতদের অধিকাংশের ধারণা ছিল, ক্রান্তিপাতের গতি যেন পেণ্ডুলমের মত। পশ্চিমে চলিতে চলিতে কিয়দ্দূর চলিয়া (কাহারও মতে ২৭ অংশ, কাহারও মতে ২৪ অংশ মাত্র) পূর্ব্বমুখে ফিরে, আবার পূর্ব্বে সেই পর্য্যন্ত যাইয়া আবার পশ্চিমে ফিরে। একটি স্থির বিন্দুর পশ্চিমে ২৭ অংশ (বা ২৪ অংশ) ও পূর্ব্বে ২৭ অংশ (বা ২৪ অংশ) এই প্রদেশ টুকু মধ্যেই ক্রান্তিপাত পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে; একবারে এক-মুখে চলিয়া একচক্র ঘুরে না। ভাস্করাচার্য্য ও আরও দুই একজন এই মতের প্রতিবাদ করিয়া ক্রান্তির চক্রভ্রমণই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিউটনের পূর্ব্বে বহু শতাব্দীর পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন এই উভয় মতের মীমাংসার উপায় ছিল না। নিউটনের পর মীমাংসার উপায় হইয়াছে। আমাদের পঞ্জিকায় আজ পর্য্যন্ত সেই ভ্রমাত্মক মত গৃহীত হইয়া আসিতেছে; ইহার সংশোধন না হইলে কালে বড়ই বিভ্রাট হইবে। দেড়শ দুইশ বৎসর পূর্ব্বেও জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া গণনাপ্রণালী সংশোধনে সাহসী হইতেন। আজ কাল আমাদের ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত ডিগ্রিপুঞ্জ উপলক্ষিত ডিগ্রিপুঞ্জ সে সাহস ও সে ভরসা দেয় না। হায় সে কাল!

অনেকের হয়ত ধারণা আছে, ধ্রুবতারা চিরকালই ধ্রুবতারা আছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। অয়ন চলনের হেতু ধ্রুবতারা কিছু দিন পূর্ব্বে ধ্রুবতারা ছিল না, সুমেরু হইতে দূরবর্ত্তী ছিল, এবং বহুদিন সে ধ্রুবতারা থাকিবে না, সুমেরু হইতে অনেক দূরে যাইবে।

সাধনা।

মেঘ ও রৌদ্র।

পূর্ব্বদিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র এবং খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্বপ্রায় আউষ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তীর্ণ শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়া-প্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশ-রঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল, তখন নিম্নে সংসার রঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জান্‌লা দিয়া দেখা যাইতেছে একটি বৃদ্ধা পুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণেক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে

গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গবাক্ষদেশে জানলার সম্মুখ দিয়া বারম্বার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল ভিতরে যে মানুষটি তত্ত্বপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—এবং কোন মতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নীরব অনুজ্ঞাভরে জানাইয়া রাখিতে চাহে যে, অনুমতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল পুরুষটি চক্ষে কম দেখে না, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত, সুতরাং অনেক ক্ষণ নিষ্ফল মনোযোগের পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্ত্তে কালো জামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা বড়ই দুরূহ।

তখন ক্ষণে ক্ষণে দুই চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাষ্ঠের দরজার উপর ঠন্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নীরবতাভাবে অঞ্চল হইতে দশন-যোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টাসহকারে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া আসিয়া হাসামুখে ডাকিল—খিবিবালা!

খিবিবালা অঞ্চলের মধ্যে জাম পরীক্ষা-যোগ্য দুই একটি বাছিয়া মৃদুগমনে আপনমনে এক এক খাইয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবা পুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না, যে, কোন একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমাবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবা পুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কি জানি, সে কথা কিতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না। তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কি অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে;—শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্ণের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায় পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে, এ বেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কি বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্ ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোন মতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। তাহার বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে সকাল বেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকাল বেলায় তাহার কোনটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখে তক্তপোষের উপরে রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোন একটা অনির্দ্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে একটি একটি জাম নির্ব্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো একটা আঁঠি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি, গায়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে? ধরা দিতে আসিয়াছে এই কথাটা ধরা দিয়া বালিকা যখন ক্রমশঃ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মত এবেলাও বালিকা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেষ্টা করিল—কিন্তু কাঁদিল না। যুবক

স্তব্ধবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহু সঞ্চালনে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে নৌকারোহীদের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, মধ্যাহ্নে এই দুটি শ্রেণীর খেলাও তেমনি সামান্য তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা বলিয়া কিছু তাহার মত দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি সখীভাবাপন্ন মনুষ্যের একটি অর্থহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীর মুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে, সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়ই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এ বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে—কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া দেয়, কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক এক দিন সে যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক একদিন তাহার সমস্ত মুগ্ধ শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য্য হইলে সে কাঠিন্য

অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহ-ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইস্কুল চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্য চর্চ্চা করিত কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোন বিষয় নাই। কারণ গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্য বিকশিত এম্, বিএল। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পত্তনীদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবী পদগ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবী। সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম, এ পাশ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোন কর্ম্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য মনে করিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতার জনসমুদ্রের মধ্যে আপন মনে একলা থাকা খোলা পাখি কিন্তু পরিপ্রাণে সেটা বিশেষ স্পর্দ্ধার মত দেখিতে হয়।

শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্রটিকে গল্পীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন, উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ কলহ করিতে সম্মত ছিলেন না, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহঙ্কার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি দোতলার ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন—যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই ত ছিল তাঁহার কাজ—বিষয় কি করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্ব্বেই আভাসে বলা গিয়াছে মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগ্নীটিকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করিত পৃথিবীর আকার কিরূপ, কোন দিন বা প্রশ্ন করিত সূর্য্য বড় না পৃথিবী বড়, সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত "ইস্, আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ

নিরুত্তর হইয়া যাইত। বিদ্যায় আর কোন প্রকার তাহার নিকট অগ্রসর হইতে হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড় ইচ্ছা করিত সেও দাদাদের মত বই লইয়া পড়ে। কোন দিন সে আপন মনে বসিয়া কোন একটা বই খুলিয়া বিড়বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোট ছোট অপরিচিত অক্ষরগুলি কি যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ল্যাজ ঝাঁকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোন প্রশ্নের কোনই উত্তর করিত না। কথামালার বাঘ শৃগাল অশ্বগর্দ্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট প্রকাশ করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মত নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। সেতারের গলাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোট বসিবার ঘরটিতে খুবক একাকী তক্তপোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত; গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই অত্যন্ত গাঢ়-নিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত; বইয়ের সংখ্যা গুণিয়া মনে মনে স্থির করিত শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্বান। তদপেক্ষা বিস্ময়-জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা হইতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষ

পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে এবিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এই জন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত উল্টাইত সে স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া তাহার আদেশ অবধি নিবারণ করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়ময় বালিকাটি ক্রমশঃ শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝকঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল—গিরিবালা ছবি দেখ্‌বি আয়। গিরি-বালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্ব্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গবাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষ-ণের অধ্যয়ন কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন্ ঘনিষ্ঠ-তর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাষ্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড় বড় কাব্য তর্জ্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কি বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভাল লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝার মিশাইয়া আপন বাল্য-হৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে

মাঝে এক একটা অত্যন্ত অসংলগ্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখন কখন অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে যাও উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো বিঘ্ন বাধা দিত না—বড়-বড় কাব্য সম্বন্ধে এই অতি ক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত গল্পীর মধ্যে এই গিরি-বালাই তাহার একমাত্র সমভাব বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথমে পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাঙ্গলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই চারিটা বহি পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লিগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম্ এ, বি, এলের নিকট মকদ্দমা সামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত; এম্ এ বি এল্ তাহাতে বড় একটা মনোযোগ করিত না, এবং আইন-বিষয়ে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমন ভাবে বহুদিন দুষের কাটিল।

মহকুমার একটি অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দরখাস্তে নালিশ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া যত থাকে শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হর-

কুমারকে এমন খুটি দুই চারি কথা বলিলেন, যাহা তাহার কিছু-মাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এদিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন, তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খেতায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে, এমন কি, সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাহার বাড়ি বাটিতে আগুন লাগাইয়া দিবে এমন সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কনষ্টেবল্ খান্‌সামা কুকুর ঘোড়া মহিষ মেথর সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্ত্তী শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে সশঙ্কিত কৌতূহল সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য শিবে খরচ লিখিয়া সাহেবের মূর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ যোগাইতে লাগিলেন। জয়েণ্ট সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রিম চিন্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে

চার সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুগ্রহবশতঃ সেটা তাঁহার সহ্য হইল না।—মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিও দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণ-জনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞা-পূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কি সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব লোকের সহজেই অসহ্য তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে ধৈর্য্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপ্‌রাসিকে আদেশ করিলেন—বোলাও নায়েব কো।

নায়েব কম্পান্বিত কলেবরে দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চ কণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চা-রণে জিজ্ঞাসা করিলেন—টুমি কি কারণবশটো আমার মেঠরকে ডূর করিয়াছে?

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করযোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্দ্ধা কখনই তাঁহাতে সম্ভবে না; তবে কিনা কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি

প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে পাঠানো হইয়াছে? এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে?

যদুকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নায়েব লোকগুলি সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিল। সাহেব নায়েবকে ভাণ্ডুজে বাঁধিয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল ঘৃত সংগ্রহের জন্য যেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথা মিথ্যা এবং যেবর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সংশয় রহিল না। তখন জয়েন্ট সাহেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া যেবরকে ডাকিয়া কহিলেন, এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া। যেবর আর কোন বিলম্ব না করিয়া তদ্দিকের লোকদিগের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কৃষ্ণকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুষড়িয়া পড়িয়া রহিলেন।

জমীদারী কার্য্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল। তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল কিন্তু কালিকাপ্রসন্ন ঘোষাল যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তেমন ধাত্রি তাহার নিকট হইলে [illegible]

---

* [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক [illegible] বহুপূর্ব্বে এই গল্প লিখিত হইয়াছে। বেন সাহেবের সঙ্গদয় ব্যবহার [illegible] ঘটনার সহিত তাঁহার নামের [illegible] ব্যক্তির বিরুদ্ধে [illegible] নহে।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। শশিভূষণ কহিলেন, সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা করিতে হইবে, আমি তোমার উকীল হইয়া লড়িব।

কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নামে মকদ্দমা করিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন—শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন—কহিলেন, বাপু শুনিলাম তুমি স্বকার্য্যে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ সে ত কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মত একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস রক্ষা থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার সহিত অমিয়া উঠাকে প্রাইভেট্ কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, শশিবাবু, এ মকদ্দমাটা গোপনে মিটিয়া গেলিলে ভাল হয় নাকি?

শশিভূষণ উপস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর দৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া

কহিলেন, আমার মহেশকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কি করিয়া।

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন এই স্বল্পভাষী লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, আচ্ছা বাবু, দেখা যাউক, কতদূর কি হয়।

এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মকদ্দমার দিন স্থিরতা মফস্বল ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এদিকে জয়েন্ট সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি তুমি ইহার সুবিচার প্রতিকার করিবে।

জমিদার ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, সাহেবের মেথর যখন চাবিসের পি. চি. তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না? তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত?

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি হইত না; নতশিরে অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, আমার এই মন্দ ভাই এমন দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।

জমিদার কহিলেন, তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল?

হরকুমার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না, ঐ আমাদের গ্রামের কালী, তাহার কোথাও কোন মকদ্দমা ছোটে না, সে পোড়া নিতান্ত জোর করিয়া গ্রাম আমার মতামত না লইয়াই এই হাঙ্গাম বাধাইয়া বসিয়াছে।

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। মুন্সিফ লোকটা অর্দ্ধার্য নহে উল্লেখ, কোন ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে তলব করিয়া দিলেন মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোট বড় দুই ম্যাজিষ্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিছু ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া একটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ, কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজ্ঞাতশ্মশ্রু অর্দ্ধাচীন উকীল তাঁহাকে এবং প্রকার না জানাইয়াই এইরূপ স্পর্দ্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন রাগের মাথায় নায়েব বাবুকে "ডণ্ড বিচনে" করিয়া তিনি "ডুং খিট্" আছেন। সাহেব বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায়-বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা বাপ্ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন কখনও বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা বাপের দুঃখের কোন কারণ নাই।

মজিপুর জয়েণ্ট সাহেবের সমস্ত ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হবকুমপুর সবডিবিসনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার মুখে শশিভূষণের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, আমিও আশ্চর্য্য হইতে ছিলাম যে, নায়েব মহাশয় বরাবর ভাল লোক বলিয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্ব্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিট্‌মাট্ না করিয়া হঠাৎ মকদ্দমা আনিবেন একি সম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।

অবশেষে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। সাহেব অম্লানবদনে বলিলেন না।

সাহেব তাঁহার সাহেবী বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা চাকচক্য বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেণ্টের সহিত পিটিসিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ ব্যস্তসমস্তভাবে চতুর্দ্দিকে অবসর অন্বেষণ করিতেছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র উপদ্রবকারীকে একেবারে দমন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত দুর্ব্বল গবর্মেণ্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেস্‌ নামক অশিষ্টজনের নাম ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারে বড় বড় ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গর্জ্জিয়া উঠিতে থাকে তখন ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিভাবে জগতের উপর আপনদাবী নিবেদন করিতে ছাড়ে না।

শশীভূষণ যখন এই ম্যাজিষ্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া দিবে, রাত্র, যখন বিপুল পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতার শান দিতেছেন, কল্পনার সাক্ষীকে জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ও প্রকাণ্ড আদালতের দোকানদারী ব্যাপার এবং তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপী পর্য্যায়গুলি মনে আনিয়া দিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাহার স্ত্রী ক্ষান্তমণি তাহার নিকট প্রেম ভালবাসা ও মণীবিচিত্র শিখিবার খাতা, বাগান হইতে তখন তখন ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোন দিন আচার, কোন দিন সন্দেশের সিঠাই, কোন দিন পাতায় মোড়া কৈফিয়ৎ-বিহীন

হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া নিবারণের সাহায্যে তাহার ঘাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইত।

তাহার নিবারণ দেখিল শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড মোটা পুঁথি খুলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে পাত উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে সকল গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার মধ্য হইতে কোন না কোন অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ পুঁথিখানা কোনো মতেই পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার মত কি একটা কথা ছিল না? তা না থাক্, তাই বলিয়া ঐ বই যা কি এতই বড়, আর গিরিবালা কি এতই ছোট?

প্রথমটা, ওরূপ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সুর করিয়া নাম করিয়া বেণীসমেত দেহের উত্তরার্দ্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিৎ কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মত করিয়া দেখিতে লাগিল। ওই বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মত আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোন চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কোমলত্বের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে সকল অসঙ্গত অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পৃথিবীর লোকেরও শুনাইবার কোন আবশ্যক দেখি না।

তখন বার্ষিকপরীক্ষার বালিকা দুই একদিন চারুপাঠহস্তে গুরুগৃহে

গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য পথে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্ত্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিল, দেখিল শশিভূষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে অনভিজ্ঞ, গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস্, সিসিরো, বার্ক, শেরিডন্ প্রভৃতি বাগ্মীগণ বাক্যবলে যে সকল অসামান্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; যেরূপ শব্দভেদী শরবর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহঙ্কারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন আজিকার দোকানদারীর দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্ব্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎ সমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চ্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সে দিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না; সে দিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না; পূর্ব্বে একবার জামের আঁঠি ধরা পড়িয়া অবধি ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছিল। এমন কি, শশিভূষণ যদি কোন দিন নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিত, "গিরি, আজ জাম নেই," সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সরোষে "যাঃ ও" বলিয়া তর্জ্জন করিয়া পলায়নের উদ্যম করিত। জামের আঁঠির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন

করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"স্বর্ণ, ভাই, তুই বাস্‌নে, আমি এখনি যাচ্চি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন, যে, কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোন দূরবর্ত্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট! কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে, শুনিতে পান নাই, তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক—এবং যে দিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না—যান তিনিও সে দিন কোন কোন হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁঠির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্ততঃ পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু, স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হৌক, তাহাকে "এখনি যাচ্চি" আশা দিয়া অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোন দূরস্থিতা সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত,

গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না, তখন আপনার শ্রেষ্ঠতম শ্রীণতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আপনটুকু এবং মিথিলাদত্ত চারুপাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি সে কোনমতে ফিরাইয়া দিতে পারিত, তবে বোধ হয় পাবিত্যক্তা জ্ঞানের আঁঠির মত সে সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সযত্নে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল দ্বিতীয় বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই সে সমস্ত পড়া ভুলিয়া যাইবে—তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনটিরই উত্তর দিতে পারিবে না। একটি, একটিরও না; তখন! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে!

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবল মাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল; আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা গ্রামের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে। উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণের আইন সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতা-চর্চ্চা কি কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে একদমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেব সুবাদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল; সে একটি অন্ধকার কোণে নির্ব্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃতভাবে ধূলিস্তর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়!

শশিভূষণ যে দিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে এই কয় দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না, তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা সূঁচ সুতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল—বেলা হইয়া আসিল গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের পড়া শেষ হইল না।

গিরিবালা মাঝাটা তক্তপোষের উপর মাদিয়া মানভাবে চলিয়া গেল। দেখিয়া, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্ত্তী পথে দাঁড়াইয়া দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত, অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে। সেও ত আজ কিছু দিন হইল। গিরিবালার অভিমান ত এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতভাগ্যের মত দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাতুর দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পথ স্থির হইয়াছে।

গিরি যে দিন চাকপাঠের দ্বিপ্রহরে গ্রামের পথিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যূষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকালী তোষকের উপর হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?" গিরি কহিল "দাদার বাড়ি।" হরকালী ধমক দিয়া কহিলেন, "সেখানে যাওয়া হবে না, যাবে না।" এই বলিয়া আসন্ন-ঝটিকা

গৃহবাসে বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন; সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আসন্নসত্ত্ব, কেয়াখয়ের এবং জাবকনেবু ভাঁড়ারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং মাথাখাওয়া পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কালোজামে তরুতলা প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আর নাই!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যে দিন সানাই বাজিতেছিল সে দিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশিকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশি তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশির মুখে চখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র বাস্তবিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার অপমান বৃত্তান্ত ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সঙ্কোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশিকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মত লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল।

একদিন সকাল বেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইটার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশি নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষচূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল, এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া-নির্ম্মিত মায়ামরীচিকার মত অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেই জন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

ষ্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্য্যন্ত একটি নূতন ট্রামলাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই ষ্টীমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অল্প সংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতেও কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছু দূর হইতে এই ষ্টীমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পাশে ধরি ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পাশে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশঃ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্য্যন্ত

তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে ফুলিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবলা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। এক স্থানে ষ্টীমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা ষ্টীমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ষ্টীমারকে হাত দুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে পাল কাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, ষ্টীমার নদীর বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এরূপ করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজ চরিত্রের মর্ম্মগত ভাব আমরা বাঙ্গালী হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। সত দিশী পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়ত একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়ত, এই গর্ব্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল কৌতুকের হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুণ সে কোনরূপ শাস্তির দায়িক নহে—এবং কারণ ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবতঃ প্রাণ সংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল

তখন শশিভূষণের পাল্কী ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া বন্ধনের জন্য যন্ত্রণা পাইতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী প্রবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ছুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি—সে একটা বৃহৎ জটিল যন্ত্রের মত; তৌল করিয়া যে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্ব্বিকার ভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজহস্তে তাহার শাস্তিবিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন, আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় ব্যগ্র বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কি উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় নীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশি গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকার পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল নৌকা ত মজিয়াছে এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমতঃ পুলিশকে দর্শনি দিতে হইবে, তাহার পর কাজকর্ম্ম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে আদালতে ঘুরিতে হইবে, তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কি বিপাকে পড়িতে হইবে ও কি ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকীল, আদালত-খরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় জিতিতে খেষারাৎ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা ষ্টীমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্‌ঘট্ এবং জলের কল্‌কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন।

সাক্ষীর কোন আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল তাহাদেরই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। ষ্টীমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই নদীর বাঁকের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিষ আছে, যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক "ডার্টি র‍্যাগ্" অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর শিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেহারীলাল পালাস্ দাইয়া মাঝের নলের চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন; যে লোকটা নৌকার মধ্যে বসিয়া শিশিতেছিল, নস মাখিল তমাকে তাহার সন্দেহ ভাঙ্গায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন।

যে দিন ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন নৌকা সাজাইয়া ঝিনি-বালককে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মত একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল, যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন মতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না, যে, তাহার ঘর অতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখা একটা পাখিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে মুহূর্ত্তেই মান পাখিল মনের আবেগ ইহুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, তবে নৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, সে সকল কোলাহল হইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে ঐহার স্বপ্নরাজ্যের মাঝখানে আলোড়িত তুলিল, শশিভূষণ চক্ষু খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই ঘাসের উপর

সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন। "শশিদাদা!"—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণ পুনরায় জিনিষপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোন কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেই জন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষার বাঙ্গলা দেশের চারিদিকেই ছোট বড় আঁকা বাঁকা সহস্র জলময় জল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই সমস্ত সঙ্কীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাঙ্গলা দেশের তরুমূলবর্ত্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কন বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে বৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে

লাগিল। বন্যার সময়ে গরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পরিল সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাঙ্গলা দেশ আপনার কর্দ্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িত ভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্য্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা হস্তে ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে। অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহানার মত জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার নিজেরও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সে দিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলের একটা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল এক পার্শ্বে নৌকা চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সে জন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিস্ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের আগমন হই-

রাছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব্ব হইতে পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র কোন্ দিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিস সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই জেলে চারটে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাহার মাল্লাদিগকে, জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কনষ্টেবল্ পলায়ন জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধী বলিয়া যোড়-হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিস্ বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চড়্‌কা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চটচট করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "আমি জেলেদের লাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।"

পুলিসের বড় কর্ত্তা তাহাকে হিন্দিভাষায় কটু বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্ত্তে বিনা উচ্চ ডাঙ্গা হইতে

বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মত গলার মল মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কি হইল তিনি জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন, তখন—বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়—যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণের বাপ উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইয়া প্রথমতঃ শশিকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার যোগাড় চলিতে লাগিল।

যে সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগণার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখন কখন শশির নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশি তাহাদিগকে সাক্ষ্য মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে? এমনতর অনেক প্রাণ কাহার শরীরে আছে? যাহা লোকসান হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষ্যের সময় বরাবর! এ কি মুস্কিল! সকলে বলিল, "ঠাকুর, তুমি ত আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে।"

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম শশিভূষণ বাবু?—তিনি কহিলেন হাঁ।—সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।—তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?—সে কহিল, আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।

পথিকদের কৌতূহল দৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোন দিকে ত চলিতে হইবে—না হয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক্।

সে দিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। পথের প্রান্তবর্ত্তী বর্ষার জলপ্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়াছিল এবং তাহার অদূরবর্ত্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব, ভিক্ষুক ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস!

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত, বঁধুহে ফিরে এস!

গাড়ি আসিয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠুর ফিরে এস হে আমার করুণ কোমল এস! ওগো সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না,—

আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস,
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস!
আমার চির বাঞ্ছিত এস, আমার চিতসঞ্চিত এস,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস!
আমার মুখের হাসিতে এস হে আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এস!
আমার সর্ব্বময়নে এস আমার সর্ব্বভরমে এস—
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভূষণের গান থামিল।

তিনি কোন প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দ্দেশ ক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন সে ঘরের চারিদিকেই বড় বড় কাচের আলমারীতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজান। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার

অনাবিচ্ছিন্ন বন্ধনচিহ্ন সিংহাসনের মত তাঁহার সিংহাসনে প্রতিভাত হয়।

তেবিলের উপরেও একটি অতুল্য পুঁথি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার মধ্যে একটি লইয়া খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন, একখানি বিদীর্ঘ শ্লেট, তাহার উপরে গুটিকতক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় পাঁজি এবং একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত।

শ্লেটের শীর্ষদেশের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালী দিয়া মস্ত মোটা করিয়া লেখা—শিবিবালা দেবী। খাতা ও বহিগুলির প্রত্যেকটি এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষে যেন মুক্ত প্রবাহ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন। সেখানে কি চক্ষে পড়িল? সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষে সেই ক্ষুদ্র ঘর, সেই ক্ষুদ্রতর গ্রাম্যপথ, সেই দূরে-কাপড়-শুকাইবার ছোট মাঠ—এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

যে দিনগুলি সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অস্বাভাবিক নহে। নিত্য সেই দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যায়, এবং তাহার নিত্যের অধ্যয়ন-কার্য্যের মধ্যে একটি বালিকা সহধর্ম্মিণী-কার্য্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রাম-প্রান্তের সেই নির্জ্জন দিনগুলির, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি, সমস্তই এখন স্বর্গের মত দেখা দিল। দুঃখ এবং অসন্তোষের অতীতকালে যেন আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণতার সোনালি মেঘে বিরাজ করিতে লাগিল। সে দিনকার সেই নবীন লতা এবং সেই আজিকার এই বর্ষামান প্রভাতের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে মৃদুস্মৃতি সেই বীণাতন্ত্রের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া এক অনির্বচনীয় সঙ্গীতময় জ্যোতি-

শ্মর অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত কর্দ্দমাক্ত সঙ্কীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমান-মলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতা-বিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য্য অপরূপ, অতি গভীর, অতি বেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মত তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্ত্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল, এবং মনে হইল যেন সেই পল্লি-বালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রূপার থালায় ফলমূল মিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইবা যখন শীর্ণ মুখ ম্লানবর্ণ ভগ্নশরীর শশি-ভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল—তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না, নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল—কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিষ্ফলভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্ত্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—

এস এস হে!

ফরাসী ও ইংরাজ।

ফিলিপ গিলবর্ট হ্যামার্টন সাহেব, "ফরাসী ও ইংরাজ" এই নামে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্ঞান ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার রীতিনীতি, বল বিক্রম প্রভৃতি সকল বিষয়ে এই দুই জাতির মধ্যে কি ভেদাভেদ তাহা নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ভিন্ন জাতির আচারব্যবহার প্রভৃতি নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায্যভাবে কিরূপে সমালোচনা করিতে হয়, এই গ্রন্থখানি তাহার আদর্শস্থল। ফরাসী ও ইংরাজ পরস্পরের চির-শত্রু। উহাদের মধ্যে কুকুর বিড়ালের সম্বন্ধ। কেহ কাহারও খুঁৎ পাইলে ছাড়িয়া কথা কহে না—এমন কি, অন্যায় করিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। এরূপ স্থলে, ঔদার্য্য ও অপক্ষপাতিতা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থকার ইংরাজ হইয়াও ফরাসীদিগের হাট-হদ্দ সমস্তই জানেন। শুধু পারী নগর নহে—ফ্রান্সের মফস্বল বিভাগেও ইনি ভ্রমণ করিয়াছেন ও মফস্বলবাসী ফরাসীদিগের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পড়িলে, ফরাসী ও ইংরাজ এই উভয় জাতিরই প্রকৃত চরিত্র অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেন; "আমার মনে হয়, ভিন্ন দেশ সম্বন্ধে মন্দ কথা বলায় প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পায় না। পরন্তু, স্বদেশের শুভসাধন চেষ্টাতেই প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশের কাজ নানা প্রকারে করা যাইতে পারে। লেখকের

---

* French and English—A comparison.
—By Philip Gilbert Hamerton.

মুখ বাজে—সত্য কথা বলা ;—স্বদেশীয় লোকেরা প্রতারিত হইতে লাগিলেও উহাদিগকে প্রতারিত না করা। সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে, সেখের লোকের মনে ভ্রান্ত সংস্কার উৎপাদন করিয়া স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।'

তিন ব্যক্তিদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব-স্থাপন সম্বন্ধে ও কারের এই-রূপ মত:—'ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন বিষয়ে আমার বড় বিশ্বাস নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কখনই দৃঢ় বন্ধুতা স্থাপিত হইবে না। যদি কখন ক্ষণিক অনুরাগ পরস্পরের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবল আমার এই ভয় হয়, পাছে পরে আবার একটা বিপরিবার্য্য প্রতিক্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি এইমাত্র কল্পনা করি ও বাস্তবিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি যে, যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইবার চেষ্টা করে ও পরস্পরের বিষয় ন্যায্যরূপে বিচার করে। ইহাই কেবল সম্ভব ও সাধ্য।"

কিন্তু সুবিচার ও ন্যায়পরতার আশ্রয় লইলে সাহিত্যে বড় চটক্ লাগানো যায় না, আমি একথা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমি জানি, সুবিচার করিবার চেষ্টা না করিলে আমি ইহা অপেক্ষা চটকদার গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম। ন্যায্য লেখার আস্বাদ বড় নাই, কিন্তু কুৎসা ও পরনিন্দা করিলে লোকের খুব ভাল লাগে। সাহিত্য লেখকেরা একথা বিলক্ষণ জানেন, ঘৃণা ও রাগের ভাণ করিলে লেখায় চটক্ লাগানো যায়—কিন্তু ন্যায়ের অনুসরণ করিতে গেলে সে কাজে ব্যাঘাত জন্মে। একটা চোখালো পদবিন্যাস করিয়া এক কলমের ঘায়ে সমস্ত জাতিকে উড়াইয়া দিতে কেমন মজা! নীতি-গর্ব্বিত লেখক যখন তিন কোটি মানবের কুচরিত্র লইয়া আস্ফোট প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ধারণ করিতে হয়। তিন কোটি লোক অপেক্ষা আমি ভাল—

আমি উদ্ধৃত এই গর্ব্বভাব লেখক হইতে পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়। স্বাবলম্বনতা এই সময়ে আসিয়া বলে—"কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম-স্থল আছে, সে গুলিতে বাদ দেওয়া ভাল হয় না"। ইহার প্রত্যুত্তরে চটক্‌দার সাহিত্য বলেন,—'তাহা হইতে পারে, কিন্তু এই সকল ব্যতিক্রমের জন্য থামিতে গেলে, লেখার ফলাও-ভাব কমিয়া যায়—লেখায় তেমন জোর পৌঁছে না। বাজে সত্যের খাতিরে সুলেখাকে জলাঞ্জলি দেওয়া যাইতে পারে না।"

গ্রন্থকার বলেন, প্রতীয়মান বৈসাদৃশ্যের মধ্যে কতটা প্রকৃত সৌসাদৃশ্য আছে তাহা প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভিন্ন জাতীয় লোকেরা কেবল যে নামের দ্বারা আপনাদিগকে প্রতারিত করে এরূপ নহে, প্রতারিত হইতেই তাহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা—তাহারা আপনাকে প্রতারিত হইতে চাহে না। তাহার দৃষ্টান্ত, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে 'রাজতন্ত্র' ও 'সাধারণ তন্ত্র' এই দুই পদের ভ্রান্তিজনক ব্যবহার। পার্থক্য দেখাইবার হিসাবে যখন বলা হয়, ইংলণ্ড রাজতন্ত্রশাসিত দেশ ও ফ্রান্স সাধারণতন্ত্রশাসিত দেশ, তখন অন্ধ ব্যক্তীত কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ, নামত, কথাটা ঠিক্ কিন্তু আসলে ঠিক নহে। আসল কথা, মূলে উভয়েরই শাসনতন্ত্র এক ধরণের। উভয়েরই শাসনতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই ব্যবস্থাপক সভাই সর্ব্ব-প্রধান—একটি মন্ত্রী-সভা সেই ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী—এবং সেই ব্যবস্থাপক সভার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত অধিক সংখ্যক লোকের মতের উপর নির্ভর করে। উভয় দেশেরই ব্যবস্থাপক সভা প্রায় সমানভাবের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। প্রভেদ এই মাত্র, ফরাসী-দেশে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সার্ব্বজনিক—পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে ইহা প্রায়-সার্ব্বজনিক। সকল শাসন-প্রণালীই রাজ্যশাসনের সাময়িক ও ক্ষণিক উপায় মাত্র। কোন

জাতির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী যে শাসন-প্রণালী, তাহাই সেই জাতির পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী। যদি কোন দেশ যেমনটি আছে তেমনি থাকে—বাহিরের লোক আসিয়া তাহাতে হস্তার্পণ না করে, তবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাহার উপযোগী শাসনপ্রণালী আপনা-আপনি গঠিত হইয়া উঠে। যেমন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়,সেই সঙ্গে শাসনপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। এ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। গ্রন্থকার বলেন,"আমার বিশ্বাস, অধুনা, ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশে পার্লেমেণ্টীয় শাসনতন্ত্রই একমাত্র প্রণালী যাহা সম্ভাব্য ও সুসাধ্য। এ বিষয়ে আমার কোন মোহান্ধতা নাই কিম্বা অপরিমিত উৎসাহও নাই। এই পার্লেমেণ্টীয় প্রণালী এত অসম্পূর্ণ যে, ইংলণ্ডে ইহা অতি ঢিমা চালে ও অপরিপাটী ভাবে চলিতেছে—ফ্রান্সে তো এক এক সময় একেবারে অচল হইয়া পড়ে। যদি পার্লেমেণ্ট সভায় দুই দল থাকে, ছিদ্রান্বেষণে যাহার বাগ্মিতা বেশি সেই দলই প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু যদি তিন দল থাকে তবে মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্ট লোকের তেমন ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না এবং ফরাসী পার্লেমেণ্ট দেখিলে আদৌ ভক্তির উদ্রেক হয় না। তথাপি আমরা পার্লেমেণ্টের পক্ষপাতী। পার্লেমেণ্ট সভায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা হয় এই জন্য নহে—আমরা এই জন্য পক্ষপাতী যে, এই প্রণালীর দ্বারা সভার বাহিরে সার্ব্বজনিক স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। এই বিষয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের মধ্যে প্রভেদ এই, ফ্রান্সে পার্লেমেণ্ট সভার সভ্য হইতে হইলে, সাধারণ-তন্ত্রী না হইলে চলে না—কেন না সেখানকার আপামর সাধারণ-নির্ব্বাচন-প্রণালীর সহিত রাজতন্ত্র আদবে মিশ খায় না। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার গুণে,

তাঁহার প্রধানা পার্লেমেণ্ট-ওয়ালা হইয়াও রাজভক্ত হইতে পারে।"

জাতীয়তা রক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন :—
"ইংলণ্ডে বিশুদ্ধ জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে, ছাঁকা অজ্ঞতার আশ্রয় লইতে হয়। একজন ইংরাজ চাষা, ছাঁকা ইংরাজ হইতে পারে; কিন্তু কোন ইংরাজ ভদ্রসন্তান, যে ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষা করে সে আংশিকভাবে লাটিন জাতিতে ও আংশিকভাবে গ্রীক জাতিতে পরিণত হয়; পারিও, যদি সে ভাল করিয়া ফরাসী বলিতে পারে, তবে সে কতকটা ফরাসী জাতিতেও পরিণত হয়। যদি বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাব রক্ষা করিতে চাও, তবে শিক্ষার বিষয় হইতে ইংরাজি ছাড়া আর সব শিক্ষা বাদ দেও। এমন কি, তাহা হইলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সৌখীন শিল্পকেও তাহা হইতে বাদ দিতে হয়। কেন না, উহার অধিকাংশ বৈদেশিক বিদ্যের দ্বারা গঠিত—উহা বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলে ক্রমাগত বৈদেশিক গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল হইতে কোন জাতি বিশেষ-ভাবাপন্ন হইতে পারে না—উহাতে সমস্ত সভ্য জগতের অধিকার আছে। যেমন, আইজাক্ নিউটন্ বেকন, রেবেকা বলিয়াছিল, ইংলণ্ড সমস্ত জগৎ নহে। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমাগত তাঁহাদের গ্রন্থে বৈদেশিক প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের লেখা হইতে উদ্ধৃত করেন। ইংরাজ চিত্রকর ও সঙ্গীতবেত্তারা আপনার য়ুরোপ [illegible] লালিত-পালিত। কিন্তু যদিও একজন [illegible] শিক্ষা চীনের বিদ্যালয় অসম্ভব, [illegible] লোকের সহবাসিনী হওয়া-প্রযুক্ত কেবলই [illegible] এক প্রদেশে বাস করা সম্ভবিত; তথাপি [illegible] অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত ইংরাজের

মনে বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাব এখনও যথেষ্টমাত্রায় বর্ত্তমান। বিদেশী ভাষা জানা আছে বলিয়া যাহাকে 'অর্দ্ধ-বিদেশী' বলা যায়, সে বস্তুতঃ হয় তো সে তাহার স্বদেশীয় অপেক্ষা বেশি ইংরাজ। একজন ধনী লোকের বিদেশী সম্পত্তি থাকিলেও দেশের সম্পত্তিও তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশী অপেক্ষা বেশি থাকিতে পারে। স্বদেশবাৎসল্য সম্বন্ধেও একথা খাটে; এমন অনেক ইংরাজ আছে যাহারা ইটালী দেশকে খুব ভালবাসে—অথচ ইংলণ্ডকে এতটা ভালবাসে যে, তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারা ইংলণ্ডের বাহিরে এক পদও অগ্রসর হয় নাই।"

গ্রন্থকার ফরাসী ও ইংরাজের ব্যায়াম-শিক্ষা সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলেন;—ইংলণ্ডে সাধারণের মধ্যে জিমন্যাষ্টিক ব্যায়ামের ততটা আদর নাই—পক্ষান্তরে, ফ্রান্সে জিমন্যাষ্টিকের চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে। ইংরাজের নিতান্তমত ব্যায়াম শিকার—মাঠে ময়দানে ছুটাছুটি করিয়া ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা—নৌকায় চড়িয়া দাঁড় টানা—এই সকল ব্যায়ামে ইংরাজেরা বেশি অনুরক্ত। পক্ষান্তরে ফ্রান্সে ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার চলন নাই—এমন কি, লন্-টেনিস্ খেলা, গোড়ায় ফরাসীদেশের খেলা হইলেও, বেশি ব্যয়সাধ্য বলিয়া ফরাসী দেশে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ফরাসীরা পূর্ব্বে নৌকায় দাঁড়টানা হীন কাজ বলিয়া মনে করিত! এখন নৌকার বাচ-খেলা, কতকটা আরম্ভ হইয়াছে। ফরাসীদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ এখনও প্রচলিত থাকায় অনেকেই ভদ্রলোকের খেলা শিখা করে। এই তলোয়ার খেলায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চটুলতা বর্দ্ধিত হয়। এখন ফ্রান্সে জিমন্যাষ্টিক ও সমরোপযোগী অস্ত্র-চালনার শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। এখনকার সামরিক নিয়মানুসারে, প্রত্যেক পূর্ণ-বয়স্ক ফরাসীকে সৈন্যদলভুক্ত হইতে হয়। ইংলণ্ডে এরূপ এই

উপকার হইয়াছে, সকলকেই বাধ্য হইয়া ব্যায়ামশিক্ষা করিতে হয়।

গ্রন্থকার বলেন, ১৮৩০ খৃঃ হইতে ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত ফরাসীরা শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল মস্তিষ্কের চালনা করিত। এমন কি, একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে এখনও দেখিতে পাইবে, কোন কোন বয়স্ক ফরাসী চট্‌পট্ নৌকায় উঠিতে পারিতেছে না—গাড়ি হইতে নামিবার সময় খুব সাবধানে নামিতেছে—হয় তো জীবনে সে ঘোড়ায় কখন চড়ে নাই। কিন্তু এখনকার নব্য দলের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার ফরাসী যুবকেরা খুব উদ্যমশীল ও চট্‌পটে।—আজকাল জিম্‌ন্যাষ্টিক শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্তরণ ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে বেশি প্রচলিত। ইংরাজদিগের অপেক্ষা ফরাসীরা বেঁটে। কিন্তু ফরাসীদিগের শরীর পেশী-বহুল ও মজবুৎ—কতকটা বর্ম্মা টাটুর মত।

জ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, ইংলণ্ডে গ্রীক ভাষার ও ফরাসীদেশে ল্যাটিন ভাষার বেশি আদর। ল্যাটিন না জানিলে ফরাসীরা কাহাকেও শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করে না। ইংলণ্ডে গ্রীক ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই সাধারণতঃ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে। আজকাল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যে ল্যাটিন গ্রীক্ শিক্ষা করে তাহা অতি ভাসা-ভাসা—সে শিক্ষায় প্রকৃত পাণ্ডিত্য জন্মে না। প্রত্যেক ছাত্রকে নির্ব্বিশেষে ল্যাটিন গ্রীক না শিখাইয়া, যোগ্যতা বুঝিয়া কতকগুলি বাছা-বাছা ছাত্রকে ল্যাটিন গ্রীক শিখাইলে বেশি কাজ হয়। তবে, ল্যাটিন গ্রীক শিক্ষাতে কতকটা মানসিক ব্যায়ামের ফল হয়। মসিও ফ্রারি বলেন, ল্যাটিন গ্রীক যাহারা শিক্ষা

করে তাহারা অন্যান্য বিষয় সহজে বুঝিতে পারে, কিন্তু যাহারা ল্যাটিন গ্রীক্ জানে না, তাহারা সেরূপ সহজে সে সব বিষয় বুঝিতে পারে না। আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা দিবার যথেষ্ট উপযুক্ত শিক্ষক ইংলণ্ডেও নাই, ফরাসীদেশেও নাই। এবং আজকাল আধুনিক ভাষা শিক্ষায় ভাগ্য বন্দখণ্ড করাসীদেশে হইতেছে।—ভাষা-পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হয় তাহাদের জন্য বিশেষ উপাধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আসল কথা, আধুনিক ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্য কিছুই বাড়িতেছে না, কেবল নভেল পড়ার বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। অতি অল্পলোকেই বিদেশীভাষা শিখিয়া উচ্চদরের গ্রন্থ পড়িবার কষ্ট স্বীকার করে। প্রকৃত সাহিত্যসেবক লোকের সংখ্যা উভয় দেশেই অল্প। বেশির ভাগ লোক কাজকর্ম্ম আমোদপ্রমোদ লইয়াই জীবন যাপন করে। ফরাসী দেশে যদি কেহ মিল্টনের নাম না জানে তাহাকে লোকে মূর্খ বলিয়া মনে করে—কিন্তু স্পেন্সরকে না জানায় মূর্খতা হয় না। সেইরূপ, কবি বায়রনের নাম না জানা অজ্ঞতার চিহ্ন কিন্তু শেলি ও কীটসের নাম না জানিলেও চলে। করাসীরা ইংলণ্ডের সাময়িক উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারদিগের বড় খবর রাখেন না। একবার ইংলণ্ডে ফরাসী একাডেমির ন্যায় একটা সাহিত্য-পরিষদ স্থাপন করিবার কথা হয়—তাহাতে রস্কিন্, আর্নল্ড্, লেকি প্রভৃতি বড় বড় লেখক সভ্য হইবেন এরূপ স্থির হয়। ফরাসীরা এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—তাহারা বলিল, যাহাদের নামও তাহারা কখন শোনে নাই, তাহারা কখন করাসী অ্যাকাডেমির অমর চারিশ জনের সমকক্ষ হইতে পারে?

আধুনিক শিক্ষায়, সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি দৃঢ়—কারণ বিজ্ঞানের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। করাসীদেশে

যাহারা কোনো জ্ঞানের শিক্ষার্থী তাহারা রীতিমত সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা পায়। কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ে সাহিত্যকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়। এরূপ বিদ্যালয়ে মনোবৃত্তিসকল তীক্ষ্ণ হইতে পারে, জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যশিক্ষার যে শিক্ষার উৎকৃষ্ট ও মনোরম অংশ বাদ পড়িয়া যায়।

সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, সঙ্গীত ও চিত্রকর্মে ফরাসীদের উৎকৃষ্ট শিক্ষক। ফরাসীদিগের শিক্ষা-প্রণালী উৎকৃষ্ট। ... শিল্পকরেরাও উদারচেতা নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। প্যারিসের চিত্র-... প্রায় বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে চিত্রবিদ্যায় ... থাকেন। প্যারী নগর চিত্রবিদ্যার প্রধান ক্ষেত্র। চিত্র-... প্যারি নগর এপর্য্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ইংরাজ চিত্রকরেরা স্বভাবের অনুকরণে বেশি করিতে গেলে বলিয়া প্রকৃত কল্পনার ব্যাঘাত হয়। ইংরাজদিগের মতে চিত্রে নীতিবোধই তাহাদের শিল্পকর্ম্মের অন্তরায়। উহাদের নৈতিক বুদ্ধির সময় নাই ... নাই। রস্কিন সাহেব, বাস্তবিকতা, ... ভক্তি প্রভৃতি নৈতিক গুণের উপর কলাবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করায় ইংরাজের নৈতিক বুদ্ধি পরিতুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে বাস্তবিক ... ব্যাঘাত হইয়াছে। ইংরাজেরা মনে করে, প্রকৃতিকে ... অনুকরণ করিলেই যথেষ্ট হইল—উহাতে চিত্রশিল্পের কোন নিজস্ব গুণপনা নাই। উহারা মনে করে, যেহেতু ... একটা গুণের মধ্যে ধৈর্য্য, চিত্রশিল্পে শ্রমসাধ্য ... প্রকৃতির অনুকরণ করা চিত্রশিল্পের ... নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধে গ্রন্থকার বলেন, নীতির কোন কথা ... বিচার করা বড় কঠিন। শিক্ষকেরা কি নিয়ম শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগের শিক্ষানবিশী জানিতে পারেন, কিন্তু সে শিক্ষায়

যতদূর চরিত্র গঠিত হইল জানা দুষ্কর। ছাত্রদিগের বয়োবৃদ্ধি হইলে তবে যদি কিছু জানা যায়। আসল কথা, নীতিশিক্ষা সকলেই দিতে পারে না। শিক্ষকের চরিত্র প্রভাবের উপর নীতি-শিক্ষা নির্ভর করে। সেরূপ প্রভাব দেবদত্ত অতি বিরল। ফরাসী-দিগের অপেক্ষা ইংরাজদিগের নীতিবোধ স্বভাবতঃ প্রখর। কোন ভীষণ অপরাধের কথা শুনিলে ইংরাজেরা শিহরিয়া উঠে—সত্য-সত্যই তাহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ফরাসিদিগের অল্প বয়সেই হৃদয়ের এই নবীনতা ও স্পর্শকাতরতা চলিয়া যায়। তাহারা মনে করে পৃথিবীর স্বাভাবিক গতিই এইরূপ—তাই কোন পাপ কার্য্যের কথা শুনিয়া উহারা চমকিত হয় না। কিন্তু ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, তাহারা নিজে নীচমনা ও পাপাসক্ত। ইহামাত্র বলা যায়, তাহারা দুনিয়াকে একটু বেশিমাত্রায় জানিয়াছে এবং অল্পবয়সেই জীবনের খারাপ দিকটা দেখিতে পাইয়াছে। নীতিশিক্ষা বিষয়ে ইংরাজদিগের আর একটা এই সুবিধা, তাঁহাদের ধর্ম্ম-সমাজের শাসন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদিগের শাসনের ন্যায় অত কড়াকড় নহে। ইংরাজ পাদ্রি-দিগের সহিত ইতর সাধারণের পার্থক্য ততটা প্রবল ও সুস্পষ্ট নহে। পক্ষান্তরে, ফরাসীদেশে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রির প্রভাব অতীব প্রবল—উঁহাদের অনুশাসন ইতর-সাধারণকে নির্ব্বিচার-চিত্তে মানিয়া চলিতে হয়। এক হিসাবে, নীতিশিক্ষা বিষয়ে এ প্রণালীতে কতকটা সুবিধাও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির যুক্তি ও বিচারের উপর নীতিশিক্ষা নির্ভর করে না, পাদ্রিদিগের উপ-দেশই যুক্তি ও প্রমাণের চরম স্থান, তাঁহার উপর আর প্রমাণ নাই—তাহাতে কোনও দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই। তবে, ছাত্রেরা অবিশ্বাসী হইলে উহাতে আরও উল্টা উৎপত্তি হইবার

সম্ভাবনা। তাহাদিগের বাধা হইয়া কপটতা ও অত্যাচার আশ্রয় করিতে হয়। [illegible] মধ্যে অনেকেই পরিবর্ত্তে ভবিষ্যদর্শী—অনেক দূরবর্ত্তী [illegible] কথা, শুধু বক্তৃতায় নীতিশিক্ষা হয় না, আর এক কথা, কি ইংলণ্ড কি ফ্রান্স্ উন্নত দেশের বাল-কেরা যখন নেগ্রো দেশের সহিত ব্যবহারে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ নীতিবিরুদ্ধ করিয়া চলেন না, দুর্ব্বল জাতিকে অকারণে আক্রমণ ও উৎপীড়ন করেন তখন বালকদিগের নীতিশিক্ষা কি [illegible] হইবে? চিন্তাশীল ইংরাজ ও ফরাসীরা বলেন, আজকাল [illegible] সর্ব্বাবয়বসম্মত নৈতিক শাসনের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এককালের মধ্যে প্রবল লোক-মত সেই শাসন-ভার গ্রহণ করিতে পারে। এখন যে সমাজ-শাসন আছে তাহা কেবল বাহ্যিক লক্ষণ লইয়া দণ্ড পুরস্কার বিতরণ করিয়া থাকে। জনসাধারণের এরূপ প্রবল মত হওয়া চাই, যাহাতে তাহার দ্বারা আত্ম-সংযম, মিতাচার, সরলতা প্রভৃতি প্রকৃত সদ্‌গুণের পোষণ ও সমাদর বর্দ্ধন হইতে পারে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত যেমন, ফরাসী-দিগের মধ্যে টাকা ধার-করা নিতান্ত লোক-সমবিরুদ্ধ। এই মতটি জনসমাজে প্রবল থাকায়, ফরাসীরা বিশেষতঃ মফস্বল-বাসী ফরাসীরা আদপে অতিব্যয়ী হয় না—আপন আপন আর্থিক অবস্থা অনুসারে সকলে সাদাসিধাভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আর এক দৃষ্টান্ত, মার্কিন জাতির [illegible], ধনী দেউলে অলস হইবে না এই মতটি জনসাধারণের মধ্যে [illegible] মূল এবং উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ-দিগের মধ্যে এই লোকমতটি [illegible] যে, সর্ব্বপ্রকার অভদ্রতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এই প্রকার [illegible] লোকমত অনেক সময়ে ধর্ম্মমতের [illegible] হিতসাধন করিয়া থাকে।

হৃদয়ের [illegible] গ্রন্থকার বলেন, জন্ মিল্ অনেক দিন

হইল দেখাইয়া দিয়াছেন, ফরাসীদিগের এক বিষয়ে সুবিধা এই, উহাদের মধ্যে সহৃদয়তার সাধনা হইয়া থাকে। হৃদয়ের ভাব ভাষায় সর্ব্বদা প্রকাশ করিবার অভ্যাস রাখিলে, সভ্যতার যে সত্য থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য, কখন কখন এই ভাব প্রকাশ মৌখিক হইয়া পড়ে, কিন্তু সাধারণতঃ উহার দ্বারা প্রকৃত হৃদয়-ভাব পরিব্যক্ত হয়। এই প্রকারে, ভাবের যেন একটা প্রাণ-বায়ু ফরাসীদিগের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে এবং তাহার দ্বারা হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি সঞ্জীব থাকে। ইংরাজেরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত চাপা—উহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ অত্যন্ত প্রবল—উহারা গাম্ভীর্য্যকে গৌরবের বিষয় মনে করে এবং কোন প্রকার কোমল ভাব প্রকাশ করিতে উহারা লজ্জা বোধ করে। এই কারণে উহাদের মধ্যে সহৃদয়তার অনুশীলন হয় না। ফরাসী দিগের মাতৃ-অনুরাগ ইংরাজদিগের নিকট হাস্যজনক বলিয়া মনে হয়—পক্ষান্তরে ফরাসীরা এই মাতৃ-অনুরাগকে হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

বাস্তবিকই কি ইংরাজদিগের কোন সহৃদয়তা নাই? না,—সহৃদয়তাকে উহারা মর্ম্মগত রাখিতে চেষ্টা করে? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। হৃদয়ের ভাব বাহিরে প্রকাশ করা উহাদের লোকাচারবিরুদ্ধ—সুতরাং সহৃদয়তার অনুশীলন পক্ষে উহাদের লোকাচার প্রতিকূল বটে। তাই বলিয়া উহাদের সহৃদয়তা একেবারে নাই এমনও বলা যায় না। কঠিন পাষাণ চীরের মধ্যে দিয়াও বারির ক্ষীণ শিরে সরসে গজাইয়া উঠে। তবে, এ কথা ঠিক, ইংরাজগণ সহৃদয়তা-বিকাশের অনুকূল স্থান নহে। কর্ত্তব্য-আচরণে যতটুকু সহৃদয়তার প্রয়োজন, ততটুকু সহৃদয়তা ইংরাজের আছে—তাহার বেশি নাই। সৌভাগ্যক্রমে

যদি কোন ইংরাজ ধনবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে ইংরাজ সমাজে প্রতিপদে অতিমাত্র প্রাপ্ত হয়। হয় তো মমতা প্রকাশ করিতে গিয়া সে দেখিতে পায়, যাহার প্রতি সে মমতা প্রকাশ করিতেছে সে কুণ্ঠিত হইয়া মমতা গ্রহণ করিতেছে কিম্বা সে যাহার নিকট মমতার প্রত্যাশী সেখানে নিরাশ হইতেছে। এরূপ স্থলে, লাভের চেয়ে কষ্টই সার। ইংরাজদিগের পারিবারিক স্নেহ মমতা অত্যন্ত কম। অনেক স্থলে দেখা যায়, পিতামাতার সহিত সন্তানদিগের ভাবের গাঢ়তা নাই—যখন তাহাদের মধ্যে দূর সম্পর্ক [illegible] জন্য, পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ হইলেও কোনও পক্ষেরই বিশেষ কষ্ট হয় না। ভ্রাতাদিগকে একত্র করিয়া দেখ—দেখিবে তাহারা যেন পর—তাহারা পরস্পর হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে—তাহাদের মধ্যে পত্রব্যবহারও নাই। একটু দূরে থাকিলে কিম্বা কার্য্যতরে ব্যাপৃত থাকিলে, আত্মীয়স্বজনের অন্ত্যেষ্টি সৎকারে যোগ দিবার পক্ষে তাহাই বিপুল বাধা বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে আর্থিক অবস্থায় ইতরবিশেষ হওয়া প্রযুক্ত নিতান্ত আত্মীয়দিগের মধ্যে পর-ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। [illegible] কোন ইংরাজ একপ কথাও বলেন যে, আত্মীয় অপেক্ষা বন্ধু থাকা ভাল—কেন না, বন্ধু নির্ব্বাচন সকলের আয়ত্তাধীন কিন্তু আত্মীয় নির্ব্বাচনে কাহারও এক্তিয়ার নাই—আত্মীয় থাকা 'বিষম জ্বালা'—'বিড়ম্বনা'। প্রবাসীদেশে, আত্মীয়স্বজনেরা যদি কোন কারণবশতঃ পার্শ্বোপবাদিতে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারে, অন্ততঃ তাহারা পরস্পরকে পত্র লেখে। নববর্ষে বন্ধুরা অন্ততঃ দুই ছত্র পরস্পরকে পত্র লিখিয়া থাকে এবং আত্মীয়েরা পরস্পরের মধ্যে 'কার্ড' বিনিময় করে। একজন বুদ্ধিমান ফরাসী, ইংরাজের নিকট একবার

এইরূপ বলিয়াছিল "—কখন কখন আমাদের পারিবারিক প্রেমে স্পষ্টতা প্রকাশ পায়, কখন কখন আমরা যাহা মুখে ব্যক্ত করি তাহা হৃদয়ে অনুভব করি না, কিন্তু মোটের উপর, আমাদের বেপরোয়া লোকাচার তাহাতে শুদ্ধ যে স্নেহমমতার বাহ্যিক আকার বজায় হয় তাহা নহে পরন্তু উহার ভাব ভাবও প্রকৃত ভালবাসার সজীব থাকে"। ইংরাজেরা সহৃদয়তাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করে—কিন্তু এ কথা নোটামুটি অসভ্য ইণ্ডীয় জাতিরই উপযুক্ত। এ বিষয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বীয় প্রজাদের সমক্ষে নিজ গার্হস্থ্য জীবনের কথা সঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া—নিজে যদের উন্মুক্ত করিয়া—মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সহৃদয়তার এক বিভাগে ইংরাজ ফরাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—নিকৃষ্ট জীবের প্রতি ইংরাজের মমতা ফরাসী অপেক্ষা সমধিক। আর এক বিষয়ে ফরাসীদিগের হীনতা দেখা যায়—উহাদের ভক্তির অভাব। সাধারণ ফরাসীরা কাহাকেই ভক্তি করে না। এমন কি, তাহাদের ভূতপূর্ব্ব অধিনেতা বোনাপার্ট ও গ্রেভিও তাহাদের ভক্তির পাত্র ছিল না। হিরোইজ্‌ম্ হ্যুগোকে ফরাসীরা ভক্তি করিতে বটে কিন্তু তাহার স্থান এখনও পর্য্যন্ত কেহ অধিকার করিতে পারে নাই। রাজভক্তি তো ফরাসীদিগের মূলেই নাই। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকেও উহারা যথোচিত সম্মান করে না। উচ্চ উপাধিও উহাদের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না। উহাদের পারিবারিক জীবনে ভালবাসা আছে কিন্তু ভক্তি নাই। পুরাতন সাহিত্যের প্রতি পূর্ব্বে উহাদের অচলা ভক্তি ছিল—এখন তাহাও চলিয়া যাইতেছে।

ফরাসী উপন্যাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন;—"ইংরাজেরা সচরাচর এইরূপ বলিয়া থাকেন, ফরাসীরা যে দুর্নীতিপরায়ণ তাহার প্রমাণ তাহাদের নভেল হইতেই পাওয়া যায়—কিন্তু

এ কথা আমি মানি না। কেন মানি না, তাহার সঙ্গত কারণ আমি দেখাইতেছি। ইংরাজ জাতির দুর্নীতির কথা শুনিলেও আমি যথেষ্ট প্রমাণ না পাইলে তাহা গ্রাহ্য করি না। "পেলমেল গেজেটে" "রহস্য প্রকাশ" সম্বন্ধে ইংরাজের চিরশত্রু ফরাসীরা যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল কিন্তু আমি উহার অযুক্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। ফরাসীদিগের দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে ইংরাজদিগের যুক্তির দুইটি প্রকরণ এইরূপ দেখা যায়—যথা (১) উপন্যাস-লেখকেরা সমাজের জীবন্ত ছবি আঁকিয়া থাকে—ফরাসীদিগের নভেলে স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচার সংক্রান্ত ঘটনা প্রায়ই থাকে—সুতরাং ফরাসীরা ব্যভিচারপরায়ণ। (২) ফরাসীরা এই সকল ব্যভিচার-ঘটনা-মূলক নভেল বিস্তর ক্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং এই সকল নভেলের গ্রাহকেরাও ব্যভিচারপরায়ণ। প্রথম প্রকরণটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, সচরাচর এক-দেশে বাস্তব জীবনে যত না অগম্যাগমের ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তদপেক্ষা কাল্পনিক সাহিত্যে সেই সকল ঘটনার কথা অনেক বেশি থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত, সচরাচর ইংরাজদিগের বাস্তব জীবনে যাহা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা শেক্সপিয়রের নাটকে হত্যাকাণ্ডের কথা বেশি পাওয়া যায়। এমন কি, যে সকল উপন্যাস নিতান্ত নির্দোষ বালকের পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, যথা, 'আরব্য-উপন্যাস', 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' এবং আধুনিক ষ্টিভেনসন্ প্রণীত "ঈশ্বর-ভাণ্ডার দ্বীপ"—এই সকল গ্রন্থও খুন ও নরহত্যার ব্যাপারে পূর্ণ—কেবল পাঠকের ঔৎসুক্য উদ্রেক করিবার উদ্দেশে এই সকল ঘটনা উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাস্তব জগৎ, উপন্যাসিক জগতের মত হইবেই হইবে, এই যে যুক্তি—অন্য দিক্ দিয়া দেখিলেও—ইহার হীনতা উপলব্ধি হইবে। নভেল লেখকের সৃষ্ট চরিত্র অপেক্ষা বাস্তব

জগতের লোক সংখ্যা অনেক বেশি একথা কে না স্বীকার করিবে? অতএব যদি বাস্তব জগৎ হইতেই উপন্যাসের চরিত্র সকল গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইমাত্র প্রমাণ হয়, চিকিৎসা-শিক্ষার্থীরা যেমন মোটের উপর কোন স্বাস্থ্যজনক পল্লী হইতে রোগীর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে, সেইরূপ এই সকল উপন্যাস-লেখকেরা সাধারণতঃ নিরপরাধা সমাজ হইতেই অপরাধকাণ্ড সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু আসল কথা, উপন্যাস-লেখকেরা বাস্তব জীবন হইতে ঘটনা সকল সচরাচর সংগ্রহ করে না—প্রায়ই উহারা প্রকৃতির আদর্শে চরিত্রগুলি রচনা করিয়া থাকে এবং ঘটনা ও অবস্থানগুলি প্রায়ই স্বকপোলকল্পিত।

গ্রন্থকার আরও অনেক বিষয়ে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতে প্রবন্ধের আয়তন অত্যন্ত বাড়িয়া পড়ে সুতরাং এইখানেই শেষ করা গেল।

অন্তর্যামী।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু গাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুর।

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
মর্ম্মকথাতে ভুল নাহি পাই,
কথা ভেসে যাই সুরে!
বসিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন ঘরারে,
ভনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়া মূরতি কি কহিছে বাণী!
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি!
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি'
রহস্যে নিমগন!
এ যে পরাণের কোথা হতে উঠে,
এ যে বাহিরের কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ!
নূতন ছন্দ জাগে ও পায়
ভাষা আসিতে চাহে না যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে হায়
নূতন রাগিণী ভরে।

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,—
দেখে' তুমি হাস বুঝি!
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি ফিরিতেছি খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোষ্ঠে যায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,

ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।
কভু বা পথ পড়ে জটিল,
কভু পিচ্ছলতল পাঙ্কিল,
কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম,—
খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধূলায় কৌদ্রে মলিন বরণ,
আশে পাশে হতে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম!
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে!
কোথা হতে আসে বন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ভাজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে!
ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন?
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ?

চুপ করে থাকি শুধায় যখন ;
দেখে তুমি হাস খুসি,
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে !
আমি যে তোমারে খুঁজি !

রাখ কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি !
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার ?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে !
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?
মোর প্রেমে নিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী,
জাগাও গভীর সুর !
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর ?

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহা মন্দিরতলে?
নাহি জানি, তাই সারা প্রাণ মন
আছে দহিয়া নিশি দিনমান,
চেতন অগ্নিশিখার সমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে!
অর্দ্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখি কোনো সবার জগতে
জনতার মাঝখানে?
জীবন-পোড়ানো এই হোম-অনল
সে দিন কি হবে সহসা শীতল?
সেই শিখা হতে রূপ নির্ম্মল
পাইব কি আলিবারে?
সব জটিলতা হইবে সরল,
তোমারে পাইব বুঝি!

ছাড়ি কৌতুক নিত্য-নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী

জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি ?
চির দিবসের হৃদয়ের ব্যথা,
শত জনমের চির সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশার ঊষা বিকাশিয়া
শ্রান্ত জনের শিয়রে আসিয়া
মধুর প্রেমে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি ?
ললাট আমার চুম্বন করি
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি',
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি'—
জানি না চিনিব কি না !
শূন্য গগন নীল নির্ম্মল,
নাহি রবিশশি গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাহি কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা !
শতেক আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
নীল-বসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গ।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আমার কুন্তলভার,

নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-ভরদে!
হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি,
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি,
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত-বৃষ্টি
বরষি' করুণা-ভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহুবন্ধনে করেছে বন্ধ,
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু বাষ্প ভরে।
নাহিক অর্থ, নাহিক তত্ত্ব,
নাহিক মিথ্যা, নাহিক সত্য,
আপনার মাঝে আপিনি মগ্ন,—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি?
আমি হতে তুমি বাহিবে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,—
তবে তাই হোক্! দেবি অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে!

নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুটিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখন হৃদয়ে, কখন বাহিরে,
কখনো আলোকে, কখন তিমিরে,
কভু বা স্বপনে, কভু নশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।
বক্ষ-বীণায় বেদনার তার
এমনি টানিয়া বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীতঝঙ্কার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম্ম-দুয়ার
অশ্রু-নিঝর ছুটিবে আবার,
জানি না খুঁজিয়া কোন্ পারাবার
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবস রজনী
আমি-নদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে!
যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মত ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে!

আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।
একবারে মত পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;
সে সুরা তরল অগ্নি সমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি !
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি !

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি এ জীবনে ভুবনে ভবনে
হইবে নিখিল জয়ী,
এবার তা'হলে খুলি দাও ডোর,
ছুটাও জগতে এ পুরাণ মোর,
আঘাত করিয়া নিঠুর কঠোর
ছিঁড়িয়া বল্‌গা-বাঁধা !
না চাহি আরাম, নাহি বিশ্রাম,
দুর্দ্দমবেগে ছুটি উদ্দাম,
দেখাবে আমারে দক্ষিণ বাম
তব ইঙ্গিত-আঁকা।
অয়ি নির্ভীকে, লইয়া আমায়
মর্ত্ত্য প্রাণের প্রান্ত সীমায় —

জীবনমৃত্যু মিশেছে যেথায়
গত যে নিশি স্রোতে।
ওরে যেয়ো ছিঁড়ি অন্ধমুগের
আত্মঘাতক লুতাজাল-ঘের,
ওরে যেয়ো, ওরে গৃহজীবীদের,
শাস্ত্র-শাসন হতে!
নির্বাক্ হয়ে চেয়ে রবে সব
বিপুল বিশ্ব, দিবে গালব,
কোথা হতে জয় শঙ্খের রব
বাজিবে তোমার মুখে।
কোথা হতে ধ্বনি সাম্যের সবে
চাহি চারিদিকে কই দেবী কই,
তোমার চরণ বিশ্ববিজয়ী
নাচিবে আমার বুকে!
সেই তালে তালে নাচিবে রঙ্গ,
প্রলয়-নেশায় নাচিবে ভঙ্গ,
রুদ্র দিবস তিমির নক্ত
নাচিয়ে মুক্তকেশে!
মোহ-বন্ধনে হানিয়া অঙ্ক
ঘুচায়ে জীর্ণ মিথ্যাবস্ত্র,
আয় পাগলিনী প্রলয়ি রঙ্গে
সঙ্গে, পাগল দেখে।
কর অচেতন এদের চুম্বনে,
কঠিন পীড়নে তবে কর মনে,

তব নির্দ্দয় বাহুবন্ধনে
মুক্তি পাইব বুঝি!
তব কেশপাশে হইয়া অন্ধ
মরিব তোমারে খুঁজি!

•

একি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
যুগ যুগান্ত চরণপ্রান্তে
নূপুর বাজিছে ওই!
সেদিকে ফিরাই মুগ্ধনয়ন
মনে পড়ে যেন তোমারি স্বপন,
তোমারি হাতের লিপি পুরাতন
খুঁজে পাই চারিদিকে।
উষার আকাশে অরুণের লেখা
তব রাঙা পদ-কমলের রেখা,
সন্ধ্যা-তারায় কি যে দেখ দেখা,
চেয়ে থাকি অনিমিখে!
অনন্ত কাল বিশ্বমেলায়
তোমাতে আমাতে কিসের খেলায়
পেলাধে ফিরেছি মনে পড়ে যায়
বাল্য স্বপন মত!
সে খেলাচিহ্ন কুসুমে পাতায়,
ঘাস-হিল্লোলে নদীর গাথায়
আকাশে পাতালে যেথা সেথায়
পড়ে আছে শত শত!

এ শ্যামল ধরা সুনীল গগন
ছিল আমাদের বাসর ভবন,
কবে হয়েছিল প্রথম মিলন
আজি কি তা মনে পড়ে!
সে ফুল-শয়নে তোমার সুবাস
আজো বিরহীরে করিছে উদাস,
সে সুখ-পরশ বহিয়া বাতাস
আজিও সোহাগ করে!
শত জনমের তোমার সে হাসি
কার মুখে আজি বেড়াইছে ভাসি,
তাই দেখে' আজি কারে ভালবাসি
তাই ভাবি আজি মনে!
যে কথা স্বর্গে হয়েছিল বলা
সে কথা ধ্বনিছে আজিকার গলা,
কখন্ কোথায় ওগো চঞ্চলা
কি যে খেলা ত্রিভুবনে!
এমনি করিয়া মুগ্ধ এ দাসে
বাঁধিবা গোপন ছলনার পাশে
লোক লোকান্তে প্রেম পরিহাসে
খেলায়ে বেড়াবে বুঝি?
শত জনমের বিস্মৃতি মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি!

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী?

সকল জগৎ ভব নারায়ণ
কোথা যেতে চাহ অয়ি!
আজি নির্জ্জনে বসিয়া একাকী
পদপঙ্কজে মন বাঁধিয়া রাখি'
সুগভীর ধ্যানে মুদ্রি দুই আঁখি
হেরিতেছি এক ছবি;
পার্থের রথে ভদ্রা যেমন)
হেলায় রশ্মি করিয়া গ্রহণ
সুবর্ণ রথ করিছ চা[illegible]
পাশে আমি ব[illegible]বি;—
নাহি জানি কোন্ [illegible] কথা,
নিয়ে গিয়েছিলে কোথা [illegible] কোথা,
কত রণভূমি, কত সে সমর,
কত প্রবাহ রক্ত!
বাধা পেয়ে তটে লোক-আ[illegible]
মহা সংঘাতে করে [illegible]
[illegible] হিংসা-সুখে যেমত
প্রলয়নৃত্যরত
আজি সে কাহিনী যেন [illegible]
যত স্মরি পাঠ, তত মনে [illegible]
দুলে উঠে প্রাণ শোকে উল্লাসে,
উৎসাহে অবসাদে।
আমি ছিনু নেতা, আমি ছিনু রাজা,
সেই মোর [illegible] হয়েছিল লাজ।

বাহি সে নিমের নির্জ্জন-ধারা
আসিয়াছি কল্পনাদে।
সেই রামায়ণ, সে মহাভারত,
তার মাঝে তব গিয়েছিল রথ;
দুঃসহ দুঃখ, দুর্গম পথ
হেসেছি যাহন করি।
কত-না উর্ম্মি-আকুল পাথার
তোমার সাথে আমি দিয়েছি সাঁতার!
মৃত্যু পয়োধি হইয়াছি পার
চরণ রক্ষে বুরি।
তাই থেকে থেকে প্রাণ নেচে উঠে,
সুখ-বন্ধন দুই হাতে টুটে'
ঝটিকার মাঝে যেতে চায় ছুটে,—
কারে মনে পড়ে বুঝি?
সেথা স্রোতে জল-তরঙ্গে
তোমারে বেড়ায় খুঁজি!

মেয়েলি ছড়া।

বাঙ্গলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে

যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

আমার কাছে কোন্‌টা ভাল লাগে বা না লাগে সেই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। তাঁরা, যাঁহারা সুনিপুণ সমালোচক, এরূপ রচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।

তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এরূপ অহমিকা অহঙ্কার নহে পরন্তু তাহার বিপরীত। যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়িপাল্লা আছে; তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি বাঁধি বোল সাহিত্য করিয়াছেন, যে কোন রচনা তাহাদের নিকট উপস্থিত করা যায় নিঃসঙ্কোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া দিতে পারেন।

কিন্তু অক্ষমতা এবং অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেই ওজনটি যাঁহারা পান নাই, সমালোচনস্থলে তাঁহাদিগকে একমাত্র নিজের অনুরাগ বিরাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সেরূপ লোকের পক্ষে সাহিত্য সম্বন্ধে বেদবাক্য প্রচলিত করিতে যাওয়াই স্পর্দ্ধার কথা। কোন লেখা ভাল অথবা মন্দ তাহা প্রচার না করিয়া কোন্ লেখা আমার ভাল লাগে বা মন্দ লাগে সেই কথা স্বীকার করাই তাঁহাদের উচিত।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, সে কথা কে শুনিতে চায়, আমি উত্তর করিব সাহিত্যে সেই কথা সকল মানুষ শুনিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের সমালোচনাকেই সমালোচনা বলা হইয়া থাকে কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যই প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমালোচনা মাত্র। প্রকৃতি সম্বন্ধে মনুষ্য সম্বন্ধে ঘটনা সম্বন্ধে কবি যখন নিজের আনন্দ বিষাদ

বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাহার নিজের সেই মনোভাব কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা ও রচনা-কৌশলে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন তখন তাঁহাকে কেহ অপরাধী করে না। তখন পাঠকও অনুমিকা সহকারে কেবল এইটুকু দেখেন, যে কবির কথা আমার মনের সহিত মিলিতেছে কি না! কাব্যসমালোচনায় যদি যুক্তি তর্ক এবং শ্রেণীনির্ণয়ের দিক্ ছাড়িয়া দিয়া কাব্যপাঠকের মনোভাব পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্যত হন তবে সে জন্য তাঁহাকে দোষী করা উচিত হয় না।

বিশেষতঃ আমি যে কথা স্বীকার করিতে বসিয়াছি তাহার মধ্যে আত্মগোপন কিঞ্চিৎ অংশ থাকিতেই হইবে। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী অংশের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণ-শক্তি বর্ত্তমান লেখকের নাই। একথা গোড়াতেই কবুল করা ভাল।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান" এই ছড়া বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মত ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য্য এবং উপযোগিতা কি। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত উপন্যাস এবং গীতিকবিতা মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন এত অর্থ ব্যয়ের প্রতিদান পাইয়া এবং দিতে হইতেছে অথচ এই সকল ভাবরসগন্ধহীন ছড়াগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল অবাধিষ্ঠিত হইয়া আছে।

এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনটির কোন কালে কোন রচয়িতা ছিল কবিরা পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ সময়ের কোন্ মনোবিশেষে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন খোঁজও কাহারো মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরন্তনগুলি সৃষ্টির আজ লিখিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও নূতন।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। ছেলে কারিগা দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশকাল শিক্ষা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন বালকের মনের শিশু-মূর্ত্তি বাবিয়া কলপ্রসূন করিতেছে, অথচ মর্ম্মগ্রাহী দিদি যে যেমন করিয়া যেমন সুকুমার স্নেহসূত্রে গূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির হাতে; কিন্তু বয়স্ক মানুষ মহল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য;—তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে।—স্বভাবতঃ আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ রঙ্গ, শব্দ, এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে শরৎ ঘুরি, ফুলের রেণু, অস্তগামী সূর্য্য, বিচিত্র শব্দ, বিচিত্র পল্লব ও ফলের গন্ধ, পৃথিবীর বাষ্প,—এই আবর্ত্তিত পুষ্পোজ্জ্বিত আলোকের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডদৃশ্য সকল—সর্ব্বদাই নিয়মভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া

বেড়াইতেছে আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অসম্বদ্ধিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতন ভাবে কোন একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি তখন এই সমস্ত গুঞ্জন থামিয়া যায়, এই সমস্ত রেণুজাল উড়িয়া যায়, এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে, সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের অধিকাংশই আচ্ছন্ন হইয়া যায়—তাহার বই শাসনে, তাহারই বিধানে, তাহারই প্রবাহ, তাহারই অনুচর পরিচরে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, আকাশে পাখীর ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোট বড় কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে কত কম্পন কত আন্দোলন, কত গমন কত আগমন, ছায়ালোকের কত চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে,—অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে একক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভাল করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভাল করিয়া দেখে না, এবং সে

যখন চিন্তা করে তখন ভাল করিয়া দেখেও না শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষমতাবলেই সে এই জগতের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপনার নিকটে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। পুরাণে পাঠ করা যায়, পুরাকালে কোন কোন মহাত্মা ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন; আমাদের মনের ইচ্ছাধীনতা ইচ্ছা-বধিরতার শক্তি আছে; এবং এই শক্তি আমাদিগকে প্রতিপদেই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত জগতের অধিকাংশই তাহার চেতনার বহির্ভাগ দিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া যাহা গ্রহণ করে এবং নিজের আবশ্যক ও প্রকৃতি অনুসারে গঠিত করিয়া লয় তাহাই সে উপলব্ধি করে - চতুর্দ্দিকে, এমন কি, মানস-প্রদেশেও, যাহা ঘটিতেছে যাহা উঠিতেছে তাহার সে খবরও রাখে না।

সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মত যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুচক্রের দৈবচালিত হইয়া কখন সংলগ্ন কখন বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আলোক ও বর্ণ পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া চলিতেছে তাহারা যদি কোন অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্ত্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তাহারা বাহ্য সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতন। সেই জন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এইখানে দুই একটি ছড়া উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে পাঠকদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। প্রথমতঃ

ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মত মর্য্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্থ পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে? পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে আপন বাল্যস্মৃতি হইতে সেই সুধাস্নিগ্ধ সুরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সঙ্গীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্য্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব? ভরসা করি, এই ছড়াগুলির মধ্যেই সেই মোহমন্ত্রটি আছে।

দ্বিতীয়তঃ, আটঘাটবাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃত-বেশা অসংকুণ্ঠা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিন্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়—নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য্য।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজি-ফুল তুলতে পেলুম গেলুম মালা।
হাত-ঝুমঝুমি পা-ঝুমঝুমি তারাদের খেলা॥
নাচ হু হু হারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় ত জল নেই ত্রিপূর্ণীর ঘাট।

ত্রিপূর্ণীর ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন যে।
তার বোনকে বিয়ে করে ওড়ফুল দিয়ে।
ওড়ফুল ফুটে হয়ে গেল বেলা।
হায় বোনকে বিয়ে ঠিক্ ফুরুল বেলা।

ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই বলিলেও নিতান্তই পক্ষপাতী সমালোচকদিগেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একটা এই দেখা যাইতেছে কোন প্রকার বাচ-বিচার নাই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোন প্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনরূপ উপলক্ষ্য অন্বেষণ না করিয়া অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন কি, মাঝে মাঝে লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে। দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা যে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না!

যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন্ আগামী কল্য যে, তাঁহার শুভ-বিবাহ সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর সায়াহ্নকালে কাজিতলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে সে কথা আপাততঃ উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক্, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ অথবা সে জন্য কাহারও তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার

রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে! সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে, যে, কাহাকেও কোন কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সেই ঘটনাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজি-ফুল যে কি ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি, যে, যমুনাবতী নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোন যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুমঝুম্ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল আমরা তাহার বিসর্জন কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপুর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছুই আশ্চর্য্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যে লোক লইয়া গেছে তাহার কোনরূপ উদ্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কি কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থিরসংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল সংগ্রহ দ্বারাই শুভকর্ম্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোন পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে!

এই ত কবিতার বাঁধুনি! আমাদের হাতে যদি রচনার ভার

থাকিত তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে প্লট্ বাঁধিতাম যাহাতে প্রথমোক্ত যমুনাবতীই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সেই ত্রিপূর্ণীর ঘাটের অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভগ্নীরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্ন-কালে গড়ফুলের মালা বদল করিয়া সে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঘটিত তাহাতে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের এই তাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিষকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে যোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাব-বশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্ত্তের মধ্যেই মুঠামুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্ত্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক সেখানে কর্ত্তা-কেও অবিকলে কালের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সদ্যোনির্ম্মিত নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের এই সুদীর্ঘকাল নিয়মের মধ্যে অভ্যস্ত হয় নাই; এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্র-তীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামতে

করিয়া মর্ত্ত্যলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের কার্য্যের সহিত বালকের লীলার সর্ব্বদা তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যেই একটা ইচ্ছাসুখ আনন্দের সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ছড়াটিতে সঙ্গতি নাই কিন্তু ছবি আছে। কাশি-তলা ত্রিপূর্ণীর ঘাট, এবং ওডবনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মত অদ্ভুত কিন্তু স্বপ্নের মত সত্যবৎ।

স্বপ্নের মত সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বুদ্ধির সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই পণ্ডিত স্বপ্নকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন প্রত্যক্ষ সত্য নাই—তবে কি আছে? না, স্বপ্ন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে প্রবল যুক্তি দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করিবার যো নাই। কেবল সজাগ স্বপ্ন নহে, নিদ্রাগত স্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সূতীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে অবিশ্বাস করেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা সম্ভব সত্যকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাঁহারা চরমতম অসম্ভবকে অসংশয়ে গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্বাস-জনকতা নামক যে গুণটি সত্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ হওয়া উচিত সেটা যেমন স্বপ্নের আছে এমন আর কিছুরই নাই।

এতদ্দ্বারা পাঠক এই কথা বুঝিবেন যে, প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্ন-জগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি, এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

পাছে অসম্ভবকে সত্য বলিয়া ঠকিতে হয় এই জন্যই যুক্তি নামক একটি প্রবল পক্ষের সহায়তা অবলম্বন করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম সেই লোকটা যদি ভ্রমগুলাকে ঝেঁটাইয়া বাপে তাহা হইলে জগৎসংসারে চলিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। তখন এ কথা মনে করি নাই ক্রমে সে সর্দ্দার প্রাপ্ত হইয়া জগৎসংসার-সমেতই ঝেঁকাইতে বসিবে। ছুরিতে শান দিবার জন্য যে পাথরটাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল সে আপনার ধর্ম্মগুণে ক্রমে সমস্ত ছুরিটাকেই লোপ করিয়া দিবে।

কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে বালকের দর্শন এবং বৃদ্ধের দর্শন এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। বৃদ্ধ অনেক বিচার করিয়া সত্যকে সত্য বলে এবং বালক কিছুমাত্র বিচার না করিয়া স্বপ্নকে সত্য বলিয়া থাকে।

এই জন্য বালকের মন ভুলাইতে অধিক আয়োজনের আবশ্যক করে না। তাহাকে সত্যই দাও আর ভুলই দাও সে দুটাই গ্রহণ করিবে—বরং সত্য ছাড়িয়া ভুলটাকে বেশি আদর করিয়া লইবে কারণ তাহার মধ্যে কিছু রস থাকে এবং যদি নেটা সত্যের অপেক্ষা অধিকতর স্পর্শযোগ্য অনুভবগম্য হয়।

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর, নদী এল বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হয়, শিবুঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক কাল ছিল যখন এতাদৃশ চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি ছত্র-আমার

লোকালয়ের মেঘদূতের মত ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বর্ষার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল। তাহার পর দেখিতে পাইলাম সেই নদীর স্রোতে বালুচর হেন শুভ্রফেন পান্সী নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবু ঠাকুরের নবনিযুক্তা বধূঠাকুরাণী বহুযত্নে চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। তাহার পর কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড় সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইল। এমন কি, তৃতীয়া বধূঠাকুরাণী মর্ম্মান্তিক রাগ করিয়া ত্রস্তচরণে বাপের বাড়ি-অভিমুখে চলিয়াছিল সেই অবধিও আমার এই সুখচিত্রের কিছুমাত্র ব্যাঘাত স্মরণ করিতে পারে নাই। এই নির্ব্বোধ তখনও বুঝিতে পারিত না ঐ একটিমাত্র ছত্রে হতভাগ্য শিবুঠাকুরের জীবনে কি প্রকাণ্ড বিনাশক লোকাবহ পরিণাম সূচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরিত্রবিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্রবিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি হতবুদ্ধি শিবু ঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার অকস্মাৎ পিতৃগৃহপ্রবাস দৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখে নাই।

এই শিবুঠাকুর কি কবিতা লিখে কেহ ছিল এক ওরা। একথাও মনে উদয় হয়। হয়ত বা ছিল। হয় ত এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর কোন ছড়ায় হয় ত বা ইহার আর এক টুক্‌রা পাওয়া যাইতে পারে।

এ পারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তাহি মধ্যে বাস আছে শিব সদাগর॥
শিব গেল শ্বশুর-বাড়ি বাজতে দিল শিঙে।
জলপান করিতে দিল পাকা কাঁঠালের কিঁচে॥

শালিধানের চিঁড়ে নয়রে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সব্‌রি কলা, কাগমারে দই॥

ভাবেগতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে শিবু ঠাকুর এবং শিবু সদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্য সম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ রুচি আছে এবং বোধ করি আহার সম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে স্থানটুকু নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাও নব-পরিণীতের প্রথম প্রণয়-যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এইস্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্রমে শিবু সদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে "শালিধানের চিঁড়ে নয়রে বিন্নিধানের খই!" যেন ঘটনার সত্য সম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার যো নাই। অথচ এই সংশোধনের দ্বারা বর্ণিত ফলাহারের খুব যে একটা ইতরবিশেষ হইয়াছে, জামাই-আদর সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ির গৌরব খুব উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্বশুর-বাড়ির মর্য্যাদা অপেক্ষা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার প্রতি কবির অধিক লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মত। বোধ করি শালিধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতেই পরমুহূর্ত্তে বিন্নিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবু ঠাকুরও কখন্ এখানি করিয়া শিবু সদাগরে পরিণত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ মধ্যে কতকগুলি টুক্‌রা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন একখানা আস্তগ্রহ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুক্‌রা জগৎ বলিয়া

আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোন পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে যোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য-রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্ত্তমান এবং তাহার নিকট বর্ত্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপ্সা করিতে চাহে না।

নিয়োদ্ধৃত ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাঁকের মত উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের সেই ঐক্যের এই স্বতন্ত্র দ্রুতগতিতে বালকের চিত্ত উপর্য্যুপরি বিচিত্র আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বুড়-সাহেবের লিখিগুলি নাইতে এসেছে॥
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদীর হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেচে॥
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেচে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে॥
কে রেখেছে কে রেখেচে দাদা রেখেচে।
আজ দাদার চেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্ খান্ দে, বকুলতলা দে॥
বকুলফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা॥

সীতেনাথ বলেরে ভাই চাল কড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা, জল খাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্ করে।
সোনা-মুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

ইহার মধ্যে কোন ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোন ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝোঁটনবিশিষ্ট মেটে ঘরগুলি, বড় সাহেবের বিবিগণ, দুই পাশে ভাসমান দুই কুই কাৎলা, পরপারে স্নাননিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধনুকের রাঙ্গা সহকারে সীতানাথের ঘোল, এবং মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে তপ্তবালুচিক্কণ মাঠের মধ্যে পাতাপরিষ্কৃত ভদ্রমুখচ্ছবি—এ সমস্তই স্বপ্নের মত। ওপারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে নাহিতে কথা কহিতেছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।

এ কথাও পাঠকদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, যে, স্বপ্ন রচনা করা বড় কঠিন। হঠাৎ মনে হইতে পারে, যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল কার্য্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহজভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাড়াইয়াছে। না ডাকিলেও ব্যস্তবাগীশ চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে সেখানেই ভার আপন লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর পাখা উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া লিখিবার সময়

সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; সহজের প্রধান লক্ষণই এই।

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন আমাদের প্রথমোদ্ধৃত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিলাইয়া যায় এই ছড়াগুলিও তেমনি পরস্পর জড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সে জন্য কোন কবি চুরির অভিযোগ করে না এবং কোন আলোচকও ভাব-বিপর্য্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি হইল সিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিস্ বা আইনকানুনের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনো-যোগ করিয়া দেখুন।

ও পারে জন্তি গাছটি জন্তি নড় ফলে।
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে হাইচাই গলা জ্বলে কাঁচা।
কতদূরে বাবরে ভাই হরগৌরীর মাঠ॥
হরগৌরীর মাঠেরে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিন্‌লাম, চুণ কিন্‌লাম ননদে ভাজে খেল।
একটি পান হানালে দাদাকে বলে দেলাম॥
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইক বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিলে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি সাইতে বসেছে।

মোটামোটা চুলগুলি গো পেতে বসেচে।
চিক্‌ন্ চিক্‌ন্ চুলগুলি ঝাড়তে লেগেচে॥
হাতে তাদের দেবদারু মেঘ লেগেছে।
গলায় তাদের ভক্তিমালা বক্ত ছুটেছে॥
পবণে তার ডুবে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে॥
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়েব নাকে বিয়ে।
নাল গামছা দিয়ে॥
অশথেব পাতা ধনে।
গৌরী বেটী কনে॥
নক্কা বেটা বর।
ঢ্যাম্ কুড়্ কুড়্ বাদ্দি বাজে চড়কডাঙ্গায় ঘর॥

এই সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ায় দেখিয়াছি, আলোচাল খাইয়া সীতারামনামক নৃত্যপ্রিয় লুব্ধ বালকটিকে ত্রিবেণীর ঘাটে জল খাইতে যাইতে হইয়াছিল; দ্বিতীয় ছড়ায় দেখিতে পাই সীতেনাথ চালকড়াই খাইয়া জলের অন্বেষণে চিৎপুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় ছড়ায় দেখা যাইতেছে—সীতারামও নহে, সীতানাথও নহে, কোন এক হতভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষ-পরায়ণা ননদিনী জাম্বি-ফল ভক্ষণের পর তৃষাতুর হইয়া হরগৌরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল এবং পরে, অসাবধানা ভ্রাতৃবধূর তুচ্ছ অপরাধটুকু দাদাকে বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই ত তিন ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার

নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ বুঝা যায় অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের প্রাচুর্য্য দ্বারা সেটাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে অথচ এক্ষেত্রে সে পক্ষে খেয়ালমাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে; দুইয়ের বা'র! ঐ যে ছড়ায় একজায়গায় সুবলের বিবাহের উল্লেখ আছে সেটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নহে কিন্তু সত্য বলিয়াও বোধ হয় না। "দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইক বাড়ি; সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।" যেমনিই সুবলের নামটা মুখে আসিল অমনিই বাহির হইয়া গেল "আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।" সে কথাটাও স্থায়ী হইল না, অনতিবিলম্বেই দিগ্‌লগ্নের দীর্ঘকেশা মেয়েদের কথা উঠিল। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে। হয়ত শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোন অলীক তুচ্ছ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একটা কথা হইতে আর একটা কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে তাহাদের সম্ভাবনার কোনই কারণ ছিল না, মুহূর্ত্তকাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্য হইতে বিনা-চেষ্টায় অপসৃত হইয়া যায়। সুবলের বিবাহকে যদিবা পাঠকগণ তৎকালীন ও তৎস্থানীয় কোন সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন "নালগাছা দিয়ে টিয়ের মার বিয়ে" কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ বিধবা-বিবাহ টিয়ে জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নালগাছার ব্যবহার উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কস্মিন্ কালে শুনা যায় নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও

করে না, তাহারা মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।

বালকেরা পুতুলকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেমন দেখিতে পায়। ইহার কারণ পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বালকের সহিত দেবতার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বালক যত সহজে ইচ্ছা-মাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না। তাবিয়া দেখ, একটা গ্রন্থিবাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মানবিশিষ্ট মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানরূপে মানুষ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদের, একটা মৃত্তিকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মানুষের মত গড়িতে হয়—যেখানে যতটুকু অনুকরণে ত্রুটি থাকে তাহাতেই আমাদের কল্পনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়ভাবের শাসনে আমরা নিষিদ্ধ; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে তাহাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আপন মনের মত জিনিষ মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, বস্তুমূর্ত্তির সহিত বস্ত্রখণ্ডরচিত খেলনকের কোন বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছোরচিত স্বপ্নকেই সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখে। ভবনগৃহের প্রাচীন দেয়ালে স্থানে স্থানে চুণ খসিয়া গিয়া কতকাল লেখকের কল্পনা-কল্পনা নানা প্রাণী ও বিচিত্র কাহিনীপূর্ণ যে এক সজীব মায়ারাজ্য রচিত হইয়াছিল আজ বোধ করি সেই দেয়াল নিপুণ চিত্রকরের চিত্রে পরিপূর্ণ করিলেও সে বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই সকল অযত্নরচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজনশক্তির দ্বারা রচিত হইয়া উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা

আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় অল্পিত চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগুলি একটি রেখা একটি কথার ছবি। দেশলাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি মিত্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। "চিড়েচেরা নাঠেন্ত খালি চিঁচিঁচিঁ করে" এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্ব্বর মাঠ মধ্যাহ্নের রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয়।

"পবণে ভার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েচে।" ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি তার গাত্রযষ্টিকে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে তাহা ঐ একছত্রে এক মুহূর্ত্তে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে, "পবণে তার ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে"—সে ছবিটিও মন্দ নহে।

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্দিপাড়া দিয়ে।
বাগ্দিদের ছেলে ঘুমোয় জালমুড়ি দিয়ে।

ঐ শেষ ছত্রে জালমুড়ি দিয়া বাগ্দিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে ঐ জালমুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগ্দি-সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলার চেপে যাই।
দোলার আছে ছপণ কড়ি গুণতে গুণতে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করে।

এনদীর ধারেরে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে।
চাঁদ-মুখেতে রোদ্‌ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

দোলায় করিয়া ছয়পণ কড়ি গুণিতে গুণিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টল্‌মল্‌ করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্ত্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল, অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কি হইতে পারে!

এই ত এক শ্রেণীর ছবি গেল। আর এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়ত একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে সমস্ত তুচ্ছ কথা বড় বড় সাহিত্যে তেমন সহজ তেমন অবাধে তেমন অসঙ্কোচে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।

দাদাগো দাদা সহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসী মালা।
বউ বরণে চন্দ্রকণা।
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
আন্‌তে দাও খেয়া করি॥

দাদার বেতন অধিক নহে—কিন্তু বোনটির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের স্বচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে মাও খেলা করি।

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে, "বউ বরণে চন্দ্রকণা।" যদি ভগ্নীর খেলেনাটি তিন্ টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ্য তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্রবশতঃ নহে।

উলু উলু সাদারের ফুল।
বর আস্‌চে কতদূর॥
বর আস্‌চে বাঘলা পাড়া।
বড় বউগো রান্না চড়া॥
ছোট বউলো জলকে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥
বরের বরণ কড়ি।
নটে শাকের বড়ি॥

জামাতৃসমাগমপ্রত্যাশিনী পল্লিবমণীগণের ঔৎসুক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উপলক্ষে স্যাওড়া গাছের বেড়া-দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথঘাট বন পুষ্করিণী ঘটকক্ষ বধূ এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মত জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় একটি বাঙ্গলা দেশের মূর্ত্তি, একটি গ্রামের সঙ্গীত, একটি রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত করিতে আশঙ্কা করি, কারণ, ভিন্নরুচির্হিলোকঃ।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরও অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছু নাই, কারণ, তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনও জগতে সম্ভাব্যতার শেষসীমাবর্ত্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে যদি কিছু অদ্ভুত হয় তবে সকলি সম্ভব। একটা জিনিষ যদি অদ্ভুত হয় তবে আর একটা জিনিষই বা কেন অদ্ভুত হইবে? সে বলে এক মুণ্ডওয়ালা মানুষকে আমি কোন প্রশ্ন না করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, কারণ, সে আমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছে; দুই মুণ্ডওয়ালা মানুষের সম্বন্ধেও আমি কোন বিরুদ্ধ প্রশ্ন তুলিতে চাহি না, কারণ, আমি ত তাহাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; আবার স্কন্ধকাটা মানুষও আমার পক্ষে সম্ভব ও সত্য, কারণ, সে ত আমার অনুভবের অগম্য নহে। এই জন্য ছেলের দেশে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে সীমানাঘটিত কোন বিবাদ নাই।

আয়রে আয় টিয়ে।
নারে ভরা দিবে॥
না নিয়ে গেল বোয়াল্ মাছে।
তা দেখে' দেখে' ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা'।
খোকার নাচন দেখে যা॥

প্রথমতঃ টিয়ে পাখী নৌকা চড়িয়া আসিতেছে এমন দৃশ্য কোন বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই, বালকের পিতার সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্ব্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষতঃ, হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা

ক্ষীরকার বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই কহা নাই খানখা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার বোঁয়া ফুলাইয়া পাখা ঝাপ্‌টাইয়া অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল তখন কৌতুক স্রোতও বাড়িয়া উঠে। টিয়া বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্য-স্পৃহাও বড় চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্ত্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়টিকে নিজে নৃত্যবেগ সম্বরণপূর্ব্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে তেমনি এই সকল ভাবার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া—ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায় এবং বোধ করি সর্ব্বত্রই দুর্লভ!

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর-নদীর কূলে।
ছিপ্ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা বলে পাখীটি কোন্ বিলে চরে।
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

ক্ষীর-নদীর কূলে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কি সঙ্কটেই পড়িয়াছিল তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে? অবশ্য, ক্ষীর-নদীর ভূগোলবৃত্তান্ত খোকাবাবু আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল জানেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নদীতেই হৌক্, তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পরম গম্ভীরভাবে নিজ আয়

তনের চতুর্গুণ দীর্ঘ এক ছিপ্ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই লইয়া কৌতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ডাঙ্গা চক্ষু মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকটগোছের কোলা ব্যাং খোকার ছিপ লইয়া টান মারিয়াছে এবং অন্য দিকে ডাঙ্গা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিস্মিত ব্যাকুল মুখের ভাব—একবার বা প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার বা সেই উড্ডীন চোরের উদ্দেশে দুই উৎসুক ব্যগ্র হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ—এ সমস্ত চিত্র সুনিপুণ যদুদর চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমাদের খোকার পক্ষী-ধৃত চিত্রের বিষয় বটে। মস্ত একটা বিল চরে পরিণত হইতেছে। তাহার ওপারটা ভাল দেখা যায় না। এ পারে তীরের কাছে একটা কোণের মত জায়গায় বড় বড় ঘাস, বেতের ঝাড় এবং ঘন কচুর সমাবেশ; জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন; তাহারই মধ্যে লম্বচঞ্চু দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বকসারসের সহিত মিশিয়া খোকাবাবু ডানা গুটাইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতেছেন এ দৃশ্যটি বেশ;—এবং বিলের অনতিদূরে ভাদ্রঘাসের জলমগ্ন পক্কশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি কুটীর; সেই কুটীর-প্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমুখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহ্ণের অবসান-সূর্য্যালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন; বেড়ার নিকটে ঘেঁষিয়া বাঁধা গোরুটিও স্নিগ্ধিত কৌতূহলে সেইদিকে চাহিয়া দেখিতেছে এবং ভোজনতৃপ্ত খোকাবাবু নালবন শৈবালবনের মাঝখানে হঠাৎ মায়ের ডাক শুনিয়া সচকিতে কুটীরের দিকে

চাহিয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে সেও সুন্দর দৃশ্য;—এবং তাহার পর তৃতীয় দৃশ্যে পাখীটি মার বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুটাইয়াছে এবং দুই ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া ফেলিয়াছে এবং নিমীলিতনেত্র মা দুই হস্তে সুকোমল ডানাসুদ্ধ তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বুকে বাঁধিয়া ধরিয়াছেন সেও সুন্দর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান সেই জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকারাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্দ্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্ত্তি দৃষ্টি-পথে পড়ে। সেই সকল নবীনসৃষ্ট কল্পনাসমূহের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই,—প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনও সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে; কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্ধৃত করি—

'যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চাঁদ কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ভিঙ্গের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু এ ত বড় রঙ্গ।
চাঁদ ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, [illegible]সা রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, [illegible] তোমার হাতের শঙ্খ॥"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, রুক্সে, তোমার মাথার সিঁদুর॥"

"যাদু এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কঙ্গে, বোন্-সতীনের ঘর॥"

"যাদু এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, রুক্সে, তোমার বুকের ছাতি॥"

কবিসম্প্রদায় কবিত্ব-সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে বিবিধ ভাষায় বিচিত্রছন্দে নারীজাতির স্তব গান করিয়া আসিতেছেন কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত স্তব-গানের মধ্যে যেমন একটি সরল সহজ ভাব এবং একটি সরল সহজ চিত্র আছে এমন প্রতি অল্প কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে এতটুখানি সরস কৌতুকও আছে। সীতার ধনুকভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খুব কঠিন পণ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সরলা কন্যাটি যে পণ করিয়া বসিয়াছে সেটি তেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে এত কালো ধলো রাঙা মিশি আছে, যে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র নমুনা দেখাইয়া এমন লাভ করা ভাগ্যবানের

কাজ। আজকাল কলির শেষ দশায় সমস্ত পুরুষের ভাগ্য ফিরিয়াছে; ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ, বিচারে জয়—এ সমস্ত কিছুই আবশ্যক হয় না; উল্টিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন, এবং সেই কাপুরুষোচিত নীচভাব জন্য তিলমাত্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন না। ইহা অপেক্ষা, আমাদের আলোচিত ছড়াটির নায়ক-মহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল—সেও অনেক ভাল। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই তথাপি অনুমানে বলিতে পারি লোকটি পুরা নম্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষয়িত্রী যখন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত দিলেন তখন যে উত্তরগুলি যোগানো আমাদের নায়কের পক্ষে বে, কিছুমাত্র কঠিন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, ও যেন ঠিক বই খুলিয়া উত্তর দেওয়ার মত! কিন্তু সে জন্য নিষ্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিতে চাহি না। যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি যদি সুন্দরী হইয়া থাকেন তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু কাসিথ পাষাণহর্ম্ম্যবাসিনী বিশ্ববিদ্যালয়-নন্দিনী শ্রীমতী ডিগ্রী নামক একটি কঠিনহৃদয়া কুমারী যদি এইরূপ আদর্শে পরীক্ষা প্রচলিত করেন তবে তাঁহার পাণিপ্রার্থীগুলি, আর কিছু না হউক, প্রাণে বক্ষা পায়।

প্রথম ছত্রেই কন্যা কহিতেছেন "যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ!" ইহা হইতে বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আরও পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থী এমন মনের মত আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে! বাস্তবিক এমন রঙ্গ আর কিছু নাই!

যাহা হউক্, আমাদের উপরে এই ছড়াটি রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমত বাঁধিয়া বসিতাম, এমন আচম্‌কা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না! প্রথমে, একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি বা ঠিক সেনেটহলের মত না হইত, অনেকটা ঈডেন্‌গার্ডেনের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার আলোক, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহুধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একটুখানি জম্‌জমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেক রকম করিতে পারিতাম কিন্তু এই সরল সুন্দর কন্যাটি—যাহার মাথার কেশ কিঙ্কের অপেক্ষা কালো, হাতের পাখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিঁদুর কুসুম-ফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শীতল জলের অপেক্ষা স্নিগ্ধ—সেই মেয়েটি—যে মেয়ে সীমান্ত কয়েকটিমাত্র স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজে বিশ্বাস ও সরল আনন্দে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জ্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মত ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন কি, উহাদের মধ্যে সর্ব্বজনবিদিত নীতি এবং সর্ব্বজনদুর্ব্বোধ তত্ত্বজ্ঞানেরও বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারি। কিছু না হোক্, উহাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি! বিবেচনা করিয়া দেখুন্ আমরা যদি কখনো আমাদের বর্ত্তমান সভ্যসমাজে চাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি তবে কি তাঁহাকে নিম্নলিখিতরূপে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি?

আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা!
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা!
মাছ কুটুলে মুড়ো দেব,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা!

এ কোন্ চাঁদ! নিতান্তই বাঙ্গালীর ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্যসমাজের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ মাতুল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটীরের নিকটে বায়ু-আন্দোলিত বাশ-বনের রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়া পরিচিত স্নেহহাস্যমুখে প্রাঙ্গণধূলিবিলুণ্ঠিত উলঙ্গ শিশুর খেলা দেখিয়া থাকে; ইহার সঙ্গে আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা, এতবড় লোকটা,—যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রসুন্দরীর অন্তঃপুরে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্যপাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন সেই শশলাঞ্ছন, হিমাংশুমালীকে মাছের মুড়ো ধানের কুঁড়ো কালো গরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত! আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বৌ-কথা-কওয়ের গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্ব্ব-জাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ্দ করিয়া বসিতাম—তথাচ চাঁদ তখনো যেখানে ছিল এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না—খোকার কপালে টী দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একে-

বারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না। এমন ঘোরতর বিশ্বাসহীন সন্দিগ্ধপ্রকৃতি তাহারা ছিল না। সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে কবিত্বের উৎসাহে তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না। আমাদের বাঙ্গলা দেশের চাঁদামাসা বাঙ্গলাদেশের সহস্র কুটীর হইতে সুকণ্ঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত; হাও বলিত না, নাও বলিত না; এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্ দিন, কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া, পূর্ব্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময়, অমনি পথের মধ্যে, কৌতুকপ্রফুল্ল পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙ্গা টুক্‌রা বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখ-দুঃখ শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দ্দমতটের উপর বিলুপ্ত বংশ সেকালের পাখীদের পদচিহ্ন পড়িয়া ছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দ্দম পদচিহ্নরেখাসমেত পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে; কেহ খোন্তা দিয়া খুঁড়ে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই,—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙ্গাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কতকালের একটুক্‌রা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্ত্তী বর্ত্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে;—আমাদের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা আবার লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠি

"ও পারেতে কলো রং,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি বাঙা টুক্‌টুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন-কেমন করে॥"
'এ মাসটা থাক্, দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিবে যায় পাল্কী সাজিয়ে॥"
"হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥"

এই অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে, কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল! এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোন চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে একটি শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ও পারেতে কালো রং, বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্!

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না! চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে! বহুপূর্ব্বে উজ্জয়িনী রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
——————কিং পুনর্দূরসংস্থে।

কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—
"গুণবতী ভাই আমার, মন-কেমন করে!"

হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি!—

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্ম্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্ব্বিষহ বেদনা-পরম্পরা কে বলিয়া দিবে! দিনে দিনে রাত্রে রাত্রে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন সময়, সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে,—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সে দিন আর কি বাধা মানিতে পারে! সেই ঘর সেই খেলা সেই বাপ মা সেই সুখ-শৈশব সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি এক দণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়! সে দিন কিছুতে আর একটি দিনের প্রতীক্ষাও প্রাণে সহিতে ছিল না—বিশেষতঃ,সেদিন নদীর ওপার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারামুখরিত, মেঘচ্ছায়াশ্যামল, কূলে কূলে পরিপূর্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনি হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি!—ইহার মধ্যে একটি ব্যাকরণের ভুল আছে, সেটিকে বঙ্গভাষার সতর্ক অভিভাবকগণ মার্জ্জনা করিবেন, এমন কি, তাহার উপরেও একবিন্দু অশ্রুপাত করিবেন! ভাইটির প্রতি 'ভগবতী' বিশেষ প্রেমেই করিয়া উপরোক্ত অজ্ঞাতনাম্নী কথাটি অপরিমেয় মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল! সে হতভাগিনী তখনও জানিত না তাহার সেই একটি দিনের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত! —হয় ত ভুলটি গুরুতর নহে, হয় ত ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে এমনও হইতে পারে। সম্প্রতি যাহারা বঙ্গভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাব্রতে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্য্য-গুলিকে বলিদান করিতে [illegible] তাহারাও

মাঝে মাঝে স্নেহবশতঃ আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন, এমন কি, পত্নীশ্রেণীর সম্পর্কের দ্বারা প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃসম্বোধনে অভিহিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন না!

আমাদের বাঙ্গলা দেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্কা অনভিজ্ঞা মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙ্গালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাঙ্গলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ, বাঙ্গালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর অম্বিকা পূজা এবং বাঙ্গালীর কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাঙ্গলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্ম্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

১

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে।
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক ভাঙ্গায়ে॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে।
সেই যে মাসী ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে॥

পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছিলেন আনা সাজিয়ে॥
বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন্——

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোক্ষণ করিতেছেন তাঁহার পূর্ব্বব্যবহার কোন ভদ্র-কন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভাল, তথাপি সাধারণতঃ একপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণারস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা গালিকাটি ইতিপূর্ব্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে তর্জ্জথাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষা-কৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে॥

মা অলঙ্কার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসী ভাত খাওয়াই-

গাছেন, পিসি দুধ খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন; আশা করিয়াছিলাম এমন স্নেহের পরিবারে ভগিনীও অনুরূপ কোন প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছত্রটা পড়িয়াই বক্ষে একটা আঘাত লাগে এবং চক্ষুও ছলছল করিয়া উঠে। মা বাপের পূর্ব্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন বোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে ভগিনী সর্ব্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সবচেয়ে সকরুণ! হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্ব কলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল—সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড় কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক-খাটে তাহারা দুই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমস্ত কলহ বিবাদ এবং সমস্ত খেলাধূলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই পিতৃ-ঘরে আসিয়া, এই খাটের খুরা ধরিয়া নির্জ্জনে গোপনে দাঁড়াইয়া ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকুল অশ্রুপাত করিয়াছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্ম্মল জলধারায় কলহভাবার সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছত্রে একটি কথায় সুখদুঃখের এক-একটি বড় বড় অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার দুই ছত্রে প্রাচীন কাল হইতে অদ্যকাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কত দিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে:

দোল্ দোল্ দুলুনি।
বাঙ্গা মাথায় চিরুনি॥

বর আস্‌বে এখনি।
নিয়ে যাব তখনি॥
কেঁদে কেন নব।
আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কব॥

একটি শিশুকন্যাকেও দোল দিতে দিতে দূর ভবিষ্যৎবর্ত্তী বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে,—সে দিনকার নিদারুণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষত বেদনা আজিকার সংসার হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে; —তোমার মেয়েও যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দুঃখও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না!

পুঁটুর শ্বশুরবাড়ি-প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সে কথাটা সর্ব্বদাই মনে জাগিয়া আছে।

পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে॥
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিনসে কাহার দেব পাল্‌কী বহাতে॥
সরু-ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।
উড়্‌কি ধানের মুড়্‌কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে॥

শেষ ছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শাশুড়ি কিসে ভুলিবে এই পরম দুশ্চিন্তা তখনো সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু উড়্‌কিধানের মুড়্‌কি দ্বারাই সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত এ কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহ এখনকার অনেক কন্যার

মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে কন্যার শাশুড়িকে যে কি উপায়ে ভুলাইতে হয় কন্যার পিতা তাহা ইহজন্মেও ভুলিতে পারেন না।

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ সেও একটা বিষম শেল। অথচ, অনেক সময় জানিয়া-শুনিয়া মা বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিরুপায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়া থাকে। ছড়ায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছড়ার সকল কথাই ভাবিয়া-চোবা, হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশানো।

ডালিম গাছে পরভু নাচে।
তাকধুমা ধুমা বাদ্দি বাজে॥
আই আই চিন্তে পার।
গোটাদুই অন্ন বাড়॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মাল্লে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
খুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি॥
মায়ে দিলে সরু শাঁখা বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেলে চল্ শ্বশুরবাড়ি॥

তখন ইংরাজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পত্য অধিকারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। সুতরাং আত্মীয়গণকে উদ্যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় ঘরের বধূশাসনের জন্য পুলিসের আইনের চেয়ে সেই গার্হস্থ্য আইন, কন্‌ষ্টেবলের হ্রস্ব যষ্টির অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার হুড়্‌কো ঠেঙ্গা ছিল ভাল। আজ আমরা স্ত্রীকে বাপের বাড়ি হইতে ফিরাইবার জন্য আদালত করিতে শিখিয়াছি, কাল হয় ত মান ভাঙ্গাইবার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু হাল নিয়মেই হৌক্ আর সাবেক নিয়মেই হৌক্, নিতান্ত পাশব বলের দ্বারা অসহায়া কন্যাকে অযোগ্যের সহিত যোজনা—এত বড় অস্বাভাবিক বর্ব্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

বাপ মায়ের অপরাধ সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে কিন্তু বুড়া বরটা তাহার চক্ষুশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।

ভালোগাছ কাটম্ বোসের বাল্‌ম্ গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়োবর আমি করব কি॥
টক্কা ভেঙ্গে শঙ্খা দিলাম কানে দিলুম কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো মাগীর দাড়ি॥
চোখ খাওগো বাপ মা, চোখ খাওগো খুড়ো!
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তোমরা কেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।

বৃদ্ধের এমন লাঞ্ছনা আর কি হইতে পারে!

এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট,—যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম সেই মহামহিম খোকা খুঁকু বা খুঁকুনের কথাটা বলা বাকি আছে।

প্রাচীন ঋগ্বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষ্যে রচিত—আর, মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা এবং খুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি। প্রাচীনতা হিসাবে কোনটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিকে পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানবরচনার সর্ব্বপ্রথম। সে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যেও মানব-হৃদয়ের নবীন অরুণোদয়-রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চির-পুরাতন নববেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা, যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নবনব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুঁকুদেবতার কত মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে কখন পাখী, কখন চাঁদ, কখন মাণিক, কখন ফুলের বন।

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কি।
নিবলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

ভালবাসার মত এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়। সে যেন সৃষ্টির লৌহপিঞ্জরের মধ্যে আকাশের পাখী। শত সহস্রবার প্রতিষেধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, প্রতিঘাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না, যে, সে অনায়াসেই নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে! সে মনে মনে জানে, আমি উড়িতে পারি এই জন্যই সে

লোহার শলাকাগুলাকে বারম্বার ভুলিয়া যায়। ধনকে লইয়া বনকে যাইবার কোন আবশ্যক নাই, ঘরে থাকিলে সকল পক্ষেই সুবিধা! অবশ্য বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ নিজেই স্বীকার করিতেছে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্যের অসদ্ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তবু ভালবাসা জোর করিয়া বলে, তোমরা কি মনে কর আমি পারি না। তাহার এই অসঙ্কোচ স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া আমাদের মত প্রবীণবুদ্ধি বিবেচক লোকেরও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়, আমরা বলি, তাও ত বটে, কেনই বা না পারিবে। যদি কোন সঙ্কীর্ণহৃদয় বস্তুজগৎবদ্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে, খাইবে কি? সে তৎক্ষণাৎ অম্লানমুখে উত্তর দেয়—"নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।" শুনিবামাত্র আমরা মনে করি ঠিক সঙ্গত উত্তরটি পাওয়া গেল! অন্যের মুখে যাহা ঘোরতর স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালবাসার মুখে তাহা অবিসম্বাদিত প্রামাণিক কথা। পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল;—
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল,—

একথাটি কি কোন আদালতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও টিঁকিতে পারিত! তথাপি এই দুই ছত্র শতবৎসরেও অপ্রমাণিত হয় নাই এবং কোন কালেই হইবে না।

ভালবাসার আর একটি গুণ এই যে, সে এককে আর করিয়া দেখে। ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ-সীমা মানিতে চাহে না। পাঠক পূর্ব্বেই তাহার উদাহরণ পাইয়াছেন—দেখিয়াছেন একটা ছড়ায়

কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া খোকাকে অনায়াসেই পক্ষীজাতীয়ের সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন প্রাণীবিজ্ঞানবিৎ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না। খোকাকে যখন আকাশের চন্দ্রের অভেদ আত্মীয়রূপে বর্ণনা করা হয় তখন কোন জ্যোতির্ব্বিৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় যখন সে আড়ম্বরপূর্ব্বক যুক্তির অবতারণা করিয়া ঠিক শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ কোথা পাব বাছা, যাদুমণি!
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব!
তুই চাঁদের শিরোমণি!
ঘুমরে আমার খোকামণি!

চাঁদ আহরণগম্য নহে, চাঁদ মাটির গড়া নহে, গাছের ফল নহে, এ সমস্তই বিশুদ্ধ যুক্তি—অকাট্য এবং নূতন—ইহার কোথাও কোন ছিদ্র নাই। কিন্তু এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া অবশেষে যদি খোকাকে বলিতে হয় যে, তুমিই চাঁদ এবং তুমি সকল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ তবে ত মাটির চাঁদও সম্ভব, গাছের চাঁদও আশ্চর্য্য নহে। তবে গোড়ায় যুক্তির কথা পাড়িবার প্রয়োজন কি ছিল!

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালবাসারই একাধিপত্য। ভালবাসা স্বর্গের মানুষ। সে

বলো আমার অপেক্ষা আর কিছু কেশী প্রধান হইবে? আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না? সে স্বপ্ন দেখিতেছে এখনও সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায়, মর্ত্ত্য পৃথিবীতে স্বর্গের মত ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ আর কি হইতে পারে! তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই, একথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই সেই ভ্রমটুকুই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

তাহারা একদিকে যেমন প্রভেদ-সীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখীতে একমুহূর্ত্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার একদিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এপর্য্যন্ত কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ঘুমকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোন জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘুম না কি খোকার চোখে আসিয়া থাকে এইজন্য তাহার উপরে সর্ব্বদাই ভালবাসার কমল-হস্ত পড়িয়া সেও কখন্ একটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে!

হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম পথে পথে ফেরে।
চারকড়া দিয়ে কিন্‌লেম্ ঘুম মণির চোখে আয়রে॥

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন ত আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেইজন্য সেই হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম নিরাশ্রয় হইয়া অন্ধকারে পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বোধ করি সেইজন্যই তাহাকে এত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। নতুবা সমস্ত রাত্রির পক্ষে চারকড়া কড়ি এখনকার কালের মজুরীর তুলনায় নিতান্তই যৎসামান্য।

শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

থেনা নাচন্ থেনা।
বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার যাদুর জন্যে যায়ে নাচ্না কিনে আন্॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন্, পায়ের নাচন্, বাটা মুখের নাচন্,
নাটা চক্ষের নাচন্, কাঁটালি ভুরুর নাচন্,
বাঁশির নাকের নাচন্, মাজা বেল্লুর নাচন্,
আর নাচন্ কি?
অনেক সাধন করে যাদু পেয়েছি॥

ভালবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো একটিকে অনেক করিয়া দেখে, কখন বৃহৎকে তুচ্ছ, এবং কখনো তুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া তুলে। "নাচরে নাচরে, যাদু, নাচন্খানি দেখি!" নাচন্খানি! যেন যাদু হইতে তাহার নাচন্খানিকে পৃথক্ করিয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থের মত দেখা যায়; যেন সেও একটি আদরের জিনিষ! "খোকা যাবে বেড়ু কর্‌তে তেলিমালিদের পাড়া।" এস্থলে "বেড়ু কর্‌তে" না বলিয়া "বেড়াইতে" বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকা বাবুর বেড়ানর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু

খোকাবাবু "বেড়ু" করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানটি একটু বিশেষ স্বতন্ত্র এবং স্নেহাস্পদ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

খোকা এল বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন ক্ষ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে॥

খোকা বাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন সে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা, এবং তাঁহার, যে, নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য, কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজের দোকান হইতে আজানুসমুখিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্‌মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র! কিন্তু খোকা বাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণস্থানে ছোট বুটি-দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া সেটা হইল জুতুয়া! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও গরজেই আসে না।

সর্ব্বশেষে, উপসংহারকালে আর একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি সেইখানেই তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ যে বলা হইয়াছে "নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি" ইহা দেবতারই ধ্যান।

শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে এমন কি আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অবণ্যের নিবালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, মনে হয়, সমস্ত সংসার, সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম এই আনন্দভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে! যোগীগণ যে অমৃত-লালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অবণ্যের মধ্যে অক্ষুব্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের মুখে সেই দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপসনামন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব—সেখানে খাব কি।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশে মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম জীবন্ত সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয়, এবং দেবত্বকেও সম্মান করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্ত্ত্যের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া যাইতেছে—সেও অতি সহজে অতি অবহেলে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশু-দেবতার অতি অদ্ভুত অসঙ্গত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন্ অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

খোকা যাবে বেড়ু কর্‌তে তেলিমালিদের পাড়া।
তেলিমালিরা সুখ করেছে কেন্‌বে সাধনচোরা॥

ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেয়েছে, আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব॥

হঠাৎ, তেসিমালিদের পাড়ায় ক্ষুদ্র খোকাবাবু কখন্ যে বৃন্দাবনের বাঁশি আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা, সে বাঁশি যাহাদের কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

পূর্ব্বেই এমান করিয়াছি প্রেম স্বেচ্ছাচারী। সে দেশকাল কিছুই মানিতে চাহে না। আমার এই প্রবন্ধেও আমি তাহার পরিচয় দিতে বসিয়াছি। কিন্তু অনুরাগকেও দায়ে পড়িয়া ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, এবং প্রেমের "লাখ লাখ যুগ"কে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ করিতে না পারিলে বিশ্বনিয়মের নিকট অনেক প্রকার কৈফিয়তের দায়িক হইতে হয়। অতএব অনুরাগভরে এতক্ষণ সাহিত্যের ঊষারাজ্যে, অদ্ভুত রসের সর্ব্বশাসনহীন স্বর্গলোকে যে আনন্দবিহারে নিযুক্ত ছিলাম সেখান হইতে পুনশ্চ এই বয়স্ক জগতের কঠিন নিয়মাবলীর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। আমাদের সেই ছড়া-জগতের স্নিগ্ধ প্রদোষালোকে

সাত ভাই একত্তরে
চাঁপা হয়ে ফুটিতরে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব
একত্রে আছিল সব,
দুটি ভাই সত্য আর ভুল!
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা,
না ছিল কঠিন বাধা,
নাহি ছিল বিধির বিধান!

হাসিকান্না লঘুকান্না
শরতের আলো ছায়া
কেবল পরশি যেত প্রাণ!
আজি ফুরায়েছে বেলা,
জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি,
মেঘরাজ্য গেছে টুটি',
পদে পদে নিয়ম-অধীন॥

এক্ষণে আনন্দের কথা শেষ করিয়া একটি তত্ত্বকথা বলিয়া উপসংহার করি।

ছড়ার মধ্যেই কি, আর উচ্চতম কাব্যের মধ্যেই কি, সৃজনকার্য্য অচেতন ভাবে ঘটিয়া থাকে। সচেতন ভাবে যাহা করা যায় তাহা নির্ম্মাণ। ভাল কাব্যমাত্রই কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনি রচিত হইয়া উঠে। ভাল মন্দ কোনপ্রকার উদ্দেশ্য সে সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখে না, অথচ উদ্দেশ্য স্বতই সাধিত হয়। ভাল কাব্যের সেই লক্ষণটি ছড়ার মধ্যে আছে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্ত্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিতান্ত নিরর্থক। ছড়াও সমালোচনা-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্ব্বরা করিয়া তুলি-

তেছে। লঘুকায় বন্ধনবিহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনবিহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—অথচ শিশু-মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় না।

আজকাল বঙ্গদেশে স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-রচনার প্রাদুর্ভাব অধিক দেখা যায়। তাহার একটা কারণ এই যে, বাঙ্গালীরা অন্য অনেক সভ্যজাতি হইতে, আনন্দের অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনকেই অধিক গৌরব দিয়া থাকেন। তাহার ফল হয়, আনন্দেরও হ্রাস হয় বৃহৎ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা যদি ক্রমাগতই কাব্য হইতে নীতি তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদের ফরমাস্ অনুসারে এমন কাব্য রচিত হয় যাহাতে কাব্যসৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইতে পারে অথচ তত্ত্ব ও নীতির সুস্পষ্ট বিকাশ হয় না। এবং সেই সকল উদ্দেশ্যকৃত রচনা কখনই স্থায়ী এবং ব্যাপক হইতে পারে না।

মেঘ কেবল বারিবর্ষণ করে না,—ছায়া দেয়, রং ফলায়, নানা অপরূপ সুন্দরমূর্ত্তি ধারণ করে। সেগুলি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যের পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। বারিবর্ষণই যদি তাহার উদ্দেশ্য এবং তত্ত্ব হইত তবে এত আড়ম্বর আয়োজন না করিয়া একটা বড় আকারের দমকল নির্ম্মাণ করিলেও চলিত। অধুনা অনেক গদ্য ও পদ্য-কাব্য সেইরূপ আপনার কাব্যকলা ও কল্পনার সীমাকে দমকলের মুখের মত সঙ্কীর্ণ করিয়া প্রবলবেগে উদ্দেশ্যধারা বর্ষণ করিতে থাকেন—তাহাতে যন্ত্রনৈপুণ্য, বুদ্ধিকৌশল এবং সাধু ইচ্ছা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং প্রাদেশিক, তাহাতে ছায়া, বর্ণ, রূপ এবং আনন্দের পরিমাণ স্বল্পতর।

উপনিষদে আছে "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। উদ্দেশ্য যত বড়ই হোক্ দেশে কালে পাত্রে তাহা সীমাবদ্ধ সুতরাং তাহা অল্প—যথার্থ সৌন্দর্য্যের সীমা নাই—তাহা ভূমা—তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বলোককে সমান আনন্দদান করিয়া আসিতেছে,অথচ এখনও তাহার অন্ত হইল না। উদ্দেশ্যের আনন্দের নিকট প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের আনন্দকে যাঁহারা নির্ব্বাসন দিয়া থাকেন তাঁহাদের দ্বারাও পৃথিবীর অনেক হিতসাধন হইতে পারে কিন্তু কাব্য তাঁহাদের অধিকার-বহির্ভূত।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের দ্বারা অনেক অহিতও হইয়া থাকে। কারণ, হিতসাধনের উৎসাহে তাঁহারা অনেক স্থলে বলপূর্ব্বক অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকেন। ছেলেদের জন্য গ্রন্থরচনা ও গ্রন্থনির্ব্বাচন তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। জগতে অতি সত্বরেই নীতি ও তত্ত্বপ্রচারের অধৈর্য্যে তাঁহারা ছেলে-ভুলানো কাল্পনিক কথাগুলাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া নিরতিশয় আবশ্যকীয় শুষ্ক সত্য এবং উপদেশকে গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে জলসংযোগরহিত ছাতুর মত পিণ্ডাকার করিয়া গিলাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু জননী সরস্বতী ত আমাদের বিমাতা নহেন। অক্ষম অবস্থায় তিনি আমাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমাদের জন্য তাঁহার স্তনে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইয়াছিল—তাহা এই ছড়া এবং রূপকথা,—তাহা কোন বুদ্ধিমানের উদ্দেশ্যকৃত স্বহস্তরচিত নহে, তাহা মাতৃস্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে স্বতঃ-উৎসারিত অমৃতধারা।

সমালোচক এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শত শত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার মধ্যে এ পর্য্যন্ত বালকবালিকাদের জন্য স্নেহময়ী জননীর পরিবর্ত্তে কোন নিয়মময়

যন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই এবং ইহাও তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের যতই উন্নতি হউক্, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাক্, জননী সরস্বতীর তরল-স্তন্যরসক্ষুধা টেক্‌স্ট্‌বুক্ কমিটির কঠিন নির্ব্বাচনে কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারিবে না। শিশুদের কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন তাঁহারা যেন কেবলমাত্র প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগক্রমে বিশুদ্ধ সাধুভাষায় জ্ঞানশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা প্রচার না করিয়া চিত্রবিচিত্র কাল্পনিক কথা ও রূপকথা সংগ্রহ ও সৃজনপূর্ব্বক শিশুদের হৃদয় সরস এবং তাহাদের শিক্ষার পথ সুন্দর এবং তাহাদের জীবনারম্ভ-কাল নবীন উষারাগে রঞ্জিত ও ছায়াঙ্কিত করিয়া তোলেন। কমল-আসনকে প্রাইমারি স্কুল, সরস্বতীকে তাহার হেড্‌পণ্ডিত এবং তাঁহার বীণাযন্ত্রটিকে বেত্রদণ্ডে পরিণত করিয়া সহজভীরু শিশুর সম্মুখে বিদ্যার মূর্ত্তিকে যেন বিকট রুদ্রবেশে উপস্থিত না করেন, এবং শিশু-মতিকে এখন তরল খাদ্য দেন যাহা সে সানন্দ স্বেচ্ছাসহকারে গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজের মানসপ্রকৃতির সহিত অনায়াসে মিশ্রিত করিয়া লইয়া তাহাকে প্রফুল্ল পরিপুষ্ট এবং বলশালী করিয়া তুলিতে পারে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দের দ্বারাই এই উৎপন্ন জীব সকল প্রাণধারণ করিতেছে এবং মৃত্যু-কালে আনন্দের অভিমুখেই প্রবেশ করিতেছে।

এই আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহা বিশুষ্ক হইয়া যায়, এই আনন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে সাহিত্য রচিত হয় তাহা মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তাহা কাহাকেও প্রাণ-দান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষে।

বারাণসী।

এক জন দীর্ঘকায় ধূর্ত্ত হিন্দু নিস্তব্ধভাবে এই সময়ে গুরো করিল; এতক্ষণ সে আমার নগর-প্রদর্শকের সহিত চুপি চুপি কথা কহিতেছিল। দেখা যাইতেছে, নাচ্‌টা বড় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার—নাচ দেখাইবার জন্য আমার নিকট হইতে এক শত টাকা চাহিল। আমি আপত্তি প্রকাশ করিলে আমাকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, নাচ্‌ওয়ালীদিগকে বহু মূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়—তাহা প্রস্তুত করিতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, এই কথা বলিয়া, যে সিন্দুকে সেই পরিচ্ছদ সকল রক্ষিত তাহা আমার নিকট আনয়ন করিল। চুম্‌কি-ওয়ালা বেনারসী সাড়ি—ফিন্‌কিনে ওড়্‌না—বহুমূল্য জহরৎভূষিত জরির কাপড় সকল তাহাতে রহিয়াছে দেখা গেল। আরও সে বলিল, নাচের সময় সহস্র দীপবিশিষ্ট বৃহৎ ঝাড় জ্বালাইতে হইবে এবং নাচ্‌টা সমস্ত রাত চলিবে।

এই অদ্ভুত আমোদ হিন্দুদিগের নিকট সেরা আমোদ বলিয়া পরিগণিত; এমন কোন উৎসব হয় না—বৃহৎ অনুষ্ঠান হয় না যাহাতে নাচ নাই। কলিকাতা কিম্বা বোম্বাই নগরে যখনই কোন খ্যাতনামা য়ুরোপীয় আসিয়া উপস্থিত হন, অমনি রাজ-সরকারের বড় বড় হিন্দু কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে নাচ দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। চার জন নাচ-ওয়ালীকে ঠিক করিতে তাঁহাদের অনেক টাকা ব্যয় হয়। ইহা সকল য়ুরোপীয়দিগের নিকট প্রায়ই ক্লান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে যে কি আমোদ,

ইংরাজেরা কিছুই বুঝিতে পারে না। ভদ্রতার খাতিরে উহারা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং উহারা দস্তুরমত আতর গোলাবের ছিটায় আর্দ্র ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই প্রস্থান করে। দেশীয় লোকেরা আসন-পিঁড়ি হইয়া, উদরের উপর দুই হাত যুক্ত করিয়া, বৃদ্ধের মত নীরব ও নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে। এই ভাবে সমস্ত রাত কাটাইয়া দেয়। কিন্তু এই নাচে কিছুই দৃশ্য নাই—ইহার পাশাপাশি, আমাদের ব্যালে নৃত্যের মধ্যে যে নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, তাহাও অশ্লীল বলিয়া মনে হইবে। নাচওয়ালীদের দেহ পরিচ্ছদ ভারে ভারাক্রান্ত—পরিচ্ছদ যত সুন্দর হয়, ততই নাচের দাম বেশী। এই যে হিন্দুরা বদ্ধপদ্মাসনে সারি-সারি বসিয়া সমস্ত রাত নাচ দেখে, ইহাদের মনে যে কি অদ্ভুত যে সুগভীর তন্দ্রা—যে অনির্দ্দেশ্য জড়তা—যে সূক্ষ্ম মোহ উপস্থিত হয় তাহা কে বুঝিবে? সেতারের সেই এক-বেয়ে বিষণ্ণ ক্রিং ক্রিং শব্দ বারম্বার একই স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে—নাচ ওয়ালীদের পরিচ্ছদে বিবিধ বর্ণপ্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছে—নৃত্যকালে ঐ পরিচ্ছদ পাক খাইয়া ঘুরিতেছে—আবার তাহার পাক খুলিয়া যাইতেছে—মণি মাণিক্য সকল ঝকমক্ করিতেছে—বাহুর নমিলন বিকাশ দেখা যাইতেছে—দেহ তরঙ্গিত হইতেছে, আবার সহসা থামিয়া গিয়া মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে—মস্তক এক পার্শে হেলিতেছে—নানা ভাবে অঙ্গুলীভঙ্গী প্রদর্শিত হইতেছে—এই সকলের সঙ্গে একঘেয়ে বাজনা চলিতেছে—এইরূপে কোথা দিয়া সময় চলিয়া যাইতেছে। যখন আমাদিগের চুরোটিকা হইতে সুনীল ধূম ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হয়, অথবা যখন, সারি সারি শুভ্র মেঘ খণ্ড আলোকের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে এবং আমরা অবসরমুহূর্ত্তে আলস্যভাবে উহাদের গতি নিরীক্ষণ

করিতে থাকি তখন আমাদের মনে যে আলস্যময় সুখের সঞ্চার হয় তাহার সহিত এই আমোদের কতকটা তুলনা হইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা ও তুলনা করিবার চেষ্টা বৃথা। বাহ্য সাদৃশ্য যতই থাকু, এই দেশীয় লোকদিগের মনের গতি উহার দ্বারা কিছুই প্রকাশ পায় না। অতই আমাদের বুদ্ধি ও সহানুভূতি থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমরা হাজার চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিব না।

১৫ জুলাই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নানা সাহেব ইংরাজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। রাজপথে ইংরাজ পুরুষদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে একটা বাঙ্গলার মধ্যে পুরিয়া, জান্‌লার কাঁকের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকেও গুলি করা হইল। এক ঘণ্টার পরে যখন ঘরের মধ্যে আর কোন সাড়া শব্দ নাই, নানা সাহেব ঐ সকল মৃত ও মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে বাহিরে আনাইয়া একটা বৃহৎ কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন। রাত্রিকালে নাচের হুকুম হইল। এবং একটা কৌচের উপর বসিয়া নাচওয়ালীদিগের ভুজঙ্গবৎ অঙ্গভঙ্গী ও নিস্তব্ধ নৃত্য দেখিতে দেখিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

*

অবশেষে আমার নাচ দেখা আর হইয়া উঠিল না। বাজারে যে সকল পট—ছবি কিনিয়াছিলাম তাহাই নাড়িয়া চাড়িয়া আমোদ উপভোগ করিলাম। এই দুইটি ছবি যদিও নিতান্ত স্থূল ধরণের—কিন্তু উহাদের চিত্রকর্ম্মে বিলক্ষণ যত্ন প্রকাশ পায়। কাগজের উপর পলেস্তারা তাহার উপর এক পোঁচ পুরু রং ফলাইয়া জমি প্রস্তুত হইয়াছে। পাশের মুখে চোখ যেরূপ ভাবে দেখা যায়,

সায়্নেব মুখে সেইরূপ ভাবে চোখ্ আঁকা হইয়াছে। মিসরদেশের প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র সকল এই ধরণের।

প্রথম ছবিটি, আনন্দ-মগ্ন একজন ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্ত্তি। ভূমিতলে উপবিষ্ট; দেহ, উদবের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন; বক্ষদেশ উদার ও কোমল; আসনবদ্ধ পদদ্বয়ের উপব অঞ্জলবিদ্ধ হস্ত স্থাপিত; গলায় উপবীত, ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ। মস্তক মুণ্ডিত; গুরুতান ললাট ঝুঁকিষা পড়িযাছে—তাহাতে তিনটি কশিবৎ বেখা; গোঁপ সাদা ও ঘন; চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত। এই মূর্ত্তিতে কিছুমাত্র প্রাচ্য ভাব নাই— ইহা একজন জর্ম্মন অধ্যাপকেব মূর্ত্তি হইলেও হইতে পারিত। কেবল, মস্তকের গঠন অত্যন্ত বৃহৎ এবং মুখ মণ্ডলে একটি প্রশান্ত ভাব দীপ্যমান। দেখিয়া মনে হয়, বহুকাল হইতে এই ব্যক্তি ধ্যানে মগ্ন, বাহ্য কোলাহলের প্রতি উদাসীন—আব কখন বুঝি জাগ্রত হইবে না। চাবিপাশে হরিৎ-বর্ণের তরঙ্গ-বিস্তার ও তাহাব শেবে আকাশের রক্তিমবাগ পরিস্ফুট। বিস্তীর্ণ অসীম প্রান্তরের মধ্যে একটিমাত্র মানব একাকী অবস্থিত।

দ্বিতীয় ছবিটি আরও সুন্দব—রক্তিম রাগে ও কনক-বর্ণচ্ছটায় সমস্ত বিভাসিত। অরণ্যেব মধ্যে তাল বৃক্ষতলে একজন ব্রাহ্মণ বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে। বদ্ধাসন হইয়া গালিচার উপর উপবিষ্ট—হরিদ্রাবর্ণের কৌপীন পরিধান—প্রথম মূর্ত্তিটির অপেক্ষা স্থূল দেহ—উহাবই ছায় থস্‌থসে কোমল শবীর—উদরটি গৌরবর্ণ গোলাকার—গদির উপর যেরূপ থাক্ পড়ে, উহার উদরে সেইরূপ কতকগুলি থাক্ পড়িয়াছে। মুখখানি তত বিষন্ন নহে—ধ্যানভারে ভারাক্রান্ত নহে—পরন্তু একটি প্রশান্ত আনন্দের ভাব তাহাতে বিভাসিত। একটি নগ্ন বাহু লাল রঙ্গের ঝুলির মধ্যে প্রবিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন—তাহার মধ্যে অঙ্গুলী-মুদ্রার সাধনা চলিতেছে—আর একটি

হস্তের দুইটি অঙ্গুলী দ্বারা একটা সাদা পদ্ম অতি সন্তর্পণে ধৃত। তাঁহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে কিরণচ্ছটা, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, এই মহাত্মা ভাবী পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন—ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হইয়াছেন। পদতলে, ইহাঁর একজন শিষ্য, নবদীক্ষিত ব্যক্তির উপযুক্ত শুভ্রবসন পরিধান করিয়া, ভক্তিভাবে, কৃতাঞ্জলি ও নতজানু হইয়া, ইহাঁর উপদেশ শ্রবণ করিতেছে। এই হরিদ্বর্ণ তালকুঞ্জ-বিরচিত গম্বুজের নীচে বসিয়া এই সাধু না জানি কি গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন! এই সকল উপদেশের কথা উপনিষদে আছে। আজ সায়াহ্নে, উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি ঘাঁটিয়া এই দুইটি ছবির মর্ম্মার্থ বুঝিলাম। প্রথম ছবিটি ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্ত্তি—দ্বিতীয় ছবিটির বিষয়—গুরুশিষ্যের মধ্যে কথোপকথন।

ভূমি অভিমুখে স্বীয় বিশাল ললাট অবনত করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে এই বিজনবাসী সাধু এইরূপ ধ্যান করিতেছেন—

হরিঃ ওঁ! এই জ্যোতি, যাহা এই আকাশকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতেছে—যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ—যাহা উন্নততম লোকে অবস্থিত—যাহার পরে আর কোন লোক নাই—সেই এই জ্যোতি মনুষ্যের আত্মাতেও দীপ্যমান।

সকল পদার্থই ব্রহ্ম। আমি সেই দৃশ্যমান জগৎকে ধ্যান করি, ব্রহ্মে যাহার আরম্ভ, ব্রহ্মে যাহার শেষ, ব্রহ্মেতেই যাহার প্রাণ।

এই জ্ঞান স্বরূপ, আত্মাই যাঁহার দেহ, জ্যোতিই যাঁহার আকার, সত্যই যাঁহার চিন্তা—যাঁহার স্বরূপ আকাশের ন্যায়, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও অদৃশ্য; যাঁহা হইতে সকল কামনা, সকল সুগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে, যিনি সকল পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন, তিনি বাক্য মনের অগম্য।

তিনিই আমার অন্তরাত্মা; তিনি একটি তণ্ডুল হইতে ক্ষুদ্র—একটি সর্ষপ হইতে ক্ষুদ্র—সর্ষপ অভ্যন্তরস্থ বীজ হইতেও ক্ষুদ্র।

তিনিই আমার অন্তরাত্মা—তিনি পৃথিবী হইতে বৃহৎ, আকাশ হইতে বৃহৎ, সমস্ত বিশ্ব হইতে বৃহৎ।

যেমন এক অগ্নি জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত এক হইয়া যায়, যে বস্তুকে দহন করে তদনুসারে আকারের ভিন্নতা হয়, সেইরূপ সকল পদার্থের আধার স্বরূপ এই একমেবাদ্বিতীয়ং যে বস্তুতে প্রবেশ করেন, তদনুসারে আকারের ভিন্নতা হয়—তিনি বাহ্য বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বাহ্য বিষয়ের অতীত।

তিনি একমাত্র প্রভু, সকলের মূলাধার, তিনি একেকে বহু করিয়া প্রকাশ করেন। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় আত্মার মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ—অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

তিনি অনন্ত কাল ধ্যান করিতেছেন, অথচ যাহার ধ্যান করিতেছেন তাহা অনন্ত নহে; তিনি এক হইয়া সকলের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন, তাঁহাদিগেরই নিত্য শান্তি, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

না সূর্য্য তাঁহাতে প্রকাশ পায়—না চন্দ্র—না তারা—তবে তো এই অগ্নি তাহাতে আরও অল্প প্রকাশ পাইবে। তাঁহার প্রকাশে সকলে অনুপ্রকাশিত—তাঁহার আলোকে সকলে আলোকিত হইতেছে।

জগতের পরে—জগৎ অতিক্রম করিয়া অব্যক্ত পদার্থ—অব্যক্তের পরে আর কিছুই নাই। ইহাই শেষ সীমা—ইহাই সকলের অন্ত।

এই পুরুষ সকল পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন—বাহিরে প্রকাশিত হয়েন না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করেন।

এই পুরুষ যাঁহাকে কেহ শ্রবণ করে না, স্পর্শ করে না, আস্বাদন করে না, অনুভব করে না; যিনি নিরাকার অচল, সনাতন, অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার, ইহাঁকে যিনি জানিয়াছেন তিনি মৃত্যু মুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

দেহ সকলের মধ্যে থাকিয়া দেহ হীন, পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের মধ্যে থাকিয়াও অপরিবর্ত্তনীয় ও সর্ব্বব্যাপী—এইরূপ ভাবে যে জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে জানেন, তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত হয়েন।

কিন্তু যে ব্যক্তি প্রশান্ত নহে ও রিপুর বশীভূত—যাহার আত্মা শান্তি লাভ করে নাই, সে কখন ইহাঁকে জানিতে পারিবে না।

তবে, কে জানে তিনি কোথায় থাকেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যাহার ভোজ্য এমন কি, মৃত্যুও যাঁহার খাদ্য।

এইরূপে, এই বিজনবাসী সাধু মুক্তিপথের পথিক হইয়া ধ্যান করিতেছেন, এখনও মুক্তিলাভ করেন নাই—এখনও তাঁহার চিন্তা রহিয়াছে—এখনও তাঁহার মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয় নাই। যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রুদ্ধ হইবে, বুদ্ধি ক্রিয়ারহিত হইবে, তখনই তিনি মুক্ত হইবেন। তখন এই যে সগুণ ব্রহ্ম, ইনি বিকার, পরিবর্ত্তন, মায়া হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সেই নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হইবেন যিনি অসীম—'যিনি কারণও নহেন—কার্য্যও নহেন, ইহাও নহেন, উহাও নহেন—ভূতও নহেন, ভবিষ্যৎও নহেন।" পূর্ব্বে, অবিদ্যার দ্বারা মলিন হইয়া, ইনি এই সকল বাহ্য আবির্ভাবের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে, 'বিশুদ্ধ জলের মধ্যে বিশুদ্ধ জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ সমান ভাবে রহিয়াছেন।'

যেমন সাগরের একটি তরঙ্গ স্বকীয় আকার ও বেগ হারাইয়া সেই ঘোর গভীর স্থির জলরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্য, বাসনাশূন্য, ভাবশূন্য, চিন্তাশূন্য, ব্যক্তিত্বশূন্য হইয়া সেই প্রশান্ত মহান্ সত্তার মধ্যে বিলীন হয়।

এই একই মতবাদ, এই কনক-বর্ণ রঞ্জিত ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি, হরিদ্বর্ণ তাল বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া, স্বীয় নতজানু শিষ্যের নিকট বিবৃত করিতেছেন। নিম্ন লিখিত ইতিহাসটিও আমি প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি—ইহা আমার দ্বিতীয় চিত্রটির টীকা স্বরূপ হইবে।

১। হরিঃ ওঁ! এই সময়ে শ্বেতকেতু অরুণের নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতা উদ্দালক তাঁহাকে বলিলেনঃ—বৎস শ্বেতকেতু, তুমি গুরুসমীপে গমন কর; আমাদের বংশের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে বেদ পাঠ না করিয়া, কেবল বংশমর্য্যাদা অনুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছে।

২। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শিক্ষারম্ভ করিয়া, পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে শ্বেতকেতু, বেদাধ্যয়ন সমাধা করিয়া, কৃতবিদ্য হইয়াছি এইরূপ জ্ঞানে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, তাহার পিতার সমীপে আগমন করিল।

৩। তাহার পিতা তাহাকে কহিল ঃ—শ্বেতকেতু, তুমি গর্ব্বে স্ফীত হইয়াছে, আচ্ছা, বল দেখি, যাঁহাকে কেহ শ্রবণ করে নাই, তাহাকে কিরূপে শোনা যায়; যাঁহাকে কেহ দর্শন করে নাই, তাহাকে কিরূপে দর্শন করা যায়; যাঁহাকে কেহ জ্ঞাত হয় নাই, তাহাকে কিরূপে জানা যায়—এই বিষয়ের জ্ঞান লাভার্থ তুমি কি গুরুর নিকট কখন প্রার্থী হইয়াছিলে?

শ্বেতকেতু বলিল; এই গূঢ় তত্ত্বটি কি প্রভু?

পিতা উত্তর করিলেন :—প্রিয়দর্শন, একখণ্ড মৃত্তিকা দেখিলেই যেমন আমরা মৃত্তিকা নির্ম্মিত তাবৎ বস্তু জানিতে পারি, ইহাও সেইরূপ। নামের দ্বারা বাক্যের দ্বারাই বিচিত্রতা উৎপন্ন হয়—প্রকৃত কথা, এই সমস্ত পদার্থই মৃত্তিকা ..... হে বৎস, এইরূপ উপদেশের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়।

পুত্র বলিল :—নিশ্চয়ই সে পূজ্য ব্যক্তিগণ এ উপদেশের কথা জানেন না—নচেৎ আমাকে কেন সে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন না? পিতঃ, তবে আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিন।

পিতা বলিলেন—তথাস্তু।

অতঃপর, অরণ্য মধ্যে শিষ্য নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইল। ঋষিপতি আচার্য্য ভূমিতলে বদ্ধাসন হইয়া, বামহস্তে সুকুমার মৃণাল ধারণ করিয়া, নিম্ন লিখিতরূপে উপদেশ প্রদান করিলেন :।

৪। হে সৌম্য, যিনি আছেন, একমাত্র তিনিই কেবল ছিলেন—একমাত্র তিনি—একমেবাদ্বিতীয়ং।

অপর ব্যক্তিরা বলেন, যাহা নাই, পূর্ব্বে তাহাই কেবল ছিল—একমাত্র অদ্বিতীয় এবং যাহা নাই, তাহা হইতেই যাহা আছে, উৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু বৎস, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? না, কেবল সৎস্বরূপ প্রথম হইতেই বর্ত্তমান—তিনি একমাত্র, অদ্বিতীয়।

সেই সৎস্বরূপ এইরূপ ধ্যান করিলেন : আমি বহু হই না কেন—আমি আপনাকে প্রসারিত করি না কেন—অমনি তাঁহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল।

অগ্নি ধ্যান করিলেন: আমি বহু হই না কেন—আমি আপ-

নাকে প্রসারিত করি না কেন—অমনি তাহা হইতে জল উৎপন্ন হইল।

এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, শরীর উত্তপ্ত হইলেই তাহা হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়—এই শরীরস্থ জল, শরীরস্থ অগ্নি হইতেই উৎপন্ন।

পরে জল ধ্যান করিলেন—আমি কেন হই না কেন, আপনাকে প্রসারিত করি না কেন—অমনি [illegible] হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইল, সমস্ত সংহত পদার্থ খাদ্য প্রভৃতি [illegible] হইল।

নিম্নলিখিত প্রশ্নখণ্ডে, পিতা এই শিক্ষা দিতে [illegible] অগ্নি, ক্ষিতি ও জলের সংযোগে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় [illegible] বীজও এই সকল পদার্থের [illegible]।

১০। খাদ্যের পরিপাকে [illegible] বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব, এই [illegible] মূল আর কি হইতে পাবে? [illegible] খাদ্য, ইহারাও উৎপন্ন বস্তু অতএব, ইহাদেরও [illegible] জলই ইহাদের মূল। এবং জলের মূল অগ্নি, [illegible] একটি উৎপন্ন পদার্থ ইহার মূল সেই সৎস্বরূপ।

হাঁ, এই সমস্ত পদার্থের মূল [illegible] মনুষ্য ইহলোক হইতে অপসৃত হয় [illegible] তাহার মনের মধ্যে বিলীন হয়, তাহার মন [illegible] মধ্যে বিলীন হয়, তাহার প্রাণবায়ু তেজের মধ্যে বিলীন হয়। উন্নততর সত্তার মধ্যে—সৎস্বরূপে বিলীন হয়।

এই বস্তু, এই সূক্ষ্ম পদার্থ, যাহার মধ্যে সকলের মূল [illegible] ইহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ইনি সত্যস্বরূপ—ইনি পুরুষ, তোমার আত্মা—হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই পুরুষ।

আছে—লক্ষ্মীদেবী—। হায়! বিপদ্‌কালে বান্ধবেরাও ত্যাগ করিয়া যায়!

শীতলা। অমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছ কেন? অমন করে থাক ত ফের কানমলা খাবে!

চন্দ্র। ক্ষুরন্‌কনকপ্রভে, বিষ্ণুলোকে আমার বিস্তর বিলম্ব হইবে না যদি অনুমতি কর ত দাস—

শীতলা। ফের কানমলা খাবে! (কানমলিতে উদ্যত)

(মনসার পুনঃ প্রবেশ। শীতলার সহিত পুনরায় কলহারম্ভ, ষেঁটু, ওলা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সকলের তাঁহাতে যোগদান।)

চন্দ্র। আপনারা তবে ততক্ষণ মিষ্টালাপ করুন, দাস বিষ্ণুলোক অভিমুখে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করে।

(দ্রুতপদে প্রস্থান।)

নিজাম আল্লীর দর্প চূর্ণ।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণের সৌভাগ্যরবি মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত, যখন তাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র ভারত কম্পিত হইতেছিল, এমন কি, হায়দরআলী, টীপু সুলতান ও ইংরাজগণের ন্যায় রণধুরন্ধর দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণও তাঁহাদের দুঃসহ বীর্য্যের নিকট অবনতমস্তক হইয়াছিলেন, তখন হাইদ্রাবাদের অধিবেচক নিজাম মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়-

গণের অবমাননা করত যে সর্ব্বনাশকর ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে "খর্ডার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ।

নিজাম আলীর নিকট হইতে দশ বৎসরের বাকী "চৌথ" বাবতে মহারাষ্ট্রীয়গণের দুই কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল। এই টাকা আদায় করিবার জন্য, মহারাষ্ট্রপতি পেশওয়ে মাধবরাও নারায়ণের আদেশক্রমে তদীয় মন্ত্রী নানা ফর্ণবীস ১৭৯৫ খৃঃ গোবিন্দরাও নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে নিজামের নিকট প্রেরণ করেন। গোবিন্দরাও নিজামের দরবারে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত নম্রতার সহিত নানা ফর্ণবীসের অভিপ্রায় নিজামকে জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে মশীর উল্‌মুল্‌ক নামক নিজামের এক জন অপরিণামদর্শী দৃপ্ত মন্ত্রী অতিশয় রুক্ষভাষায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "অজী গোবিন্দরাও! কোন্ নানা ফর্ণবীস, আউর ক্যা চৌথকী বক্ বক্ লগায়ে হো; হম্ ও সব্ কুছ্ নহি জান্‌তে। তুম্ পুনেসে জাকর নানা বখনকো লে কর নিজাম সাহেবকে দরবারমে আদবীসে হাজির হো; তব সুনেঙ্গে ক্যা তুমারী বক্ বক্ হ্যায়।" কেবল ইহা বলিয়াই মদোদ্ধত মশীর ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সেই সভামধ্যে অভিনেতৃ নটদিগের দ্বারা পেশওয়ে মাধবরাও ও নানা ফর্ণবীসের কার্য্যের বিদ্রূপাত্মক অভিনয় করাইয়া মহারাষ্ট্রপতির উদ্দেশে অশ্রুতপূর্ব্ব অবমাননকর বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

যে মাধবরাওএর ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে বারাণসী হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশীয় ভূপতিগণ সর্ব্বদা কম্পিত হইতেন, সভা মধ্যে এক জন মদোন্মত্ত ধবনের মুখে সেই মহাবলপরাক্রম মাধবরাওএর এইরূপ নিন্দা শ্রবণ ও অবমাননা দর্শন করিয়া

প্রভুভক্ত গোবিন্দরাও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্রুদ্ধ মার্জ্জারের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যদি আমি এই উষ্ণমস্তিষ্ক মন্ত্রীর উল্‌মুল্‌ককে ভিক্ষা পাত্র হস্তে পুনার দ্বারে দ্বারে দীনভাবে ভ্রমণ না করাইতে পারি, তবে আমার নাম গোবিন্দরাও নহে।" এইরূপ ঘোর প্রতিজ্ঞা করিয়া গোবিন্দরাও ক্রোধসন্তপ্তচিত্তে সেই সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনায় আগমন করিলেন।

গোবিন্দরাওএর মুখে এই সকল সংবাদ অবগত হইবামাত্র মাধবরাও ও নানা ফর্ণবীস প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং গোবিন্দরাওএর প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বাবধিই নিজাম ও তদীয় মন্ত্রী মন্সীর উল্‌মুল্‌কের বাহ স্ফুরিত হইতেছিল। তাঁহারা মহারাষ্ট্রপতির যুদ্ধসজ্জার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্সীর উল্‌মুল্‌ক নিজামের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "যদি আমি প্রকৃত মুসলমান হই, তবে পেশওয়াকে সিংহাসনচ্যুত ও তাঁহার হস্তে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিয়া, তাঁহাকে ভস্ম মাখাইয়া ও কৌপীন পরিধান করাইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।" মন্সীরের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে জয়াসক্তচিত্ত নিজাম একলক্ষ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন।

এদিকে পেশওয়ে মাধবরাওএর আদেশপ্রাপ্তিমাত্র সিন্ধিয়া, হোলকর, গায়কওয়াড় (গুইকুমার), ভোঁসলে, রাস্তে, পটবর্দ্ধন, বিঞ্চুরকর, পোরপড়ে নিম্বালকর, যাদব, প্রমার প্রভৃতি বড় বড় সর্দ্দার ও জাইগীরদারগণ এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ

মানসে স্ব স্ব সৈন্যবল সহ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যুদ্ধার্থে পেশওয়ের পতাকাতলে সম্মিলিত হইলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রপতি রাঘবরাও অষ্ট পদাতি সহ ১ লক্ষ ৪০ সহস্র সৈন্য লইয়া পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধনকে সেনাপতি করত নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আহম্মদনগর জেলার অন্তর্গত "খর্ডা" নামক গ্রামের সন্নিকটস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়।

যুদ্ধারম্ভকালে নিজামের সেনা প্রথমতঃ এরূপ পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করে যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ দুইবার বিশৃঙ্খল হইয়া হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়; এবং সেনাপতি পরশুরাম ভাউ গুরুতররূপে আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই মূর্চ্ছিত ও পতিত হন। আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণের এইরূপ বিশৃঙ্খলা দর্শনে সিন্ধিয়া, হোলকর ও ভোঁসলে অগ্রসর হইয়া উৎসাহবাক্যে সৈন্যগণকে রণভূমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতিমধ্যে, পরশুরাম ভাউ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ মুসলমানদিগকে পুনরায় আক্রমণ করিলেন। ভোঁসলে অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; গাস্কওয়াড় ও সিন্ধিয়ার কামান সমূহ গর্জ্জন করিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। মোগলগণও ভীষণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্বয়ং পরশুরাম ভাউ ও সিন্ধিয়া বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তরবারী হস্তে অশ্বারোহণে মোগল সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করত সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্যের শিরচ্ছেদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শত শত মহারাষ্ট্রবীরের উৎসাহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অসংখ্য মোগল সৈন্য তাহাতে আহুতি স্বরূপ পতিত হইল।

মহারাষ্ট্রীয়গণের ফরাসিস্ সেনাপতি পেরন তাঁহার ৩৬টি কামান সহ নিজামের পক্ষীয় রেমন্তের অধীনস্থ ইউরোপীয় সৈন্যগণকে

আক্রমণ করিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে মহারাষ্ট্রপতির সৈন্যগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যগণকে ভীষণভাবে আক্রান্ত দেখিয়া নিজাম সাহেবের চিত্তে ভীতির সঞ্চার হইল। এমন সময়ে সুচতুর সিন্ধিয়া নিজাম সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া ৫টি গোলা বর্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে নিজাম ভীতিবিহ্বল-চিত্তে সহসা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। সুতরাং তাঁহার সৈন্যগণও পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সমরবিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন, লুণ্ঠন ও বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এই যুদ্ধে মোগলগণের দুই শত সেনানী ও উভয় পক্ষে প্রায় ১০। ১৫ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইল।

এদিকে নিজাম সাহেব অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ খর্ডার নিকটবর্ত্তী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ উক্ত দুর্গ অবরোধ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না। দুই দিবস দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া তৃতীয় দিবসে নিজাম সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কারণ অন্ন জলের অভাবে নিজাম সাহেব ও তাঁহার কণ্ঠমণি মশীর উলমুলক অতিশয় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। এবং যে মশীর মাধবরাওকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দিয়া সন্ন্যাসীবেশে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনিই এখন অন্নাভাবে ব্যাকুল ও ম্রিয়মাণ হইয়া মাধবরাওএর নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে বাধ্য হইলেন।

অবশেষে নিজাম আলীর প্রার্থনামতে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে (১) গোবিন্দরাওএর প্রতিজ্ঞাপূরণ করিবার জন্য মহারাষ্ট্রপতির অবমাননকারী গর্ব্বিত মশীর উলমুলক্ মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে সমর্পিত হইলেন। এবং (২) মহারাষ্ট্রীয়গণ নিজামের নিকট নগদ ৩০০০০০০০ তিন কোটি টাকা ও তাঁহার রাজ্যের

কিয়দংশ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া জয়োল্লসিত-চিত্তে পুনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবং নিজাম সাহেব তাঁহার প্রিয়সুহৃদ মশীরউল্‌মুল্‌ককে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়া সাশ্রুনয়নে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। (১)

ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ।

বৃষ্টির জল ভূতলে আসিয়া পড়িলে তাহার কিয়দংশ মাটিতে শুষিয়া লয়, কিয়দংশ বাতাসে উবিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ জলস্রোত এবং নদী আকারে ভূমিতল হইতে গড়াইয়া পড়ে।

মাটি যদি তেমন কঠিন হয় তবে অনেকটা জল উপরে থাকিয়া গিয়া বিল, জলা প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

যে জল মাটির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মৃত্তিকা-শোষিত জলের কিছু অংশ ঘাস এবং গাছের শিকড় টানিয়া লয় এবং সেই রস পাতার মধ্য দিয়া বাষ্প আকারে উবিয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ জল ছিদ্র এবং ফাটলের মধ্য দিয়া নিম্ন স্তরে সঞ্চিত হয় এবং স্তর যদি ঢালু হয় তবে সেই ভূমধ্যস্থ জলও তদনুসারে গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

মৃত্তিকাস্তর ছিদ্রবহুল হইলে উপরিস্থ জলস্রোত কিরূপ অন্তর্দ্ধান করে তাহা কুপ প্রভৃতি অন্তঃসলিলা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়।

(১) প্রবন্ধটি প্রথমতঃ কোনও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশের মানসে এত সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল। এই বিবরণের সহিত আমরা পাঠকদিগকে একবার "বোম্বাই চিত্র" গ্রন্থের ৩৭৮। ৭৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিবরণ মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বিশেষের হ্রাসবৃদ্ধির যোগ আছে। পেটেন্‌কোফার সাহেব বলেন ভূতল যত উপরে উঠে টাইফয়েড্ জ্বর ততই বিস্তার লাভ করে। তাঁহার মতে, ভূমির আর্দ্রতা রোগবীজপালনের সহায়তা করে বলিয়াই এরূপ ঘটে।

কোন কোন পণ্ডিত অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন ভূগর্ভস্থ জল ভূতলের অনতিনিম্নে পর্য্যন্ত যখন উঠে তখন মৃত্তিকার অবশেষ আবর্জ্জনার সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পারে। কিরূপে মিশ্রিত হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। পল্লিগ্রামে যেখানে সহরের মত পয়ঃপ্রণালীর পাকা বন্দোবস্ত নাই সেখানে অনেক স্থলে কুণ্ডের মধ্যে মলিন পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর যখন নামিয়া যায় তখন এই সকল দূষিত পদার্থের সহিত তাহার তেমন যোগ থাকে না—যখন উপরে উঠে তখন মলনিশ্রিত মৃত্তিকার সহিত জলের সংযোগ হইতে পারে এবং সেই জল রোগবীজ ও দূষিত পদার্থ সকল বহন করিয়া কূপ ও সরোবরকে কলুষিত করিয়া ফেলে।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে বিস্তর সতর্কতার আবশ্যক। কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া জলাশয়ের জল মলিন করিতে না দিলেও অদূরবর্ত্তী আবর্জ্জনা প্রভৃতির মলিনতা জল মধ্যে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই মলিনতা অনেক সময় দূরের জলাশয়কে স্পর্শ করে অথচ নিকটের জলাশয়কে অব্যাহতি দেয় এমন দেখা গিয়াছে। তাহার একটি কারণ আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভূগর্ভস্থ জল সমুদ্র অথবা অন্য কোন নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের অভিমুখে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। আবর্জ্জনাকুণ্ডের উজানে যে কূপ প্রভৃতি থাকে

পৃথিবীর উপরকার জল ক্রমে মাটির ভিতরে কত নীচে পর্য্যন্ত চুঁইয়া পড়ে এবং কেন বা একস্থানে আসিয়া বাঁধা পায় এখনও তাহার ভালরূপ তথ্য নির্ণয় হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভূতলের নিম্নস্তরে কিছুদূর নামিয়া আসিলেই একটি সম্পূর্ণ জলাবিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছান যায়; সেখানে মৃত্তিকার প্রত্যেক ছিদ্র বায়ুর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র জলে পরিপূর্ণ।

যেমন সমুদ্রের জল সর্ব্বত্রই সমতল তেমনি মাটির নীচের জলেরও একটা সমতলতা আছে। কোন বিশেষ প্রদেশের ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা কি, তাহা সেদেশের কূপের জলতল দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে।

এই জল অবিশ্রাম মন্দগতিতে সমুদ্র অথবা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং ঋতুবিশেষে এই জলতল কখন উপরে উঠে কখন নীচে নামিয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই ভূগর্ভস্থ জলস্তরের উচ্চতা পরিমিত হয়। জল জায়গায় হয়ত কয়েক ফুট নীচেই এই জলতল পাওয়া যায়, আবার কোন কোন জায়গায় বহুশত হাত নিম্নে এই জলস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রদেশে ভূতলের যত নিম্নে জলধারণযোগ্য অভেদ্য মৃত্তিকাস্তর আছে সে প্রদেশে ভূগর্ভস্থ জলতল সেই পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই ভূগর্ভস্থ সর্ব্বব্যাপী জলপ্রবাহ মানুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কূপ সরোবর উৎস প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই জলই পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের তৃষা নিবারণ করে—এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থেও ইহার নিত্য যোগ আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঋতুবিশেষে এই ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা উঠিয়া নামিয়া থাকে। এবং এই উঠা নামার সহিত রোগ

দেখা গিয়াছে আষাঢ় শ্রাবণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর কার্ব্বনিক অ্যাসি- পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, এবং মাঘ ফাল্গুনে সর্ব্বাপে কমিয়া যায়।

সাধারণতঃ ইহাও দেখা গিয়াছে, যে, আল্‌গা ভাঙ্গা মা কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ অল্প এবং যে শক্ত মাটিতে সহজে বায়ু প্র করিতে পারে না তাহাতে কার্ব্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ অ চষা জমি অপেক্ষা পতিত জমিতে কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ চতু অধিক। ইহার কারণ, যে মাটির মধ্যে বায়ু বদ্ধ হইয়া তাহাতে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ অধিক সঞ্চিত হয়।

ভূগর্ভস্থ জলের ন্যায় ভূগর্ভস্থ বায়ুরও একটা স্রোত তাহা পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়া গেছে। এই বায়ুচলাচলের আমাদের স্বাস্থ্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। কারণ, গিয়াছে এই বায়ুতে বহুল পরিমাণে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ অন্যান্য দূষিত গ্যাস আছে। তাহা ছাড়া, মাটির ভিতর রোগ-বীজ এই বায়ুপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দিকে স হইতে পারে।

নানা কারণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর প্রবাহ রক্ষিত হইয়া থাকে। লের উপরিস্থ বায়ু-চলাচল তাহার একটা কারণ।

আরও কারণ আছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে যখন ধারে বৃষ্টি পতিত হয় তখন সেই বৃষ্টিজল ভূগর্ভস্থ বায়ুকে অনেকটা নীচের দিকে লইয়া যায় এবং সিক্তভূমি হইতে হইয়া শুষ্কভূমি দিয়া বায়ুপ্রবাহ উপরে উঠিতে থাকে। বাড়ির মেজে ভাল করিয়া বাঁধান নহে বর্ষার সময় ভূগর্ভ বা মেজে দিয়া বাহির হইবার সুবিধা পায়। কোন কোন স্থলে রেরা দেখিয়াছেন বহুকাল অনাবৃষ্টি-অন্তে বৃষ্টিপতনের পর

মোনিয়া কাশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহার একটি কারণ
রূপ অনুমান করা যায়, যে, বৃষ্টিতাড়িত ভূগর্ভবায়ু রোগ-
সঙ্গে লইয়া নানা শুষ্ক স্থান দিয়া উপরে উঠিতে থাকে।
পূর্ব্বে বলিয়াছি, পেটেন্‌কোফারের মতে, যখন ভূগর্ভস্থ জলতল
রে উঠিতে থাকে তখন সেই জলসংযোগে কোন কোন রোগের
হয়। রোগবীজের উপর জলের ক্রিয়াই যে তাহার একমাত্র
ণ তাহা নহে। জলতল যত উপরে উঠে ভূগর্ভের বায়ুকেও সে
ঠেলিয়া তুলিতে থাকে—এবং সেই বায়ুর সঙ্গে অনেক দূষিত
প এবং রোগবীজ উঠিয়া পড়ে।

ভূগর্ভে বায়ুচলাচলের আর একটি বৃহৎ কারণ আছে। তাহা,
কাশ-বায়ু এবং ভূগর্ভ-বায়ুর উত্তাপের অসাম্য। তাহার বিস্তৃত
লোচনা আবশ্যক।

াটি নানা প্রকৃতির আছে এবং সকল মাটি সমান সহজে উত্তপ্ত
। কিন্তু জল সকল মাটি অপেক্ষাই বিলম্বে উত্তাপ গ্রহণ

জিনিষ সহজে উত্তাপ গ্রহণ করে সে জিনিষ সহজে উত্তাপ
করে। এই কারণে, জল মাটি অপেক্ষা বিলম্বে উত্তপ্ত হয়
উত্তাপ ছাড়িতেও বিলম্ব করে। ভিজা স্যাঁৎসেঁতে মাটি
ত্তাপ সহজে গ্রহণ করে না, তেমনি, সহজে ত্যাগও করে না,
বলে মাটি শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে আবার শীঘ্রই জুড়াইয়া

মির উত্তাপের ফল কেবল যে ভূমিতেই পর্য্যবসান হয় তাহা
আকাশের বায়ুতাপের প্রতিও তাহার প্রভাব আছে।
তঃ উক্ত হয় যে, শুষ্ক বায়ু বিকীরিত উত্তাপকে সহজে পথ
এবং ভিজাবায়ু সেই উত্তাপ বহুল পরিমাণে শোষণ

করিয়া রয়। [illegible] বাতাস প্রকৃতির কোনও [illegible] দেখা না, এই [illegible] সূর্য্যোত্তাপ এবং পৃথিবী হইতে বিকীর্ণ উত্তাপের [illegible] পরীক্ষা দ্বারা যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় বাতাসের তাপ অব্যবহিত সূর্য্যতাপের অপেক্ষা ভূমির তাপের দ্বারাই অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। শুষ্ক ভূমি সংস্পর্শে প্রথমতঃ বায়ুর নিম্নতন স্তর উত্তপ্ত হইয়া বিস্তার লাভ করে এবং উপরে উঠিয়া যায়, উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু নামিয়া ভূমির তাপ গ্রহণ করে, এমনি করিয়া সমস্ত বায়ু গরম হইয়া উঠে। সকলেই জানেন বন উচ্চ অঞ্চলের বায়ু পৃথিবীবর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শীতল।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে মাটির তাপ এবং বাতাসের তাপ সমান নহে। এবং সাধারণতঃ মাটির তাপই অধিক।

মাটি ভাল তাপ-পরিচালক নহে, এইজন্য মাটির উপর উত্তাপ নিম্নতলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। এইকারণেই [illegible] ভূতল যখন উষ্ণ হইয়া উঠে তখন নিম্নস্তর অপেক্ষা উপর থাকে এবং শীতকালে যখন ভূতলের তাপহানি হয় তখন সেই নিম্নস্তরে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; এই জন্য শীতকালে ভূতলের মাটির অপেক্ষা নিম্নতলের মাটি বেশি গরম থাকে। চীনে বলে আছে, যে, কূপোদক শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মে শীতল হইয়া থাকে। পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুসারে ইহার কারণ কঠিন নহে।

গ্রীষ্মকালে ভূতল ভূগর্ভ হইতে অধিক দূর উত্তপ্ত হওয়া তাহার উপরিস্তরবর্ত্তী বায়ু নিম্নস্তরের অভিমুখে প্রবেশ করিতে [illegible] এবং শীতকালে তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। [illegible] শীতকালে অত্যন্ত গরম করা যায় এবং [illegible] যদি উপ[illegible]

বিবর্ত্তনের আবশ্যক হইত, এবং সমস্ত দেবতার আবরণকে অসহ্য শূল বেদনা অমর হইয়া বাস করিত।

ইন্দ্র। হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, উক্ত ঘৃতের গুণাগুণ আমার অনিদিত নাই, যেহেতু যমরাজের নিকট সর্ব্বদাই তাহার বিবরণ শুনিতে পাই। অতএব হব্য পদার্থে আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, এবং হোমাগ্নির অবনতি সম্বন্ধেও অধুনা আক্ষেপ করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ উত্থিত হয় তেমনি মর্ত্ত্যের ভক্তি হইতেই স্বর্গ ভূর্লোকে উদ্বাহিত হইয়া থাকে। সেই ভক্তিপুষ্প যদি শুষ্ক হইয়া যায় তবে, হে দিবসত্তম, তেত্রিশ কোটি দেবতাও আমার এই পারিজাতমোদিত, নন্দন-বেষ্টিত স্বর্গলোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কারণে, মর্ত্ত্যের সহিত যোগ প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নরলোকের স্বনির্বাচিত দেবতাগুলিকে সাহসে স্বর্গে আবাহন করিয়া আনিতে হয়। হে চিরকালজ্ঞ, স্বর্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি। সেই বাহন, যে সমস্ত ইতিহাস আমার অগোচর নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সকল নূতন দেবতা মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অভিজাত দেবগণের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। এপ্রতি বেটু প্রসব্‌ যে সমস্ত দেবতাগণ তোমার নিমন্ত্রণে স্বর্গে আসিবা আশ্রয় লইয়াছেন তাহারা স্বর্গসভার দিব্যজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। অদিতিনন্দন, আমার প্রস্তাব এই যে, তাঁহাদের জন্য একটি উপদেবলোক সৃজন করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রতি বিশেষ ভার অর্পণ করা হয়।

ইন্দ্র। বুধপ্রবর, তাহা হইলে সেই উপস্বর্গই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং স্বর্গ উপসর্গ হইবে মাত্র। একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। জর্ম্মন দেশীয় পণ্ডিতগণের বহুল

চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্ত্র এবং তাহার অর্থ সকলে বিস্মৃত হইয়া আছি-য়াছে। কিন্তু আমাদের নূতন আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্য্যের ভাষ্য, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব অথবা তাঁহা-দের প্রাচ্যশিষ্যবর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিতেছেন না, তাঁহারা প্রতিদিনের সদ্য আহরিত পূজা প্রাপ্ত হইয়া উপবাসী পুরাতন দেবতাদের অপেক্ষা অনেকগুণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে পাইলে আমরা নূতন বললাভ করিতে পারিব। অতএব, গুরুদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কণ্ঠে মেঘমালা অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে বরণ করিয়া লউন্!

বৃহস্পতি। অহো দুর্ব্বৃত্ত নিঋতি! মর্ত্ত্যলোকের প্রসাদ লাভ-সালসায় কত পুরাতন দেবকুলপ্রদীপ ক্রমশঃ আপন দেবত্ব্যাদা-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীবসন লম্বকচ্ছে কামিনীমনোমোহন নির্লজ্জ নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। গম্ভীর প্রকৃতি গণপতি কদলীতরুর সহিত গোপন পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকা প্রভৃতি সিদ্ধিপানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচজাতীয় স্ত্রীপল্লিমধ্যে আপন বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। সে সমস্তই যখন একে একে সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন, বোধ করি, দেবাসনে উপদেবতাগণের অধিরোহণদৃশ্যও এই বৃদ্ধব্রাহ্মণের ধৈর্য্যকঠিন বক্ষ-স্থল বিদীর্ণ করিতে পারিবে না!

চন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ভগবন্ উড়ুপতে! স্বর্গলোকে ত কৃষ্ণপক্ষের প্রভাব নাই তবে অদ্য কেন তোমার সৌম্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখচ্ছবি অন্ধকার দেখিতেছি?

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ থাকিলে অমাবস্যার ছায়ায় আমি আনন্দে আত্মগোপন করিতে পারিতাম। দেবরাজ, দেবী শীতলার প্রসন্নদৃষ্টি হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান কর। তিনি স্বর্গে পদার্পণ করিয়া অবধি আমার প্রতি যে-বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, আমি একাকী তাহার যোগ্য নহি। তাঁহার সেই প্রচুর অনুগ্রহ দেবসাধারণের মধ্যে সমভাগে বিন্যস্ত হইলে কাহারও প্রতি অন্যায় হয় না।

ইন্দ্র। সুধাংশুশালিন্, সুহৃদ্‌গণের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিলে অধিকাংশ আনন্দই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই কিন্তু রমণীর অনুগ্রহ সে জাতীয় নহে।

চন্দ্র। ভগবন্, তবে সে আনন্দ তুমিই সম্পূর্ণ গ্রহণ কর? তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, এ সুখাবেগ তুমি ব্যতীত আর কেহ একাকী সম্বরণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র। প্রিয়সখে, অন্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা বন্ধুকে দান করা কঠিন নহে; কিন্তু প্রেম সেরূপ সামগ্রী নহে; তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তুমি অনাদরে ফেলিয়া দিতে পার কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর অত্যাশ্চর্য্য স্মরণ করিবার জন্যও তাহা দান করিতে পারনা।

চন্দ্র। যদি ফেলিয়া দিতে পারিতাম, তবে, বিশ্বম্ভরভাবে তোমার দ্বারস্থ হইতাম না। সুরপতে অনেক সৌভাগ্য আছে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেও নিকটে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। শশলাঞ্ছন, তুমি কি অপযশের ভয় করিতেছ?

চন্দ্র। সখে, সত্য বলিতেছি কলঙ্কের ভয় আমার নাই।

ইন্দ্র। কলানাথ, তবে কি তুমি তোমার অন্তঃপুরলক্ষ্মী প্রিয়তমার অসূয়া আশঙ্কা করিতেছ?

চন্দ্র। সখে, তোমার অবিদিত নাই, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রনারী

সইয়া আমার অন্তঃপুর। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এপর্য্যন্ত নক্ষত্রলোকে কোনরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সপ্তবিংশতির উপর আর একটি যোগ করিতে আমি ভীত নহি।

ইন্দ্র। সখে, ধন্য তোমার সাহস! তবে তোমার ভয় কিসের?

ঔষধব্যস্ত হইয়া দেবদূতের প্রবেশ।

দূত। ত্রৈলোক্যেশ্বর দেবরাজ, বাণী বীণাপাণি স্বর্গপরিত্যাগের কল্পনা করিতেছেন।

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে) কেন? দেবগণ তাঁহার নিকট কি কারণে অপরাধী হইয়াছে?

দূত। মনসা শীতলা মঙ্গলচণ্ডী নাম্নী দেবীগণ সরস্বতীর কমলবনে চিঙ্গটি নামক কর্দ্দমচর ক্ষুদ্রকীটের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য্য না হইয়া কমল কর্ণিকায় অঙ্গপ্রক্ষালন করিয়া তিন্তিড়ি সংযোগে কটুতৈলে অম্লব্যঞ্জন রন্ধন পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছেন, এবং পিত্তলস্থানীয় সরোবরের জলে মার্জ্জন পূর্ব্বক কিসিয়া আসিয়াছেন। এপর্য্যন্ত মানসসরোবরের পদ্মকলিকা দেব দানব কেহই ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে নাই। (দেবগণের পরস্পর মুখাবলোকন।)

ঘেঁটু মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া) দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত? আপনাদের কুশল? স্বর্গলোকে আপনাদের কোনরূপ অভাব নাই? অনুচরগণ সমাহিত হইয়া সর্ব্বদা আপনাদের আদেশপাল-

পুত্র বলিল—অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। পিতা বলিলেনঃ তথাস্তু।

১১। নদী সকল গঙ্গার ন্যায় কেহ বা পূর্ব্ববাহিনী, ও সিন্ধুর ন্যায় কেহবা পশ্চিমবাহিনী।

উহারা সমুদ্র হইতে সমুদ্রেই গমন করে (সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া নদীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়) উহারা সত্যসত্যই সমুদ্রে পরিণত হয়। নদীরা সমুদ্র মধ্যে নিশিয়া গিয়া এ কথা আর বলিতে পারে না—"আমি এই নদী"—"আমি ঐ নদী"। সেইরূপ হে বৎস, সমস্ত জীব যখন সেই সত্যস্বরূপ হইতে উৎপন্ন হয়, তখন তাহারা জানে না যে তাহারা সত্যস্বরূপ হইতে উৎপন্ন।

এই বস্তু, এই সূক্ষ্ম পদার্থ, ইহারই মধ্যে সমস্ত সত্তা নিহিত। ইনি সত্য স্বরূপ, ইনি স্বতন্ত্র পুরুষ এবং হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই পুরুষ।

পুত্র বলিলঃ—আরও কিছু উপদেশ করুন।

পিতা কহিলেন—তথাস্তু।

১২। কতকগুলি দস্যু কোন এক ব্যক্তিকে তাহার দেশ হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহার চোখ বাঁধিয়া বিপদসঙ্কুল ভীষণ এক অরণ্যের মধ্যে তাহাকে লইয়া গেল। কোথায় সে আসিয়াছে জানিতে না পারায় সে কাঁদিতে লাগিল। এই সময়ে একজন পথিক তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিল ও তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিল। দেশে গিয়া সে সুখী হইল।

সেই সৎস্বরূপ, মহানপুরুষ, জগতের রাজাই আমাদের স্বদেশ। তিনটি উপাদানে এই শরীর নির্ম্মিত; অগ্নি, জল, পৃথিবী—এই শরীর শৈত্য ও তাপের অধীন—এই শরীররূপ অরণ্যের মধ্যে আমরা পথ

হারাইয়াছি। এবং এই বন্ধন যাহা আমাদের নেত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে—উহা আমাদের বিষয় বাসনা—স্ত্রী পুত্র পশু লাভের কামনা—এবং যে দস্যুরা আমাদিগকে এই দেহ অরণ্যের মধ্যে আনিয়াছে, উহারা আমাদের কর্ম্ম।

তখন আমরা ক্রন্দন করিয়া এইরূপ বলিতে থাকিঃ—আমি অমুকের পুত্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি নির্ব্বোধ, আমি জ্ঞান-পরায়ণ, আমি জ্ঞাত, আমি মৃত। এই সকল বন্ধন আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কখন কখন এমন ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যিনি পরমাত্মাকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তিনি আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া এইরূপ শিক্ষা দেন যে, আমরা অমুকের পুত্র নহি, আমরা সুখী নহি, দুঃখী নহি, নির্ব্বোধ নহি, জ্ঞানী নহি, মৃত ও নহি—পরন্তু আমরা তাহাই যাহা একমাত্র সৎস্বরূপ।

এই বস্তু, এই সূক্ষ্ম পদার্থ—ইহাতেই সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে। ইনি পুরুষ, ইনি সত্যস্বরূপ—ইনি স্বয়ং তুমি—হে শ্বেতকেতু তুমিই সেই পুরুষ।

পিতার উপদেশ বাক্য শ্বেতকেতুর হৃদয়ঙ্গম হইল। এবং সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষ—যিনি সকল বীজকে সঞ্জীব করেন, যাঁহাতে সমস্ত পদার্থ মুক্ত এবং বিমুক্ত, সেই পরমারাধ্য মঙ্গলদাতা প্রভুকে জ্ঞাত হইয়া শ্বেতকেতু চিরশান্তি লাভ করিল।

স্বরলিপি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

আমারে কর তোমার বীণা
লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি
মোহন অঙ্গুলে।
কোমল তব কমল-করে
পরশ করুণ-প্রাণ পরে
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া
তব শ্রবণমূলে।
কখনো সুখে কখনো দুখে
কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে
চরণে পড়ি রবে নীরবে
রহিবে বনে ভুলে।
কেহ না জানে কি মরতানে
উঠিবে গীত শূন্যপানে
আনন্দের বারতা যাবে
অনন্তের কূলে।

৩।২

॥ পা ধা পা। পা সা ঞা ঞধা। পা ধা -া -া। পমা গমা -গা।
॥ আ মা রে। ক র তো। মা — —। র বী —।

। মা -পা -া। -া -া -া। মা গা গা। মা ধা পা।
। পা — —। — — —। ল হ গো। ল তু।

। ধা -ন -ন। -ন -ন -ঞা। পধা -ঞা -ন। -ন -ন -ধা ॥
। লে — —। — — —। — — —। — — — ॥

। পা না র্সা। -ন না ঋা। র্সা -না র্সর্সা -ন ঞা ঞধা।
। উ ঠি বে। — বা জি। ত — লী। — রা জি।

। ঞা ঞা ঞধা। পা -ধা পা। ধা -ন -ন। -পধঞা -ন -ধা ॥
। মো হ ন। আ — ড়ু। লে — —। — — — ॥

। মা মা ঞা। -ঋা ধা না। র্সা র্সা র্রা। -র্সা না র্সা।
। কো ম ল। — ভ ব। ন ন ল। — ক রে।

। র্সা ঞা ধা। -ধা ধা। -ঋা ধা ঞা। -ঃপঃ পা ধপা।
। প র শ। — কে র। প রা ণ। — প রে।

। গা -মা গা। -ঋা গা মা। -পা -ধা না। -র্সা না র্সা।
। উ ঠি বে। — হি মা। ঞ্জ — ঞ্জ। — রি মা।

। না র্সা না। র্সা না র্রা। র্সর্সা ঞর্সঞা -ন। -ধা -ন -ঞধা ॥
। ত ব প্র। ব ণ মু। খে — —। — — — ॥

। সা মা মা। -ন মা মা। মা পা পা। -ধপা মা গা।
। ক থ নো। — স্থ থে। কে থ নো। — ছ থে।

। মা ধা পা। -ন মা গা। মা ধা ধা। -না না র্সা।
। বী দি মা। — চা বে। তো মা র। — মু খে।

। না না না। -ন র্সা র্সা। না র্সা র্সা। -ঞা ঞা ধা।
। চ ন্দ্র লো। — প ড়ি। র বে নী। — ব বে।

। ঞা এরা পা। -া গা মা। -া -ধা না। -র্সা -া -া।
। ম্ হি বে। — ব বে। ভু — লে। — — —।

। মা মা মা -ঞা -ধা না। না র্সা র্সা। র্সর্সা -া র্সা।
। কে হ্ না। জা — নে না কি ন ব। তা — নে।

। না র্সা র্সা। র্সা -র্সা -র্সা। না র্সর্সা র্সা। ঞ্সঞা -ধা ঞা।
। উ ঠি বে। গী — ত। শু — নি। পা — নে।

। র্সা র্সা -র্সা। র্সা -। র্সা। র্সা র্সা। র্সা -র্সা র্সা র্সা।
। আ ন —। মো — হ। ন ন ভা ঙ্গি বে।

। না র্সা -া। না র্সা র্সা। না র্সা র্সা। ঞা -ধা পা॥
। অ ন —। ন্ত — র্। কু — লে। — — —॥

ব্যাখ্যা।

১। ঃ অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন। যথা, ঞা ঃ ধা এই দৃষ্টান্তে ঞা ঃ একমাত্রা এবং ধঃ অর্দ্ধমাত্রা কালস্থায়ী। সব শুদ্ধ মিলিয়া দুই মাত্রা।

২। ঞ=ঞোমল ন; ধ=ধৈবত ম।

স্বর্গীয় প্রহসন।

ইন্দ্রসভা।

বৃহস্পতি। হে সৌম্য, তেত্রিশকোটি দেবতাতেও কি ইন্দ্রলোক পূর্ণ হয় নাই? আরও কি নূতন দেবতা আমন্ত্রণের আবশ্যক আছে? হে প্রিয়দর্শন, স্মরণ রাখিয়ো, জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা

মর্ত্ত্যলোকে লোকসংখ্যা নিয়মশাসনে থাকে, কিন্তু স্বর্গলোকে মৃত্যুর অভাবে দেবসংখ্যা হ্রাস করিবার কোন উপায় নাই; অতএব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র। হে সুরগুরো, স্বর্গের পথ দুর্গম করিবার জন্য স্বর্গাধিপতির চেষ্টার ত্রুটি নাই এ কথা সর্ব্বজনবিদিত।

বৃহস্পতি। পাকশাসন নাকপতে, তবে কেন অধুনা দেবলোকে মনসা-শীতলা ঘেঁটু নামধারী অজ্ঞাতকুলশীল নব নব দেবতার অভিষেক হইতেছে?

ইন্দ্র। দ্বিজোত্তম, আমরা দেবতাগণ ত্রিভুবনের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে কেবল ত্রিভুবনের সম্মতিক্রমে। এ কথা গুরুদেবের অগোচর নাই, যে, মর্ত্ত্যলোকেই দেবতাদের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। এককালে আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত ব্রাহ্মণ হোতাগণ আমাকেই স্বর্গের প্রধান পদ দিয়াছিলেন এবং তৎকালে সরস্বতী দৃষদ্বতী তীরের প্রত্যেক যজ্ঞ হুতাশনে আমার উদ্দেশে অহরহ যে হবি সমর্পিত হইত তাহার হোমধূমে আমার সহস্রলোচন হইতে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হইত। অদ্য নরলোকে হবি ঘৃত কেবল মাত্র জঠরযজ্ঞে ক্ষুধাসুরের উদ্দেশেই উপহৃত হইয়া থাকে এবং শুনিতে পাই সে ঘৃতও বিশুদ্ধ নহে।

বৃহস্পতি। বৃত্র নিসূদন, সেই অপবিত্র বিমিশ্র ঘৃতপানে, শুনিতে পাই, ক্ষুধাসুর মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। হে শক্র, দেবতাদের প্রতি দেবদেবের বিশেষ কৃপা আছে সেই জন্যই নরলোকে হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, নতুবা, নব্য গব্য পরিপাক করিতে হইলে, হে পাকশাসন, দেব জঠরের সমস্ত অমৃতরস সুতীব্র অম্লরসে পরিণত হইত, অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি এবং বায়ুদেবের বায়ু-

নের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ নৃত্যশালায় নৃত্য-গীতাদির দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন করে? কামধেনুর দুগ্ধ এবং অমৃতভরিত যথাকালে আপনাদের সম্মুখে আহরিত হইয়া থাকে? নন্দনবনের সুগন্ধ সমীরণ আপনাদের ইচ্ছানুগামী হইয়া বাতায়ন-পথে প্রবাহিত হইতে থাকে? আপনাদের লতানিকুঞ্জে পারিজাত সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিয়া শোভাদান করে?

(দেবীগণের উচ্চহাস্য)

মনসা। (ঘেঁটুর প্রতি) মিন্‌সে কি বক্‌চে ভাই?

ঘেঁটু। গুরুৎঠাকুরের মুত যন্তর পড়ে যাচ্চে। (ইন্দ্রের প্রতি) ওহে, তুমি বুঝি কর্ত্তা! তোমার মন্তর পড়া হয়ে গিয়েছে থাক্কে ত গোটাকতক কথা বলি।

ইন্দ্র। হে ঘেঁটো! আপনকার—

ঘেঁটু। ঘেঁটো কি! আমি তোমার বাগানের মালী? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ ত দেখিনি। গা! ঘেঁটো! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে' ইন্দিরে বলি।

মনসা। তা হলেই চিত্তিরে হয়! (দেবীগণের উচ্চ হাস্য)

ইন্দ্র। (হাস্যে যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়া) কুলাভিমানি, বহু তপস্যার দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ সুকৃতি ফলে আপনকার সকলের স্মিতদর্শনমুখে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্র আলোকিত হইয়া উঠিল এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না!

ঘেঁটু। আরে রাখ, ও সব বাজে কথা রাখ। তোমার পেয়াদা গুলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে কলে-কি সব এনে দেয় সে আমি ছুঁতে পারিনে। তোমার পচী গিন্নিকে বলো দিকি আমার জন্যে রোজ এক থাল গোবরের লাড়ু তৈরি করে পাঠিয়ে দেন!

ইন্দ্র। তথাস্তু। স্বর্গে আমাদের কল্পধেনু আছেন। তিনি সকলের সকল কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন। যোগ কবি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য না হইতে পারে!

শীতলা। (চন্দ্রকে এক কোণে গুপ্তপ্রায় দেখিয়া নিকটে গিয়া) মাইরি! তুমি এত ভণ্ড জান ভাই! আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যাহোক্! আমি বলি, তুমি বুঝি অন্দর মহলে আছ। ঢুকে দেখি, অশেষা সুরা মঘা নবাবপুত্রীর মত বসে আছেন—আমাকে দেখে অবাক হয়ে রইলেন। আমার সহ্য হল না। আমি বল্লুম, বলি, ও বড়মানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না! যা বল্‌তে হয় তা বলেছি! ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্র। (জনান্তিকে ইন্দ্রের প্রতি) সপ্তবিংশতির উপর অষ্টবিংশতিতম যোগ হইলে কিরূপ দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা, হে শচীপতে, সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। (শীতলার প্রতি) অয়ি অনবদ্যে,—

শীতলা। (হাসিয়া অস্থির হইয়া) মা গো মা, তুমি এত হাসাতেও পার! আমার কবে বেল নামটি দিয়েছ যাহোক্! ভাল বদ্যি! কিন্তু বদ্যিতে করবে কি ভাই! কত বঙ্গিব সাতপুরুষকে আমি সতিষাটের জল খাইয়ে এসেছি—আমি কি তেমনি মেয়ে!

ঘেঁটু। (ইন্দ্রের গায়ের কাছে গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া) কি গো, ইন্দির দা! মুখে যে রা'টি নেই। রেতের বেলা গিন্নির সঙ্গে বকাবকি চুলোচুলি হয়ে গেছে না কি?

ইন্দ্র। (সসঙ্কোচে সরিয়া গিয়া দূরস্থ আসন নির্দ্দেশপূর্ব্বক) দেব, আসনগ্রহণে অনুমতি হোক!

ঘেঁটু। এই যে এখানে ঢের জায়গা আছে! (ইন্দ্রের সহিত

একাসনে উপবেশন)-দাদা, আমার সঙ্গে তুমি নৌকোতা কোরো না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোট ভাই ঘেঁটু। (বাহুদ্বারা ইন্দ্রের গলবেষ্টন এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক অব্যক্ত কাতর ধ্বনি উচ্চারণ)

শীতলা। (চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও কোথায়!

চন্দ্র। মনোজ্ঞে, অদ্য অন্তঃপুরে দেবীগণ ভর্ত্তৃপ্রসাদন ব্রতে তাঁহাদের এই সেবকাধমকে স্মরণ করিয়াছেন—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে, হে হরিণশালীন বদনে—

শীতলা। কি বল্লে? শালী? তা ভাই তাই সই! তোমার চাঁদমুখে সবই মিষ্টি লাগে। তা; শালী যদি বল্লে তবে কানমলাটিও খাও! (চন্দ্রের পার্শ্ব একাসনে বসিয়া চন্দ্রের কর্ণপীড়ন)।

ইন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি) ভগবন্ সিতকিরণমালিন্, তুমিই ধন্য। করস্পর্শে তরুণীকরকিসলয়েষু অরুণরাগ এখনও তোমার কর্ণমূলে সংলগ্ন হইয়া আছে!

শীতলা। (মনসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বগত) ম'ল! ম'ল! আমাদের মনসে হিংসেয় কেটে ম'ল! আমি চাঁদের পাশে বসেছি এ আর ওঁর গায়ে সইল নাঃ। ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়াকে দেখ না! এত গুলো পুরুষ মানুষের সাম্নে লজ্জাও নেই! মাগী এবার পাড়ায় গিয়ে কত কানাঘুষোই করবে! উনিও বড় কসুর করেন নি! কার্ত্তিক ঠাকুরটিকে নিয়ে যে রকম নিলজ্জপনা করেছে আমি দেখে লজ্জায় মরে যাই আর কি! কার্ত্তিক কোথায় লুকোবে ভেবে পায় না। ওই ত চেহারা—ওই নিয়ে এত ভঙ্গীও করে! মাগো, মাগো, মাগো! (প্রকাশ্যে) আ মর মাগী! চাঁদের সাম্নে গিয়ে অমন বেহায়ার মত আনাগোনা করচিস্ কেন? যেন সাপ খেলিয়ে

(সুরসভার মধ্যে মনসা ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ)

ইন্দ্র। (সশব্যস্ত হইয়া একবার মনসা ও একবার শীতলার প্রতি) ক্রোধ সম্বরণ কর! ক্রোধ সম্বরণ কর! অয়ি অসূয়তাম্র-লোচনে, অয়ি গলদ্বেণীবন্ধে, অয়ি বিগলিতদুকূলবসনে! অয়ি কোকিলজিতকূজিতে, তারতর সপ্তম স্বরদ্বক পঞ্চমস্বরে নম্র করিয়া আন! অয়ি কোপনে—

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে আসনে বসাইয়া) তুমি এত ব্যস্ত হও কেন দাদা! ওদের এমন রোজ হয়ে থাকে! থাক্‌ত ওলাবিবি, তাহলে আরও জমত! তার কি খাবার গোল হয়েছে তাই সে শচীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছে!

ইন্দ্র। (ব্যাকুল ভাবে) হা সুরেন্দ্রবক্ষবিহারিণী দেবী পৌলোমি!

(মনসার দ্রুতবেগে সভা ত্যাগ, এবং শীতলার পুনস্ত চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন)

বীণাপাণির প্রবেশ।

বীণা। দেবরাজ, কর্কশ কোলাহলে আমার দেববীণার স্বর-স্খলন হইতেছে, আমার কমলবন শূন্যপ্রায়, আমি দেবলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। (প্রস্থান)

বৃহস্পতি। আমিও জননী বাণীর অনুগমন করি। (প্রস্থান)

(অশ্লেষা ও মঘার সভাপ্রবেশ)

অশ্লেষা ও মঘা। (চন্দ্রের একাসনে শীতলাকে দেখিয়া) আজ অপরূপ অভিনব সপ্তদশম কলায় দেব শশধরকে সমধিকতর শোভ-মান দেখিতেছি।

চন্দ্র। দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে করুণ পরিহাসে বিড়ম্বিত করিবেন না। যুক্তরাজ আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে সেই আক্রোশে ঈর্ষান্বিত ভগবান একটি ত্রীমাহ সৃজন করিয়াছেন ইহার পূর্ণগ্রাস হইতে আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না!

অগ্নেষা। আর্য্যপুত্র, এই ভদ্র ললনা অনতিপূর্ব্বে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার শ্বশুরকুলকে উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অশ্রুতপূর্ব্ব কুৎসা দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছেন। দেবীর সেই আশ্চর্য্য ব্যবহারকে আমরা অধিকারবহির্ভূত উপদ্রব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি সৌভাগ্যবতী তোমারই হস্তে সেই অবমাননের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন, আর্য্যপুত্রকে তাঁহার নবতর শ্বশুরকুলে বরণ করিয়া আমরা নক্ষত্রলোক হইতে বিচ্যুতিলাভের জন্য চলিলাম! (শচীর প্রতি) ভদ্রে, কল্যাণি, তোমার সৌভাগ্য অক্ষয় হউক। (প্রস্থান)।

শচীর প্রবেশ।

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) আর্য্যে, শুভ আগমন হউক!

বেটী। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে সবলে আসনে উপবেশন করাইয়া) ইস্! ভারি খাতির যে! সাইরি; দাদা ঢের ঢের পুরুষ মানুষ দেখেছি কিন্তু তোর মত এমন ত্রৈণ আমি দেখিনি!

(বেটীকে ইন্দ্রের বামপার্শ্বে শচীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিতে দেখিয়া দূরে এক কোণে শচীদেবী কর্ত্তৃক সামান্য বেশে আসন গ্রহণ)

বেটী। (শচীর বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়া সহাস্যে) বৌঠাকরুণ,

আমার বাবাকে কি মন্ত্র পড়ে দিয়েছ বল দেখি। একেবারে শ্রীচরণের গোলাম করে রেখেছে! তুমি-উঠ্‌লে ওঠে, তুমি বস্‌লে বসে! বলি, একটা কথাই কও। (গান) "কুয়া কইতে দোষ কি আছে বিধুমুখী।"

ইন্দ্র। দেব ষেঁটো, কিঞ্চিৎ অবসর দিতে অনুমতি হউক্। দেবীর নিকট কিছু নিবেদন আছে।

ষেঁটু। দৈন্য দেখো! দেখো! একটু কাছে এলে বসেছি তোমার যে আর গায়ে সইল না—এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়—কথায় বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ! কাজ নেই ভাই আবার শাপ দেবে। তোমরা দুজনে বোস আমি-যাই। (বলপূর্ব্বক ইন্দ্রকে শচীর আসনে বসাইবার চেষ্টা)।

ইন্দ্র। (ষেঁটুকে দূরে অপসারণ করিয়া) দেব, তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ!

ওলাবিবির প্রবেশ।

ওলা। (শচীর প্রতি) ভাই বলি যায় কোথায়! অমনি বুঝি তোমারির কাছে নালিশ করতে এসেছ! তা নাগাও না! তোমার তোমারিকে আমি ডরাইনে!

শচী। (আসন হইতে উঠিয়া ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ, আমি জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে কিছুকাল লক্ষ্মীদেবীর আলয়ে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছি। বহুকাল দেবীদর্শন ঘটে নাই।

ইন্দ্র। আর্য্যে, আমিও দেবীর অনুসরণ করিতেছি। বহুকাল পৌলোমী-সমক্ষে চক্রপাণির নিকট অপরাধী হইয়া আছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, বিষ্ণুলোকে আমারও বিশেষ অভিপ্রায়